প্রকাশনার ৬৩ বছর

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল

৬৩ বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর– ডিসেম্বর ২০২৪

প্রধান সম্পাদক
আঃ ছালাম খান

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক]
রেজিঃ নং - ডিএ ২০/৭৬
ISSN : 2958-5341
৬৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৪
রবিউস সানি- জমাদিউস সানি ১৪৪৬
কার্তিক- পৌষ ১৪৩১

প্রধান সম্পাদক
আঃ ছালাম খান
মহাপরিচালক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম
উপাচার্য, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
ড. যুবাইর মোহাম্মদ এহসানুল হক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
মোঃ মহিউদ্দিন
পরিচালক, সমন্বয় বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ
পরিচালক, যাকাত ফান্ড বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
মোঃ আবদুল্লাহ
মুফতী, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ড. ওয়ালীয়ুর রহমান খান
মুহাদ্দিস, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী
মুফাসসির, হালাল সনদ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ জহিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
মোঃ সাইফুল ইসলাম খান
গবেষণা সহকারী, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনলাইন সহায়তা
আইসিটি বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

THE ISLAMIC FOUNDATION JOURNAL

[A Quarterly Research Journal of Islamic Foundation]

Regd. No. DA 20/76
ISSN : 2958-5341
Year 63, Issue-4
October -December 2024

Chief Editor : **Abdus Salam Khan**
Director General (Senior District and Sessions Judge)
Islamic Foundation

Executive Editor : **Mohammad Rafiqul Islam**
Director, Dept. of Research, Islamic Foundation

Editorial Board : **Prof. Dr. Md. Shamsul Alam**
Vice Chancellor, Islami Arabic University
Dr. Zubair Mohammad Ehsanul Hoque
Professor, Dept. of Arabic. Dhaka University
Dr. Md. Ebrahim Khalil
Asso. Prof. Dept. of Islamic Studies, Jagannath University
Mohammad Tawhidul Anwar
Director, Dept. of Publications
Islamic Foundation
Md. Mohiuddin
Director, Dept. of Coordination
Islamic Foundation
Dr. Mohammad Harunur Rashid
Director, Dept. of Zakat Fund
Islamic Foundation
Md. Abdullah
Mufty, Dept. of Research
Islamic Foundation
Dr. Waliur Rahman Khan
Muhaddis, Dept. of Research
Islamic Foundation
Dr. Md. Abu Saleh Patwary
Mufassir, Dept. of Halal Certification
Islamic Foundation

Editorial Associates : **Md. Johirul Islam**
Assistant Director, Dept. of Research
Islamic Foundation
Md. Saiful Islam Khan
Research Assistant, Dept. of Research
Islamic Foundation

Online Support : Dept. of ICT, Islamic Foundation

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
ফোন : ০২২২২২১৮২৭৬

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
ও
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮০২২২২২১৮২৬৩

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

THE ISLAMIC FOUNDATION JOURNAL
[A Quarterly Research Journal of Islamic Foundation]
Published by Department of Research, Islamic Foundation

Printed by Islamic Foundation Press.
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
E-mail : ifapatrika@gmail.com
Website : www.Islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 50.00
U. S. Dollar : 01

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আর দরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

মহাকালের মহাগর্ভে বিদায় নিয়েছে ২০২৪ খ্রি.। বছরটি ছিল ঘটনাবহুল। বিদায়ী ২০২৪ সাল বাংলাদেশকে ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় গণঅভ্যুত্থান উপহার দিয়ে গেছে। ২০২৪ বাংলাদেশকে বিশ্বে ''বর্ষ সেরা দেশ'' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নতুন প্রজন্ম মুক্ত করেছে দেশকে আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন থেকে। কালের পরিক্রমায় বাঁক বদলে আলোচিত, আলোকিত ও অত্যুজ্জ্বল হয়ে থাকবে ঐতিহাসিক ২০২৪, ৩৬ জুলাই।

নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার বছর ২০২৫ খ্রি.। নতুন বছরে বাংলাদেশের মানুষ 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত। তাদের স্বপ্ন সুন্দর একটি বাংলাদেশ। মানুষ আর তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। দেশে ন্যায় বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নিয়মিত প্রকাশনা ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল'। যা দীর্ঘ ৬৩ বছর যাবত নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় ৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইসলামী এই প্রকাশনায় আমরা একদিকে যেমন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও চর্চাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, অন্যদিকে ইসলামিক সভ্যতার ইতিহাস, ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ইসলামিক আইনের প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি করার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছি।

এই সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামের বৈশ্বিক প্রভাব, আধুনিক সমাজে ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা এবং ইসলামী আইন ও নৈতিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা। এছাড়াও ইসলামের আলোকে সামাজিক মর্যাদা, জাতীয় জীবনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামই শ্রেষ্ঠ, নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নে ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্র, কবরের প্রশ্নসমূহের সাথে ঈমান ও আমলের সম্পর্ক, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে ইসলামের নীতিমালা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষাদান কৌশল প্রভৃতি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এসব প্রবন্ধে গবেষণায় ওঠে এসেছে নানাবিধ অজানা তথ্য ও উপাত্ত। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে ইসলামের শান্তি, ন্যায় এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে। যেহেতু ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু ইসলামী শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। পাঠক এসব প্রবন্ধ পাঠে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে ধারণা গভীর থেকে আরো গভীরতর হবে- ইনশাআল্লাহ্। আমরা আশা করছি, আমাদের বিজ্ঞ পাঠকগণ এই প্রবন্ধগুলো থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করবেন এবং ইসলামের সঠিক বোধ ও চিন্তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে আরও বেশি আগ্রহী হবেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!

সূচিপত্র

- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামই শ্রেষ্ঠ/০৭
  ড. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ
- কবরের প্রশ্নসমূহের সাথে ঈমান ও আমলের সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা/২৫
  ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসেন
- হাদীস গ্রন্থসমূহের ধারাক্রম সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান : একটি পর্যালোচনা/৩৮
  ড. মোঃ মিজানুর রহমান
- নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নে ইউসুফ (আ:)-এর চরিত্র : একটি পর্যালোচনা/৫৬
  নূর মোহাম্মদ
- হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাব্যচর্চা : একটি বিশ্লেষণ/৮১
  আবদুল্লাহ যোবায়ের
- ইসলামের আলোকে সামাজিক মর্যাদা : একটি পর্যালোচনা/৯৯
  মোঃ আব্দুর রহমান রকিব
- জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা : একটি পর্যালোচনা/১১৬
  মুহাম্মদ মহিউদ্দীন
- মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে ইসলামের নীতিমালা : একটি পর্যালোচনা/১৩৫
  ড. মোঃ জিয়াউল হক
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান কৌশল : একটি হাদীসভিত্তিক পর্যালোচনা/১৫০
  মোঃ ইয়াকুব আলী
- Glorious Contribution of Muslim Women in Various branches of Science/১৬৮
  ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন
- শরী'আ বিষয়ে গবেষণা কর্ম : প্রসঙ্গ কথা/২০৬
  মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা জার্নাল
গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের নিয়মাবলী

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং ডিএ ২০/৭৬) 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা জার্নাল' (Islamic Foundation Research Journal) একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল। জার্নালটি প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয় এবং দেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা জার্নাল হিসেবে স্বীকৃত। জার্নালটির ISSN নং-২৯৫৮-৫৩৪১।

১.০. **জার্নালে প্রকাশিতব্য গবেষণার বিষয়সমূহ :**
এ জার্নালে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, সীরাত, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ব, বিচারব্যবস্থা, বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিকহী পর্যালোচনামূলক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

২.০. গবেষণা প্রবন্ধের ভাষা সাবলীল ও বানান রীতি ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

২.১. গবেষণা প্রবন্ধটি বাংলা, ইংরেজি অথবা আরবী যে কোন ভাষায় লেখা হতে হবে। প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে।

৩.০. গবেষণা প্রবন্ধ রচনায় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

৩.১. অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Orginal Research) হতে হবে। গবেষণাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে।

৩.২. গবেষণাকর্মে অবশ্যই মৌলিকত্ব থাকতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে পুরনো বিষয়াবলির চর্বিত চর্বণ গ্রহণযোগ্য নয়। গবেষণার সুস্পষ্ট ফলাফল থাকতে হবে।

৩.৪. যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণ কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কার অবদান কতটুকু তার বিবরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৩.৫. গবেষণা প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) এর মধ্যে হতে হবে। লেখা বাংলার ক্ষেত্রে কী-কোর্ড এর Sutonny MJ ইংরেজির ক্ষেত্রে Times New Roman এর ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪.৩. সারসংক্ষেপ : প্রবন্ধের শুরুতে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে। সারাংশ/সারসংক্ষেপ বাংলা ও ইংরেজি অথবা ইংরেজি ও আরবী ভাষায় (আরবী ভাষার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে) হতে হবে। এতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থাকবে।

৪.৪. ভূমিকা : প্রবন্ধের ভূমিকায় বিষয়ের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কারা কী কাজ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকতে হবে।

৪.৫. গবেষণা পদ্ধতি : গবেষণা পদ্ধতি বর্ণনা, বিশ্লেষণ বা জরিপ/পরিসংখ্যান থাকতে হবে।

৪.৬. গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণ : গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি গবেষণা প্রবন্ধের এই অংশে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সাথে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক লেখকের নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন থাকতে হবে। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের স্বত:সিদ্ধ প্রমাণিক বিষয়ের বাইরে কোন মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪.৭. উপসংহার : গবেষণাটি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সম্ভাব্য ভূমিকা ও গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তুলে ধরতে হবে।

৪.৮. তথ্যপঞ্জী, তথ্য সূত্র অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

৪.৯. উদ্ধৃতি উপস্থাপন : গবেষণায় উদ্ধৃতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ আবশ্যিক :

৫.০. হুবহু/প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের কম হলে চলমান লাইনে উভয় পাশে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে এবং ৩০ শব্দের বেশি হলে মূল লেখা থেকে এক স্পেস নিচে ভিন্ন প্যারায় দুই পাশে অতিরিক্ত মার্জিন রেখে উল্লেখ করতে হবে। কোন সূত্র থেকে একই স্থানে অর্ধ পৃষ্ঠার অধিক হুবহু উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। উদ্ধৃতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যকার এক বা একাধিক শব্দ বা কিছু অংশ উহ্য রাখার প্রয়োজন হলে পর পর অনধিক তিনটি বিন্দু (...) উল্লেখ করতে হবে।

৫.১. ইনটেক্সট উদ্ধৃতি : ইনটেক্সট বা টেক্সটের মধ্যে উদ্ধৃতি প্রদানের স্থানে বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থকার/ প্রবন্ধকারের নামের শেষাংশ ও সূত্রের প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নং ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।

গ্রন্থ/গ্রন্থসূত্রের পূর্ণ বিবরণ টেক্সট বা পাদটিকায় উল্লেখ করা হবে না, বরং প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র/গ্রন্থপঞ্জি অংশে উল্লেখ করতে হবে।

৫.২. অনুবাদ নীতিমালা : কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল TEXT সহ বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৫.৩. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া : প্রবন্ধ কম্পিউটার কম্পোজ করে ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নালের নিজস্ব ই-মেইল: ifapatrika@gmail.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে।

ই-মেইলে প্রবন্ধ প্রেরণের ক্ষেত্রে লেখক/লেখকগণকে এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

গ. এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

ঘ. প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায় দায়িত্ব বহন করবেন না।

৫.৪. প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:

৫.৫. জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দুজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ (Review) করানো হয়।

৫.৬. রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

৫.৭. অন্যান্য জ্ঞাতব্য:

৫.৮. গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/লেখকগণ জার্নালের ২ (দুই) কপি সৌজন্য পাবেন।

৫.৯. প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহীত হওয়ার পর সম্পাদক ও রিভিউয়ার যদি তাতে কোনরূপ সংশোধন বা পরিমার্জনের পরামর্শ দেন তাহলে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধটি প্রকাশযোগ্যভাবে সংশোধন করে দিতে হবে। নতুবা সেই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে না।

৬.০. জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

৬.১. সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

৬.২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৬.৩. এ সম্পর্কে কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে www.Islamicfoundation.gov.bd সাইটে/মেইলে ifapatrika@gmail.com কিংবা ০২-২২২২১৮২৬৩ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল-এর জন্য ইসলামের শ্বাশত জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য, মানসম্মত, তথ্য ও উপাত্তসমৃদ্ধ গবেষণামূলক

লেখা আহ্বান

লেখা পবিত্র কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন দর্শন, জীবনাচার, ফিকহ্, সীরাত, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামী অর্থনীতি, আইন, বিচার ব্যবস্থা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতা, দ্বীনের প্রচার ও প্রসার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বৈশ্বিক সমসাময়িক সমস্যা ও ইসলামের আলোকে সমাধান এবং তুলনামূলক ইসলামী আইন মোতাবেক পর্যালোচনামূলক হতে হবে। বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ মৌলিক তত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ সহজ সরল ভাষায় পরিচ্ছন্ন হতে হবে। A4 সাইজ কাগজে এক পৃষ্ঠায় কম্পিউটার কম্পোজ করে সফ্ট কপিসহ সর্বোচ্চ ৫০০০ শব্দের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় লেখা পাঠাতে হবে। লেখকের নামসহ পূর্ণ ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর প্রদান করা আবশ্যকীয়।

পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ০২২২২২১৮২৬৩
ই-মেইল ঃ ifapatrika@gmail.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামই শ্রেষ্ঠ

ড. মুহাম্মদ আবুল ফারাহ*

[Abstract : Human rights guarantee the superiority of human race, human dignity and overall security. On December 10, 1948, the United Nations declared the Charter of Human Rights in the context of extreme human rights violations worldwide. It is termed as the highest rise of human rights. Although human rights are strongly enunciated in the UN Charter, they have no legal force or effect. Because even if there is an obligation to comply with this charter, it is not possible with the five states that have veto power. Furthermore, this Sanad is incomplete and full of errors. As a result, the cries of disenfranchised people worldwide are increasing. On the other hand, Islam presented such a complete, infallible and eternal outline of human rights through the Charter of Modina in 622 AD, about fourteen hundred years ago, which unequivocally declared that there is no difference between human beings. All human beings have equal rights irrespective of caste, clan and Geed. Not just announcements; Rather, Prophet Muhammad (Pbuh) and Khulafay Rashedin have set a unique example in the world by fully establishing human rights in the golden age of Islam. Human rights originate from the moral and humanitarian philosophy of Islam. According to Islam, human rights are a way of life, state policy and ideology, which must be implemented. Severe punishment has been announced in this world and the hereafter if it is violated. As a result, its legal power and status is the highest. So the superiority and universality of Islam in establishing human rights is undeniable.]

Keywords: Human Rights, Security, Charfor of Modina.

[**ভূমিকা :** বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার বা Human Rights বহুল আলোচিত একটি শব্দ। মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির যথাযথ বিকাশ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার। আদি মানব হযরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রথম সংঘটিত হয়। কালক্রমে এটি ব্যাপকতা লাভ করে এবং প্রকট আকার ধারণ করে। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে, তেমনি মানবাধিকার হরণ ও দলনের

* সহযোগী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ইতিহাস আরো দীর্ঘ। বর্তমান বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ আজ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত ও মানবাধিকার বঞ্চিত। চরম দারিদ্রতা, বেকারত্ব, অত্যাচার-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে অসংখ্য মানুষ আজ মানবেতর জীবন-যাপন করছে। দু-দু'টি বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা, স্বাধীনতাকামীদের প্রতিরোধকল্পে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণহত্যা, বর্ণবাদের কালো থাবা এবং ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও দমন-পীড়নের ফলে অধিকারহারা মানুষের আর্তচিৎকারে বিশ্বের বায়ুমণ্ডল ক্রমেই ভারী হয়ে ওঠছে। এতদসত্ত্বেও উন্নত রাষ্ট্রসমূহের মানবতা বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের নগ্ন প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বর্বর হামলা, সিরিয়ায় ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ, অবৈধ ইসরাঈলের হাতে ফিলিস্তিনীদের রক্তাক্ত হওয়া, স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরিদেরকে হত্যা ও অবরুদ্ধ করা, চীনে উইঘুর মুসলমানদের ওপর নৃশংসতা, মায়ানমার ও ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যুগে যুগে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বহু চেষ্টা হয়েছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু শোষিত-বঞ্চিত মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পায়নি। ফলে অধিকারহারা মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। এটিকে Universal Declaration of Human Rights বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র আখ্যায়িত করা হয়। এ সনদে মানবাধিকারের কথা বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হলেও এর আইনগত কোনো ক্ষমতা নেই। কেননা এ সনদ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিশ্বের বৃহৎ পাঁচটি রাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত এ সনদ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। পক্ষান্তরে ইসলাম প্রায় চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদের মাধ্যমে মানবাধিকারের ব্যাপক, পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত রূপরেখা উপস্থাপন করেছে। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। কেবল ঘোষণা নয়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীন ইসলামের সোনালী যুগে মানবাধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মূলত ইসলামের মর্মবাণী ও মানবিক দর্শন থেকেই মানবাধিকারের উৎপত্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার একটি জীবন-পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শ, যা বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। এর ব্যত্যয় ঘটলে ইহ ও পরকালে কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে এর আইনী ক্ষমতা ও মর্যাদা সর্বোচ্চ। প্রবন্ধে উল্লেখিত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হবে যে, ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও শাশ্বত।]

গবেষণা পদ্ধতি : প্রবন্ধে বিশ্লেষণধর্মী, ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ও সমালোচনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

মানবাধিকারের পরিচয়

'মানবাধিকার' ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। এর অর্থ মানুষের জন্মগত অধিকার বা মানুষের প্রাপ্য অধিকারসমূহ। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ যেসব অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তাই মানবাধিকার। এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত হওয়ায় সংযোজন-বিয়োজন কিংবা হরণ বা দলনের অধিকার দুনিয়ার কারো নেই।

জাতিসংঘ মানবাধিকারের যে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছে তা হলো, "মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সহজাত, সর্বজনীন, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘণীয় কতিপয় অধিকারই হচ্ছে মানবাধিকার।"[১]

Encyclopedia Britannica-তে এ অধিকারসমূহকে প্রাকৃতিক আইনের আওতায় মানুষের প্রাপ্য অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, "Rights thought to belong to individual under natural Law as a consequence of his being human."[২]

ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরি সম্পাদিত Collins Dictionary of Sociology- তে বলা হয়েছে, "Human rights which belong to all people whether or not they are enshrined in the law."[৩] (অর্থাৎ মানবাধিকার হলো সেসব অধিকার, যেগুলো সব মানুষ ধারণ করে। এসব অধিকার আইন দ্বারা সংরক্ষিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।)

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের মতে, "মানুষের অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সহ-অবস্থানের ভিত্তি হলো মানবাধিকার। মানবাধিকার সর্বজনীন, অবিভাজ্য ও পরস্পর সম্পর্কিত। শান্তি ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের যে আকাঙ্ক্ষা, তার হৃদপিণ্ড মানবাধিকার।"[৪] রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, "রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের জন্য স্বীকৃত ও প্রদত্ত কতিপয় সুযোগ-সুবিধাকে মানবাধিকার বলা হয়, যেগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য।"[৫] মোস্তফা জামান ভূট্টোর মতে, "মানবাধিকার হলো সেই অধিকারসমূহ, যা মানুষকে সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিময় জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দেয় এবং মানুষকে বিশিষ্টতা দানে সহায়তা করে।"[৬] এক কথায়, মানবাধিকার হলো, মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্মগত, ন্যায়সঙ্গত ও আইনগত অধিকার, যা মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি হরণ বা দলন মানবতা বিরোধী অপরাধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইসলামের সোনালী যুগ ব্যতীত সকল যুগেই এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দুর্বল ও অসহায় মানুষ ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের, শ্রমিকের ওপর মালিকের, নারীর ওপর পুরুষের, প্রজার ওপর রাজার, দাস-দাসীর ওপর মনিবের, সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগুরুর নিষ্ঠুর নির্যাতন ও যুলুম-অবিচার অব্যাহত রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এ অবস্থার অবসান সময়ের অনিবার্য দাবী।

মানবাধিকারের পরিধি

মানবজীবনের ব্যাপ্তি যতটুকু মানবাধিকারের পরিধিও ততটুকু। মৌলিক অধিকার মানবাধিকারের একটি অংশমাত্র। আধুনিক কালে মানবাধিকারের পরিধি এতই বিস্তৃতি লাভ

---

১. AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 1998, Amenesty International publications, London-1998, p. 3

২. The New Encyclopedia Britannica, Founded 1968, 15th edition, printed in USA. Vol- 5, p. 200

৩. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ১৭

৪. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, মানবাধিকার : ৫০ বছরের অগ্রযাত্রা "মানবাধিকার, অন্ধকার থেকে আলোর পথে" ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫

৫. রেবা মণ্ডল ও মোঃ শাহজাহান মণ্ডল, *মানবাধিকার আইন, সংবিধান ও ইসলাম*, চট্টগ্রাম: প্রভাতী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১

৬. মোস্তফা জামান ভূট্টো, *'মানবাধিকার নিয়ে ভাবনা'* Amitya A Voice Humanity. Vol 1. No.1, May 2002, p. 1.

করেছে যে, রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে এর অবাধ বিচরণ লক্ষণীয়। বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক গোলামী হতে মানবতার মুক্তি মানবাধিকারের মূল সুর। এর উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ হলো, জীবন রক্ষা, আত্মমর্যাদা ও নিরাপত্তা লাভ, নিরাপদে সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বণ্টন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, বাক-স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা, অন্যের ক্ষতি না করে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন, ধর্ম শিক্ষাদান ও প্রচার করা, রাষ্ট্র ও আদালত কর্তৃক সুবিচার পাওয়া, স্বাধীনভাবে সংগঠন করার ও মত প্রকাশের অধিকার, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার শিকার না হওয়া, অশ্লীলতামুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সন্দেহের কারণে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার না হওয়া, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন, ভরণ-পোষণের নিশ্চয়তা, পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও নিরাপদ খাদ্য লাভ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সদ্ভাব ও ভারসাম্য রক্ষা, বেকারত্ব থেকে সুরক্ষা, বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীর প্রাপ্য অধিকার, অসহায় দরিদ্র, দুঃস্থ ইয়াতীম, বিধবাদের অধিকার, নিরাপদ যাতায়াত, অপপ্রচার ও হলুদ সাংবাদিকতা, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পরিবেশ দূষণ, নিরাপদ খাদ্য, পানি ও জ্বালানি লাভের অধিকার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা ও গোয়েন্দাগিরি বা হয়রানির শিকার না হওয়ার অধিকার ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত মানবাধিকারের আরও বহু বিষয় ও ক্ষেত্র রয়েছে।

মানবাধিকারের উৎপত্তি

কারো কারো মতে, মানবাধিকার ইউরোপ-আমেরিকার দার্শনিকদের চিন্তার ফসল। এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। মূলত মানুষ মানবাধিকারের মূল চেতনা ও ধারণা (Basic Concept) লাভ করেছে আল্লাহ প্রদত্ত দীন-ইসলাম থেকে। ইসলামের আগমন ঘটেছে আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকেই। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল বক্তব্য ছিল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এর অর্থ এক আল্লাহকে স্বীকার করে তাঁর উপাসনা করা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা মহৎকাজ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। ধর্মের এ মর্মবাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই যুগে যুগে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, রাষ্ট্র প্রধান, নানা সংস্থা-সংগঠন ও মানবিক মানুষ পৃথিবীর দেশে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারে মানুষের পরস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার থেকে জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য কিছু ধারা পুনঃউল্লেখ করেছে মাত্র। নতুন কোনো ধারা বা আইডিয়া জাতিসংঘ সংযোজন করতে পারেনি। মানবাধিকার শব্দটি বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সনদের বহু পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে।[৭] জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার প্রায় ১৩২৬ বছর পূর্বে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মানবাধিকারের যে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন, তা মানবাধিকারের মূল ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে Robert Trar-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ "Islam was first to recognize basic human rights 14 centuries ago-it set up guarantees and safeguards,

৭. মাওলানা এ. কে এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে নারী ও মানবাধিকার*, (ঢাকা: ২য় সংস্করণ, মা প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ১৮

that have only recently been incorporated in universal declarations of human rights."[৪] হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে মানবাধিকারের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর Britault বলেছেন, "মানবজাতি সমকালীন মানবাধিকার মতবাদের উন্নয়ন ও এর উৎস সম্পর্কিত ধারণা ইসলাম থেকেই লাভ করেছে।"[৯] সুতরাং মানবাধিকারের উৎপত্তি মূলত আল্লাহ প্রদত্ত দীন তথা ইসলাম থেকেই।

প্রচলিত মানবাধিকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মানবীয় প্রচেষ্টায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ব্যাবিলনের রাজা হাম্বুরাবি খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে।[১০] ১২১৫ সালে ব্রিটেনের রাজা কিংজনের প্রণীত Magna Carta-কে মানবাধিকারের প্রথম চার্টার বলা হয়ে থাকে।[১১] ১৬৮৯ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট Bill of Rights বা মানবাধিকার আইন পাশ করে। ১৭৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস 'অধিকার আইন' নামে একটি বিল পাশ করে। একই বছর ফ্রান্সের আইন পরিষদ মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে।[১২] ১৯১৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার অধিকার ঘোষণা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।[১৩] এভাবে পৃথিবীর দেশে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। বিংশ শতাব্দিতে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি বেশ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হলেও এর তেমন কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ৩০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ঘোষণাপত্রকে মানবীয় প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ উত্থান হিসেবে দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কেননা ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারই সর্বব্যাপী, সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের সময় বিশ্বে মানবাধিকার পরিস্থিতি

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের সময় রোম এবং পারস্য ছিল দুই বড় পরাশক্তি। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে [৬১০- ৬৪১ খ্রি.] মধ্যযুগের স্রষ্টা বলে অভিহিত করা হতো। তার নিপীড়নমূলক শাসনে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে পারস্যে ছিল অত্যাচারী ও উচ্চ বিলাসী সম্রাট খসরু পারভেজ [৫৯০-৬২৭]। জনসাধারণের ওপর উচ্চহারে করারোপ, নির্বিচারে মানুষ হত্যা, শাসকগোষ্ঠীর বিলাসী জীবন যাপন, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রভুর আসনে বসানো ইত্যাদি অপকর্ম জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এক কথায় ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই মানুষ অধিকার বঞ্চিত ছিল। এতদ্ব্যতীত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলাম প্রচারের প্রাক্কালে চীন, ভারত, মিসর ও গ্রিস প্রাচীন সভ্যতার ধারক-বাহক হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করতো। কিন্তু এসব অঞ্চলেও মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক।

---

৮. Robert Trar, Human rights in Islam, *Journal of Islamic Research Institute,* Vol. 28, No 1-4, 1989,Islamic University, Islamabad, Pakistan, p. 117
৯. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১০. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১২. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ১৭

আরবে মানবাধিকার পরিস্থিতি : বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কায় ইসলাম প্রচারের প্রাক্কালে আরবের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল আরো ভয়াবহ। আরববাসীর জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা কিংবা সুবিচারের লেশমাত্র ছিল না। অনৈক্য, গোত্রীয় বিবাদ, হত্যা, লুণ্ঠন, নারীর সম্মানহানী ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। নারীরা ছিল ভোগ্যপণ্যের ন্যায়। ভয়ঙ্কর রকমের ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। পণ্য-সামগ্রির ন্যায় দাস-দাসীরা হাটে-বাজারে বিক্রি হতো। তাদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করা হতো। তাদের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের প্রশ্ন ছিল অবান্তর ও উপেক্ষিত। এককথায় তৎকালীন আরবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেউলিয়াত্ব, সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুসংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অশ্লীলতা বিরাজমান ছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী যথার্থই বলেছেন, "Never in the History of the world was the need so great, the time so ripe for the Deliverer."[১৪] (অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে পরিত্রাণকারীর আবির্ভাবের এত বেশি প্রয়োজন এবং এত উপযুক্ত সময় অন্য কখনও অনুভূত হয়নি)। ফলে মানবাধিকারের চরম দুর্দিনে মানবতার মহান মুক্তির দূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীবাসীর জন্য 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' (দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আগমনের মাধ্যমেই মূলত বিশ্ববাসী মানবাধিকার পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করলো।

ইসলামে মানবাধিকারের ধারণা

আদি মানব হযরত আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল একই দীন প্রচার করেছেন। যার মূল কথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই দ্বীনের নাম ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা। মহান আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৫] ইবাদাতের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান হলো, ইবাদাত দুই পদ্ধতিতে করতে হবে। এক. হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক। অর্থাৎ মহান আল্লাহর আদেশ (নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি) ও নিষেধ (কুফর, শিরক, মিথ্যা, হত্যা ইত্যাদি) পালন করা। দুই. হক্কুল-ইবাদ বা বান্দার হক তথা মানবাধিকার। হক্কুল ইবাদ বলতে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, মালিক-শ্রমিক, প্রবীন, অধিনস্ত, যুদ্ধবন্দীসহ সকল মানুষ ও সৃষ্টিকূলের প্রাপ্য অধিকার বুঝায়। আল্লাহর হক লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়ে আল কুরআনের ঘোষণা হলো, কৃত অপরাধ পরিহার করে বান্দা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন।[১৬] কিন্তু বান্দার হকের ব্যাপারে ঘোষণা হলো, যে বা যাদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে, তারা ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না। এ কারণে ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘন দন্ডণীয় অপরাধ। ফলে ইসলাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকে সর্বোত্তম ইবাদাত ঘোষণা করে মুসলিম উম্মাহকে তা নিষ্ঠার সাথে পালনের নির্দেশ দিয়েছে।[১৭] কেননা শেষ বিচারের দিন বেশির ভাগ মানুষকে হক্কুল-ইবাদ বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

---

১৪. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৫. وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ আল কুরআন, ৫১ : ৫৬

১৬. قُلْ يَـٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا আল কুরআন, ৩৯ : ৫৩

১৭. قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ আল কুরআন, ২: ২১৫, ১৭৭; ১৭: ২৬; ৪: ৭, ৩৬;

ইসলাম প্রবর্তিত মানবাধিকার

মানবতার মহান শিক্ষক ও পরম বন্ধু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতি জীবনে [৬১০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দে] যে সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। এরপর ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খুলাফায়ে-রাশেদীন (হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) প্রমূখ) মানবাধিকার নীতি সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করে পৃথিবীতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার নীতির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব লক্ষ্য করেই তৎকালীন আরবজাতি ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন। এজন্যই বলা হয়, ইসলাম তরবারির জোরে নয়; বরং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর ৬৬১-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের উল্লেখযোগ্য অংশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইউরোপের স্পেনে প্রায় পনের শতক পর্যন্ত মুসলিম শাসন চালু ছিল। মধ্য এশিয়া ও ভারতে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের পরে মুসলিম শাসন চালু থাকলেও ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ দ্বারা তা পরিচালিত হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিম শাসকগণ ইসলামের মানবাধিকার নীতি অনুসরণ করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন।[১৮] ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের উল্লেখয্যেগ্য কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ইসলামে জীবনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার

নিরাপদে বেঁচে থাকা মানুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহের অন্যতম। মানুষ বেঁচে থাকলেই তার অন্যসব অধিকারের প্রশ্ন আসে। তাই দারিদ্রতা কিংবা অন্য কোনো কারণে মানব হত্যা বা ভ্রুণ হত্যাসহ সব ধরনের অন্যায় হত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যায়ভাবে মানব হত্যাকে সমগ্র মানবজাতি হত্যার সাথে তুলনা করে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো।"[১৯] অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না।"[২০] সমাজ থেকে এ জঘণ্য অপরাধের মূলোৎপাটনের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান (ফরয করে) দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।"[২১] ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। সমাজ থেকে হত্যা, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা নির্মূলের জন্য ইসলাম এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছে, যাতে আপরাধ সংঘটিত করার দুঃসাহস কেউ না দেখায়। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত

---

১৮. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৯. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا আল কুরআন, ৫ : ৩২

২০. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ আল কুরআন, ১৭ :৩৩

২১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ আল কুরআন, ২ : ১৭৮

দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।"[২২] আল কুরআনের এসব শাস্তি প্রকাশ্যে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত সমাজে অপরাধের হার শূন্যের কোঠায় নেমে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বর্তমানেও সৌদি আরব সহ কয়েকটি রাষ্ট্রে হত্যা, ব্যাভিচার, চুরি-ডাকাতিসহ কিছু কিছু অপরাধের শাস্তি ইসলামের বিধান অনুযায়ী চালু থাকায় পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় সেখানে অপরাধের হার কম। আমেরিকায় চব্বিশ ঘন্টায় যে পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয়, সৌদি আরবে সারা বছরেও তা হয় না। পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তুলনা করলে সৌদি আরবে অপরাধের হার প্রায় শূন্যের কোঠায়।[২৩] এর অন্যতম কারণ হলো ইসলামের প্রকাশ্য ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগের বিধান। সুতরাং এটি আজ প্রমাণিত সত্য যে, আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে অপরাধ প্রবণতা দ্রুত হ্রাস পায়।

সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলাম

জীবনের ন্যায় সম্পদও মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিরাট নিয়ামত। ইসলাম মানুষের জন্য সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বন্টনের সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।"[২৪] তবে সম্পদ অন্বেষণ বা উপার্জন করার দায়িত্ব মানুষের। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"[২৫] সম্পদে মালিকানা ঘোষণা করে মহান আল্লাহ বলেছেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।"[২৬] ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান গুরুত্বপূর্ণ। তাই আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ।"[২৭] একইভাবে ইসলাম সম্পদে অন্যের অধিকার নিশ্চিত করে বলেছে, "তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।"[২৮] এ আয়াতের মাধ্যমে ধনীদেরকে যাকাত আদায় ফরয করে দেওয়া হয়েছে। এটি নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান না করলে ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ ভোগ-ব্যবহার বৈধ হবে না।[২৯] আর্থিক অনাচারের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ইসলাম সুদকে হারাম করে বলেছে, "তারা (কাফিররা) বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে

---

২২. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল কুরআন, ৫ : ৩৩

২৩. সূত্র: উইকিপিডিয়া

২৪. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا আল কুরআন, ১১ : ৬

২৫. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ আল কুরআন, ৬২ : ১০

২৬. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ আল কুরআন, ৪ : ৩২

২৭. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ আল কুরআন, ৪ : ২৯

২৮. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ আল কুরআন, ৫১ : ১৯

২৯. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ আল কুরআন, ৯:৬০

হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[৩০] এভাবে ইসলাম অর্থনৈতিক অনাচার বন্ধ এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে সুদ, ঘুষ, মজুতদারী, কালোবাজারি, লটারী ইত্যাদিকে অবৈধ ঘোষণা করে শাস্তির বিধান দিয়েছে। ইসলামে শ্রমিকের আর্থিক অধিকারের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরী দিতে হবে এবং শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তা পরিশোধ করতে হবে।[৩১] বস্তুত বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত (পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা মিশ্র) অর্থ ব্যবস্থার কোনোটিই মানুষের সম্পদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি; বরং সর্বত্র চলছে সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার এক মহোৎসব। পক্ষান্তরে ইসলাম এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, যেখানে কোনো যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই; বরং প্রত্যেক মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ও সম্পদের নিরাপত্তা পরিপূর্ণভাবে লাভ করে।

সম্ভ্রমের নিরাপত্তায় ইসলাম

জীবন ও সম্পদের ন্যায় মানুষের সম্ভ্রমের নিরাপত্তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম নানা উপায়ে মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করেছে। যেসব আচরণ ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা মানুষ একে অপরকে অসম্মান করে বা করতে পারে, ইসলাম সেসব বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেছে। যেমন কাউকে মন্দ বা বিকৃত নামে ডাকা, একে অপরকে উপহাস করা, একে অপরকে দোষারোপ করা,[৩২] অন্যের গোপনীয় বিষয় বা দোষ অন্বেষণ করা, অন্য মানুষ সম্পর্কে খারাপ বা অহেতুক ধারণা পোষণ করা, গীবত করা,[৩৩] বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা[৩৪] ব্যভিচার, অশ্লীল আচরণ, মানহানীকর ও অবৈধ কার্যকলাপ পরিহার করে জীবন যাপনের জন্য মু'মিনদেরকে আল কুরআনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মদ ও ব্যভিচার এ দু'টি অপরাধ এতই জঘণ্য যে, এর সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি ও হত্যাকাণ্ডের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের অশ্লীল কার্যক্রম ও অনাচার সমাজে চালু থাকলে মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রম নিরাপদ থাকে না। এছাড়াও যৌন আবেগময় পোষাক, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, চলচিত্র, নাটক, নৃত্য, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমাজে ধর্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধি করে। তাই এসবকে আল কুরআনে হারাম ঘোষণা করে বলা হয়েছে, "তিনি (আল্লাহ) নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন।"[৩৫] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কে একশত বেত্রাঘাত করো।"[৩৬] ইসলাম মানুষের সম্ভ্রম রক্ষায় এমন সব বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যাতে মানুষ একে অন্যের মান-

---

৩০. قالوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا আল কুরআন, ২ : ২৭৫

৩১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ্ আল কাযবীনী, *সুনান ইবন মাজাহ্*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), হাদিস নং: ২৪৪৩

৩২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ কুরআন, ৪৯:১১

৩৩. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আল কুরআন, ৪৯ : ১২

৩৪. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ আল কুরআন, ২৪:২৭

৩৫. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ আল কুরআন, ১৬ : ৯০

৩৬. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ আল কুরআন, ২৪ : ২

সম্মান ক্ষুন্ন করার সুযোগই না পায়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এটিই তাদের জন্য উত্তম।"[৩৭] এরূপ আরো বহু নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলাম মানুষের সম্ভ্রমের নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

ইসলাম প্রবর্তিত পারিবারিক অধিকার

মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল পারিবারিকভাবেই।[৩৯] হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর বিবাহের মাধ্যমে শুরু হওয়া পরিবার থেকেই বিশ্বময় সম্প্রসারিত আজকের বিশাল মানব সমাজ।[৩৮] মানুষের বংশ বৃদ্ধি, স্বভাবজাত চাহিদা পূরণ, মানসিক প্রশান্তি লাভ ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অন্যতম উপায় হচ্ছে বিবাহ। এর মাধ্যমেই মূলত মানুষ মান-সম্মান, উন্নতি অগ্রগতি ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন লাভ করে। ইসলাম মানুষকে বিবাহ করে বৈধ পারিবারিক জীবন গঠনের অধিকার দিয়ে বলেছে, "নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে বিয়ে করো"[৩৯] কোনো অঞ্চলে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হওয়া বা স্ত্রীর অসুস্থতাসহ নানা কারণে ইসলাম একাধিক বিয়ের বিধান দিয়েছে। বৈরাগ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে, 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।'[৪০]

ইসলাম প্রবর্তিত সামাজিক অধিকার

সাম্য ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূলনীতি। সামাজিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ও সহযাত্রীসহ সকল মানুষের প্রাপ্য অধিকার আদায় করা। বংশীয় বা বৈবাহিক সূত্রে সমাজের সদস্যদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক। সমাজে যারা পাশাপাশি বসবাস করে তারা পরস্পর প্রতিবেশী। সহকর্মী, সহপাঠী ও সহযাত্রীরাও প্রতিবেশীর আওতাভুক্ত। প্রতিবেশী মুসলিম হতে পারে অমুসলিমও হতে পারে। প্রতিবেশী যে ধর্মের বা বর্ণেরই হোক না কেন, সব ধরনের প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। আল কুরআনে সমাজের সকল মানুষের অধিকার আদায়ের নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, "মাতা-পিতা,আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[৪১] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"[৪২] ইসলামের

---

৩৭. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ..... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ আল কুরআন, ২৪:৩০-৩১

৩৮. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

৩৯. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ কুরআন, ৪: ৩

৪০. Muhammad Ayenuddin, Human Rights in Islam", *Journal of Society International for Islam and Modern age*, 1980, Vol. No 1, p. 40

৪১. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ আল কুরআন, ৪ : ৩৬

৪২. ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল খাতীব আল আমরী আত তিবরিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ঢাকা: কাউসার প্রকাশনী, ২য় খ. পৃ. ৪২২

মূলনীতি হলো মানুষ হিসেবে সব নাগরিকের অধিকার সমান। এখানে ধনী, গরিব, অভিজাত, নিচু বংশ, উচু বংশ, শাসক, শাসিত, ধর্ম, বর্ণের মধ্যে ব্যবধান করার সুযোগ নেই। ইসলাম নাগরিকের প্রাপ্য অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য-নীতি অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই অনারবদের ওপর এবং অনারবদেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরবদের ওপর।"[৪৩]

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়েছে। ইসলামে বাক-স্বাধীনতা, অন্যায়ভাবে আটক না হওয়া, নিজ নিজ ধর্ম পালন, ভোট প্রয়োগ ও প্রার্থী হওয়া, রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, অন্যায়ের সমালোচনা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়বিচার পাওয়া ইত্যাদি অধিকার মানবাধিকারের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। রাজনৈতিক অধিকার প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না।"[৪৪] অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচার করবে।"[৪৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"[৪৬] তিনি আরো বলেছেন, "যে সত্য কথা বলা থেকে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান।"[৪৭]এভাবে ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অধিকার

মানব আচরণের যেসব দিক উৎকর্ষ লাভ করে, তাই সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হলো, ইসলামের নীতি-আদর্শের আলোকে মানুষের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং ব্যবহারিক জীবনে তার প্রতিফলন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে উঠে বিধায় এতে ইসলামী মূল্যবোধ ও রীতিনীতি সক্রিয় থাকে। সংস্কৃতির যেসব উপাদান যেমন– মাতৃ-ভাষা, বিনোদন, শরীর চর্চার উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগহণ, সৃজনশীলতা ইত্যাদি সব অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম কাউকে নির্ধারিত সীমা অতিক্রমের অনুমতি দেয় না।[৪৮] বিনোদনসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকারকে শালীনতা, সৌজন্যবোধ ও লাভ-ক্ষতি বিবেচনায় হালাল-হারাম নীতির আওতাভুক্ত করেছে। ইসলাম কেবল ঐসব বিষয়-বস্তু হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে, যেগুলো কোনো না কোনোভাবে (শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বা পারিপার্শ্বিক) মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এখানে একজনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করার অনুমতি নেই। ফলে ইসলাম প্রবর্তিত সাংস্কৃতিক অধিকার স্থান, কাল পাত্রের উর্ধ্বে সকলের জন্য কল্যাণকর।

---

৪৩. আহমদ ইবন আবু ইয়াকূব ইবন যা'ফর, তারিখূল য়াকূবী, ২য় খণ্ড, বৈরুতঃ দারুসসদর, তা. বি. পৃ. ১১০

৪৪. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ আল কুরআন, ২৬ : ১৫১

৪৫. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ আল কুরআন, ৪ : ৫৮

৪৬. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা সাওরাতা তিরমিযী, জামে'উত তিরমিযী ২য় খণ্ড, কিতাবুল ফিতান, বাবুন মা যা'আ আফদালুল জিহাদ, আমীন কোম্পানী, দিল্লীঃ তা. বি. পৃ. ৪০

৪৭. মোল্লা জীওয়ান, *নূরুল আনোয়ার*, বাবুল ইজমা, লাহোরঃ শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, কাশ্মিরী বাজার, তা. বি. পৃ. ২১৯

৪৮. وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ আল কুরআন, ২ : ১৯০ আরো দ্রষ্টব্যঃ ৭ :৩১

ইসলাম প্রবর্তিত শিশু অধিকার

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে একটি জাতির ভবিষ্যত। তাই ইসলাম পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর শিশু অধিকার অপরিহার্য করে দিয়েছে। একটি শিশুর অন্যতম অধিকার হচ্ছে, পিতৃ-পরিচয়ের অধিকার, গর্ভকালীন ও দুধ পানকালীন যত্ন পাওয়ার অধিকার, আযান-ইকামত, সুন্দর নাম ও আকীকার অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, সুশিক্ষা পাওয়া, আল্লাহর হুকুম মানতে অভ্যস্ত করা, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া, সৎ উপদেশ পাওয়া, দুঃস্থ ও অনাথ হলে যথাযথ সেবা পাওয়ার অধিকার। এককথায় একটি শিশু আদর্শ মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ইসলাম তার সব অধিকার নিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না।"[৪৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যারা আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৫০]

ইসলাম প্রবর্তিত প্রবীণদের অধিকার

সমাজে যারা বয়োজ্যৈষ্ঠ, প্রবীণ তথা পিতা-মাতা তারাই বর্তমান সমাজ ও পরিবারের নির্মাতা। কিন্তু এ সমাজ-নির্মাতা প্রবীণরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের কাছে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। মূলত পিতা-মাতাই সমাজের প্রবীণ ব্যক্তি। ইসলাম প্রবীণদের কল্যাণে অনবদ্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহ বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ সন্তানের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।"[৫১]

ইসলাম প্রবর্তিত প্রতিবন্ধীদের অধিকার

জন্মগত বা কোনো রোগের কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে সাধারণত প্রতিবন্ধী বলা হয়ে থাকে। ইসলাম প্রতিবন্ধীদের জন্য মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি অনেক বেশি মানবিক অধিকার ঘোষণা করেছে। ইসলাম প্রতিবন্ধীদের সব ধরনের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলেছে, "অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রুগ্নের জন্য দোষ নেই।"[৫২] সতরাং ইসলাম প্রবর্তিত মানবাধিকারে প্রতিবন্ধীরা সব ধরনের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশি পাওয়ার অধিকারী।

ইসলাম প্রবর্তিত দাস-দাসীর অধিকার

ইসলাম মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেছে; কিন্তু সত্যিকার জিহাদ তথা ইসলমী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত গণীমত রূপে দাস-দাসীর বিধান বহাল আছে। ইসলাম গ্রহণ বা অন্য কোন মানবাধিকার কারণে এ প্রকার

---

৪৯. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ আল কুরআন, ১৭ :৩১

৫০. শায়েখ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল খাতীব আল আমরী আত তিবরিযী, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

৫১. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا আল কুরআন, ১৭ : ২৩

৫২. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ আল কুরআন, ২৪ : ৬১

দাস-দাসীকে মুক্ত করাকে অনেক ফযীলত পূর্ণ কাজ সাব্যস্থ করা হয়েছে। ফলে ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনায় মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে দাসদেরকে মুক্ত করতে থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.) একাই হযরত বিলাল (রা.) ও হযরত খাব্বাবসহ (রা.) প্রায় ৪০ জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তৎকালীন যুদ্ধবন্দী নর-নারীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গণ্য করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এদেরকে মুক্তিপণ, শিক্ষা দান, কিংবা বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা মুসলিম পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মত মানবিক মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতো। ইসলামের নানামুখী উদ্যোগের ফলে বর্তমান বিশ্বের কোথাও ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা সৃষ্ট দাস প্রথা চালু নেই।

ইসলামে যুদ্ধকালীন মানবাধিকার

ইসলাম শান্তি, সৌহার্দ্য, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবতার ধর্ম। যুদ্ধ, সঙ্ঘাত, সন্ত্রাস, হত্যা ও নৈরাজ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান দ্ব্যর্থহীন। অবশ্য ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। এমনকি কখনো কখনো এটি অপরিহার্য। তবে এ যুদ্ধ অন্যের রাজ্য-দখল, ক্ষমতা লাভ, মানুষের ওপর প্রভুত্ব, কিংবা সম্পদের লোভে নয়; বরং তা মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।"[৫৩] আক্রান্ত হলে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাদেরকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।"[৫৪] এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও বেসামরিক নারী-পুরুষ বা জনগোষ্ঠীকে হত্যা করা যাবে না। অকারণে গৃহপালিত পশু-পাখি, ফল ও ফসলের বাগান ধ্বংস করা যাবে না। যুদ্ধে অংশ না নেয়া শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের অবরোধ করে খাদ্য-পানির কষ্ট দেওয়া যাবে না। কারো বাড়ি-ঘরে এবং বেসামরিক স্থাপনায় হামলা করা যাবে না। নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী ও অস্ত্র ত্যাগকারী শত্রুকে হত্যা করা যাবে না। নির্বিচার গণহত্যা বা ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যাবে না। যুদ্ধ-বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। নিজ ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া যাবে না। মুক্তিপণ নিয়ে বা না নিয়েও দয়া করে মুক্ত করা যাবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ।"[৫৫] নিষ্ঠুর নির্যাতন, নিপীড়নমূলক ও কঠোর আচরণ করা যাবে না। অনাহারে, পরিধেয় বস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে বা বসবাসের অযোগ্য স্থানে রাখা যাবে না। ইসলামে এসবই মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তাই ইসলাম সংশোধনমূলক ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেয়।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নারী অধিকার

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে নারী জাতি ছিল সব ধরনের অধিকার বঞ্চিত। একুশ শতকের সভ্যতা নারী মুক্তি ও সমান অধিকারের নামে নারীর ওপর দ্বিগুণ কাজের বোঝা চাপিয়ে নতুন আঙ্গিকে নারীকে দাসত্বে আবদ্ধ করেছে। আধুনিকতা, সভ্যতা ও শিল্পের মোড়কে

---

৫৩. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ আল কুরআন, ২ : ১৯৩

৫৪. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ আল কুরআন, ২ : ১৯৪

৫৫. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ আল কুরআন, ৪৭ : ৪

নারীর ইজ্জত-আবরু ভোগ্য-পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। যৌতুক, এসিড-সন্ত্রাস, বন্ধুদের হাতে ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানী ও ধর্ষণ বেড়েই চলছে। পক্ষান্তরে ইসলাম নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও মাতা হিসেবে যে মর্যাদা দিয়েছে তা পুত্র, স্বামী ও পিতার চেয়ে বেশি। ইসলামই প্রথম রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সামরিক সর্বক্ষেত্রে নারী অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে নারী জাতিকে মর্যাদাবান করেছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।"[৫৬] ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারী যে কোনো পরিমাণ সম্পদ উপার্জন, ব্যয় ও ভোগ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।"[৫৭] ইসলাম নারীকে যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী করেছে, তা ব্যয়ের কোনো দায়-দায়িত্ব দেয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যা সন্তান রহমতস্বরূপ। নারী পুরুষ সকলের জন্য শিক্ষা গ্রহণ অবারিত করে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৫৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"[৫৯] মূলত শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষে বিভাজনের কোনো অবকাশ নেই; বরং পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষা আরো বেশি জরুরী। কেননা নারীদেরকে মা হিসেবে ভবিষ্যত জাতি গঠনের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ উপলব্ধি থেকেই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, 'আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত ও সভ্য জাতি উপহার দেব।' ইসলামে স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেরূপ অধিকার রয়েছে, তদ্রুপ স্বামীর ওপরও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে।[৬০] স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, "তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে।"[৬১] ইসলামে পিতার তুলনায় মায়ের মর্যাদা বেশি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সর্বাধিক সদাচারণ পাওয়ার অধিকার? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমার মা। এভাবে লোকটির প্রশ্নের উত্তরে তিনবারই তিনি বললেন, তোমার মা। চতুর্থবার বললেন তোমার পিতা।"[৬২] এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতার তুলনায় মায়ের হক বেশি। এভাবে ইসলাম সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সুনিশ্চিত করছে।

ইসলামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

মূলত : সংখ্যালঘু বলে ইসলামে কোনো নাগরিক নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে নাগরিক দুই প্রকার। ১. মুসলিম ও ২. অমুসলিম বা জিম্মি নাগরিক। জিম্মি নাগরিক তিন ধরনের হতে পারে।

---

৫৬. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

৫৭. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ আল কুরআন, ৪ : ৩২

৫৮. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ আল কুরআন, ৯৬ : ১

৫৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ্ আল কাযবীনী, *সুনান ইবন মাজাহ্*, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৬০. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ আল কুরআন, ২ : ২২৮

৬১. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ আল কুরআন, ৪ :১৯

৬২. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ২০০২ খ্রি.), কিতাবুল আদাব পৃ. ১৫০০, হাদিস নং ৫৯৭১

১. চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম। যাদের সাথে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আচরণ করা বাধ্যতামূলক বা ফরয। ২. পরাজিত অমুসলিম। যুদ্ধে যারা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছে। ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ অমুসলিম নাগরিক। সব ধরনের অমুসলিম নাগরিক জিযিয়া দেওয়ার বিনিময়ে সার্বিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা নিরাপত্তা কর দেওয়ার বিনিময়ে যুদ্ধ বা জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। এভাবে ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের মূল্যায়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ৩০টি ধারাসম্বলিত মানবাধিকার সনদ প্রণয়ন করে। এ সনদের মধ্যে মানবাধিকার সমন্বিত একটি তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এ অধিকারসমূহ রক্ষা কিংবা বাস্তবায়নের ক্ষমতা জাতিসংঘের নেই। এটি নিতান্তই নীতিগত বিষয়, নৈতিক উপদেশ বা আবেদন-অনুরোধের ব্যাপার। ফলে আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে এর কোনো গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জাতিসংঘ মানবজাতির সম্মানজনক ও নিরাপদ জীবন যাপনের কোনো গ্যারান্টি দিতে পারেনি। দীর্ঘ আট দশকেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাঈলের বর্বর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ কোনো প্রকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু বিবৃতি ও কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। লেবানন সঙ্কট নিরসনে কেবল শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। ১৯৪৮ সালে বার্লিন সমস্যা, ১৯৬২ সালে কিউবান মিসাইল সঙ্কট, কসোভো ও বসনিয়া হার্জেগোভিনায় যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন একতরফা হামলায় জাতিসংঘ কিছুই করতে পারেনি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এরূপ অসংখ্য ঘটনায় জাতিসংঘ কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে না পারায় প্রমাণিত হয়েছে, জাতিসংঘ বৃহৎ শক্তিগুলোর নিকট অসহায়। বিতর্কিত ভূমিকার কারণে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যক্রমকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে। কেননা মানবাধিকার ঘোষণার ছদ্মাবরণে বিশ্ব মোড়লরা পৃথিবীর দেশে দেশে নানা অজুহাতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্র বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে নিরীহ-নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর ওপর যে নারকীয় তাণ্ডব ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, জাতিসংঘ এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, দিল্লী ও মায়ানমারের সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেছেন, "মানবাধিকারের সঙ্গে জাতিসংঘ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিশ্বের কয়েকটি বড় দেশ জাতিসংঘকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমন একটি উদাহরণও নেই, যেখানে জাতিসংঘ মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে।"[৬৩] জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার রীতি থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন এ পাঁচটি দেশের 'ভেটো' ক্ষমতা (মানি না) প্রয়োগের ফলে তা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। ফলে বিশ্বব্যাপী শক্তিধর রাষ্ট্র কর্তৃক অপেক্ষকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে চরম অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতনের স্বীকার হতে হচ্ছে এবং কোটি কোটি বনি আদমকে তাদের মৌলিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে ঘোষণা করা হয় "ডিগনিটি, ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস ফর অল" এরকম অনেক চমৎকার কথা বা শ্লোগান। কিন্তু এর সাথে বাস্তবতার কি কোনো মিল আছে?

---

৬৩. সূত্রঃ banglatribune.com/৬৪২ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

এতদ্ব্যতীত জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে অধিকারের কথা বলা হলেও দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা উল্লেখ নেই। মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য, আমানত রক্ষা করা, অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট না দেওয়া, অন্যের ক্ষতি না করা, ভালো কাজের আদেশ, অন্যায় কাজে নিষেধ, প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া, মিথ্যা না বলা, হিংসা-বিদ্বেষ না ছড়ানো, সকল সৃষ্টির সাথে যথাযথ আচরণ ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়েছে যে, নাগরিকগণ পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের ভাবধারাপূর্ণ আচরণ করবে। অথচ একজন মানুষের ওপর অপর মানুষের যে অধিকার রয়েছে, রাষ্ট্র বা সরকারের ওপর নাগরিকের অধিকারের তুলনায় তা অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার ঘোষণায় তার কোনো উল্লেখ নেই।[৬৪] উন্নত রাষ্ট্রসমূহ অতিরিক্ত কার্বন নির্গত করে বায়ূ দুষণ ও শিল্প-কলকারখানার ময়লা ফেলে পানি দুষণ করে চলছে, যা বিশ্ব পরিমণ্ডল ও জলবায়ুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এতে অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহ ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। নির্বিচারে গাছকাটা, অকারণে পশু-পাখি নিধন, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীট-পতঙ্গ নিধন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে। অসচেতন মানুষের যত্র-তত্র থুথু, কফ নিক্ষেপ, পলিথিন ফেলা, যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ, প্রকাশ্যে ধুমপান ইত্যাদি আচরণ বিশ্বপ্রকৃতি ও অপর মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করে চলছে। এসব ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারে কোনো কথা উল্লেখ নেই। এটি জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিকেই স্পষ্ট করে।

তবে জাতিসংঘ মানবাধিকারের সনদ ঘোষণা করে বিশ্ববাসীর যে কল্যাণটুকু করেছে তাহলো, এ সনদ মানবাধিকারের একটি লিখিত দলিল বা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি বিশ্বভ্রাতৃত্বকে নিজেদের অধিকার রক্ষার অনুভূতি ও চেতনা দান করেছে। সমাজে ব্যক্তির গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়ায় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ নিজেদের আইন কানুন রচনা করার সময় মৌলিক অধিকারের ধারণা লাভ ও তা সংযোজন করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলাম সাম্য, মৈত্রী ও সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ-প্রদর্শক। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এক আল্লাহকে স্বীকার করে তাঁর হুকুম মেনে চলা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। ইসলামে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক ও শাসক শাসিতের অধিকার ও কর্তব্যের কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। ইসলামে অবাধ স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা কিংবা সেচ্ছাচারী আচরণের মাধ্যমে নিজ স্বার্থ রক্ষার নামে অন্যের অধিকার হরণ ও দলনের কোনো সুযোগ নেই।[৬৫] শুধু তাই নয়, এমনকি ইসলাম মানবাধিকারের পাশাপাশি বিশ্ব-প্রকৃতি তথা অন্যান্য জীব ও জড় পদার্থের সাথে মানুষের করণীয় আচরণও নির্ধারণ করে দিয়েছে।[৬৬] এককথায়, ইসলাম মানবাধিকারের পাশাপাশি দায়িত্ব-কর্তব্যের এমন এক পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত রূপরেখা মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন। এতদ্ব্যতীত জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সনদ মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়। পক্ষান্তরে ইসলামে মানবাধিকারের বিধি-বিধানসমূহ আবশ্যিক আইন এবং প্রতিপালন বাধ্যতামূলক। শুধু তাই নয়, ইসলাম মানবাধিকার লঙ্ঘনকে ইহ ও পরকালে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করেছে। ফলে এর আইনী ক্ষমতা ও মর্যাদা সর্বাধিক।

---

৬৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৬৫. আল কুরআন, ২ : ১৯০; ৭ : ৩১

৬৬. শায়েখ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্দ ইবন আব্দুল্লাহ আল খাতীব আত তিবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ একই উৎস (হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে উৎসারিত। এখানে জন্মগতভাবে কেউ উৎকৃষ্ট এবং কেউ নিকৃষ্ট নয়।[৬৭] ইসলাম মানুষের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় কৌলিণ্য, শ্রেণিবৈষম্য ও বর্ণপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে মানবজাতি! শোন, তোমাদের প্রতিপালক এক। অনারবের ওপর আরবের বা আরবের ওপর অনারবের কোনো মর্যাদা নেই। সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদারও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে হ্যাঁ অবশ্যই তাকওয়ার বিচারে।"[৬৮] ইসলাম অধীনস্তদের প্রতি সদাচারী ও ন্যায়পরায়ণ হতে নির্দেশ দিয়েছে।[৬৯] সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতার পরিবর্তে উদারতা, সাম্য মৈত্রী, ঐক্য ও মানবতা শিক্ষা দিয়েছে।[৭০] ইসলাম মানুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, শ্রমিক, দাস-দাসী, গরিব-মিসকীন, অনাথ-অসহায় মানুষ তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাও তাদেরকেও তা খেতে দেবে তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকেও তা পরিধান করতে দেবে।[৭১] ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নেতৃত্ব বা রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার মানদণ্ড হলো, তার অর্জিত জ্ঞান, তাকওয়া ও যোগ্যতা বা নেতৃত্বের গুণাবলী। ইসলামে যোগ্যতার ভিত্তিতে নাক কাটা হাবসী গোলামও রাষ্ট্রনায়ক হতে বাধা নেই।[৭২] সুতরাং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মানব রচিত কোনো সনদ বা সংবিধানের সাথে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারের তুলনা অযৌক্তিক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। মূলত ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বজনীন।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম ও মানবাধিকার সমার্থক শব্দ। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আগমনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানবাধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইসলাম ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র, সংগঠন বা সংস্থার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইসলাম ঘোষিত মানবাধিকার এবং ম্যাগনাকার্টা বা জাতিসংঘসহ এ যাবত কালের মানব রচিত সব সনদ বা ঘোষণাবলীর তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে আসমান জমিন ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে। প্রমাণিত হবে, মানুষের মন-মস্তিষ্কপ্রসূত সনদ বা ঘোষণাবলী অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী, সংকীর্ণ, ভারসাম্যহীন, পক্ষপাতদুষ্ট ও অন্তঃসারশূন্য। পক্ষান্তরে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার পরিপূর্ণ, ত্রুটিমুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ ও যথাযথ। ইসলাম মানুষকে যেসব অধিকার দিয়ে ধন্য করেছে, একজন মানুষের পক্ষে তারই মতো অপর মানুষকে সেসব অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে প্রদান করা কখনো সম্ভব নয়। এ কারণেই জাতিসংঘের ন্যায় সর্ববৃহৎ সংস্থার পক্ষ থেকে ঘোষিত মানবাধিকারের সনদ মানব জাতিকে নির্যাতন, নিপীড়ন, স্বৈরতন্ত্র, একনায়কত্ব ও ফ্যাসিবাদের

---

৬৭. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

৬৮. আহমদ ইবন আবু ইয়াকূব ইবন যা'ফর, *তারিখুল য়াকূবী*, ২য় খ. (বৈরুত: দারুসসদন, তা. বি.) পৃ. ১১০

৬৯. ۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ আল কুরআন, ৪ : ৩৬; ২: ১৭৭

৭০. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

৭১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৪

৭২. ইয়াহ্ ইবন শরফ আন-নাবাবী, *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত: দারু ইহ্ইয়াত তুরাছিল আরাবী) কিতাবুল ইমারাতে ওয়াল কাযা, হাদিস নং: ১২৯৮

হিংস্র ছোবল থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাই জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী চরম মানবতা বিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েই দায়-এড়ানোর চেষ্টা করছে। ক্ষেত্র বিশেষে জাতিসংঘকে নিরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। ভেটো ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রসমূহের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা ও অপরিনামদর্শী কৌশলের কাছে জাতিসংঘ অসহায়। ফলে ক্রমেই বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের চরম অবনতি ঘটে চলছে এবং সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো, অধিকারে সাম্য বা সমতা বিধান করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন মানবতা বিরোধী অপরাধ। তাই ইসলাম মৌলিক ও মানবিক অধিকার পূরণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র ও বিচার-ফয়সালা সর্বক্ষেত্রে সকল মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামে কাউকে বঞ্চিত করে অন্যের জন্য বিশেষ সুবিধা করে দেওয়ার সুযোগ নেই। এর অন্যতম নিদর্শন হলো, ইসলামে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো সবাইকে এক কাতারে দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করতে হয়। মনিব ও ভৃত্যকে একই বাহন ভাগাভাগি করে পথ চলতে হয়। এখানে ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু কিংবা রাজা-প্রজার প্রশ্ন অবান্তর। ইসলাম মানুষকে সমাজবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করতে ও পরস্পরের সাথে দায়িত্বশীল ও সদাচরণ করতে নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামই মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ, বংশীয় কৌলিণ্য ও সব রকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সমাজে বৃহত্তর ঐক্য, সাম্য, সুবিচার ও মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলার গ্যারান্টি দিয়েছে। মূলত ইসলামই মানবাধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবজ। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে মানবজাতি সকল দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত থেকে রক্ষা পাবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

কবরের প্রশ্নসমূহের সাথে ঈমান ও আমলের সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসেন*

[**Abstract** : Death marks the beginning of the afterlife. Many reliable hadiths inform us that everyone will face questions in the graves. These questions have a close connection to deeds and faith. If faith and acts are incorrect, these questions can not be answered. Because of faith, the Almighty Allah will bestow heaven. Without faith, no one can enter Paradise. The Almighty Allah would not accept any deed that lacks sincere faith. All human activities on Earth are connected to the three questions that will be posed to those who have passed away. Before doing anything, a man should consider whether it is what is commands of Almighty Allah to him to do or not. Is it prohibited or allowed? What guidance has the Prophet (peace be upon him) given in this respect? It becomes worship if you put this concept to work. This article briefly discusses the profound connection between actions and faith with the questions of the grave.]

[**সারসংক্ষেপ :** আখিরাতের জীবন সূচনা হয় কবরের মাধ্যমে। অসংখ্য সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় কবরে প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হবে। এ প্রশ্নগুলোর সাথে ঈমান ও আমলের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঈমান ও আমল সঠিক না হলে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। মহান আল্লাহ ঈমানের বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। ঈমান ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বিশুদ্ধ ঈমান ছাড়া কোনো আমল মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কবরে মানুষকে যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে, পৃথিবীতে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সকল কাজের সাথে এ তিনটি বিষয় জড়িত। একজন মানুষ যে কোনো কাজ করার আগে চিন্তা করবে, এ কাজটি করা বা না করার ব্যাপারে আমার রবের নির্দেশনা কী? এটি হালাল নাকি হারাম? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশনাই কী? এ চিন্তা ভাবনার সাথে কাজটি করলে তা ইবাদাতে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে কবরের প্রশ্নসমূহের সাথে ঈমান ও আমলের গভীর সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।]

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানুষকে ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। 'ইবাদাত'ই মূল উদ্দেশ্য। ইবাদাতের সাথে কয়েকটি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট রয়েছে। 'ইবাদাত' যার করা হয় তাকে মা'বুদ বলা হয়।

* লেখক সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

ইবাদাত কার করবো? আমার মা'বুদ কে? আমার মা'বুদ কয়জন? প্রথম বিষয় আমার ইবাদাতের মালিক খুঁজে বের করতে হবে। কেন তাঁর ইবাদাত করবো? অন্য কেউ আমার ইবাদাত পেতে পারে কি-না? দ্বিতীয় বিষয় ইবাদাত কী? কোনগুলো তাঁর ইবাদাত? মা'বুদ কোন ধরনের ইবাদাত চান? তৃতীয় বিষয় ইবাদাত কার দেখানো পদ্ধতিতে করবো? ইবাদাত শিখবো কার কাছ থেকে? কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে মা'বুদ কবুল করবেন, আর কোন পদ্ধতিতে ইবাদাত করলে কবুল করবেন না? এ তিনটি বিষয়ের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতেই হবে। কারণ, আমরা হলাম আবদ বা বান্দা। আমাদের কাজই হলো, ইবাদাত বা বন্দেগী করা। এ তিনটি বিষয়ের সঠিক উত্তর না জেনে সঠিকভাবে ইবাদাত করা যায় না। করলেও সে ইবাদাত বাতিল হয়ে যায়। কবরের এ তিনটি প্রশ্নের সাথে পৃথিবীর প্রত্যেকটি কাজের সম্পর্ক রয়েছে। কোনো কাজ এ তিনটি বিষয় সামনে না রেখে করা যাবে না। নিম্নে এ প্রশ্নসমূহের সাথে ঈমান ও আমলের সম্পর্ক আলোচনা করা হলো:

কবরের পরিচয়

কবর (قبر) শব্দটি আরবি। একবচন, বহুবচনে قبور। মানুষ মৃত্যুর পর তাকে যেখানে রাখা হয়, তাকে কবর বলা হয়।[১]

পারিভাষিক অর্থে কবর হলো,

القَبْرُ: مَدْفَنُ الْإِنْسَانِ أَي جَعَلَهُ مَقْبُورًا مِمَّنْ يُقْبَرُ. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِمَّنْ يُلْقَى لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.

"কবর হলো মানুষের দাফন করার স্থান অর্থাৎ তাকে একটি গর্তে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, যেখানে কোনো পাখি ও হিংস্র জন্তু পাবে না"।[২]

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রথম স্তর হলো কবরের জীবন। কবরের নিয়ামত ও তার আযাব সত্য। এর প্রমাণস্বরূপ অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

"আল্লাহ তা'আলা অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা, দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে"।[৩]

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ

"অতঃপর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হয়, তবে তার জন্য থাকবে বিশ্রাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় জান্নাত"।[৪]

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"আগুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয়, আর যেদিন ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), ফিরআউনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও"।[৫]

---

১. আয-যুবাইদী, মুরতাদা, *তাজুল উরুস*, হুকুমাতুল কুয়েত প্রকাশনী, কুয়েত, ১৯৬৫ খ্রি., খ. ১৩, পৃ. ৩৫৫।

২. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরাব*, দারু সাবির, ৪র্থ প্রকাশ, কায়রো, ২০০৫ খ্রি., খ. ১২, পৃ. ৮।

৩. *আল-কুরআন*, সূরা ইবরাহীম, ১৪; ২৭।

৪. *আল-কুরআন*, সূরা আল-ওয়াক্বি'আ, ৫৬; ৮৮-৮৯।

৫. *আল-কুরআন*, সূরা গাফির, ৪০; ৪৬।

আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন,

"لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ"

"তোমরা মৃতদেরকে দাফন বর্জন করবে- এ ভয় না থাকলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, যেন তিনি তোমাদেরকে কবরের কিছু আযাব শুনিয়ে দেন"।[৬]

মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর তার একটি পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার কবর নিয়ামতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে তার কবর শাস্তিপূর্ণ হয়ে যাবে। আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন,

"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا". قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ "وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ"

"বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে, সে তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়; এ সময় দু'জন ফেরেশতা তার নিকট এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থান স্থলটির দিকে নজর কর, আল্লাহ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থান স্থল দান করেছেন। তখন সে দুটি স্থলের দিকেই দৃষ্টি করে দেখবে। কাতাদা (র) বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, "সে ব্যক্তির জন্য তাঁর কবর প্রশস্থ করে দেয়া হবে।" অতঃপর তিনি (কাতাদা) পুনরায় আনাস (রা:) এর হাদীসের বর্ণনায় ফিরে আসেন। তিনি (আনাস) বলেন, "আর মুনাফিক বা কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হবে তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে কী বলবে? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতো আমি তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার মুগুর দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দু' জাতি (মানুষ ও জিন) ছাড়া তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে"।[৭]

কবরের প্রশ্নসমূহ

সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। বারা ইবনু 'আযিব (রা:) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন,

---

৬. *আস-সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : কিতাবুল জান্নাহ, অনুচ্ছেদ : ইসবাতু আযাবিল কাবর, দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত : ১৪২৩ হি., হাদীস নং ২৮৬৮।

৭. *আস্ সহীহ বুখারী*, অধ্যায় : আল-জানায়েয, পরিচ্ছেদ : মা যাআ ফি আযাবিল কাবর, রিয়াদ : ২০০০ খ্রি., হাদীস নং ১৩৭৪।

"وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللهُ . فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : دِينِي الإِسْلَامُ . فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَيَقُولَانِ : وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ"

"অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করবে, তোমার রব কে? তখন সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে প্রশ্ন করবে, তোমার দীন কী? সে বলবে, আমার দীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করবে, যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)। তারপর তারা উভয়ে আবার বলবে, তুমি কি করে জানতে পারলে? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি"।[৮]

উক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, কবরে প্রত্যেক মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

১. তোমার রব কে?
২. তোমার দীন কী?
৩. তোমার নবী কে?

তাহলে প্রত্যেক মানুষকে এ তিনটি প্রশ্নের আলোকে জীবন গড়তে হবে। বান্দা তার রবকে চিনতে হবে, তার দীন সম্পর্কে জানতে হবে, তার রবের প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে চিনতে হবে। এ তিনটি প্রশ্নের সাথে ঈমান ও আমলের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

১. রবের পরিচয়

রবের চারটি অর্থ রয়েছে,

ক. মনিব : আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ

"আর তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে ধারণা করল তাকে বলল, তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে"।[৯]

খ. মালিক : আল্লাহ তা'আলার বাণী,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

"অতএব তারা যেন এ গৃহের মালিকের ইবাদাত করে"।[১০]

গ. একত্রকারী : আল্লাহ তা'আলার বাণী,

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ

"হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন একদিন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই"।[১১]

---

৮. সুনানে আবূ দাউদ, অধ্যায় : কিতাবুস সুন্নাহ, পরিচ্ছেদ : ফিল মাসআলাহ ফিল কবর ওয়া আযাবিল কবর, আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরূত : তা.বি., হাদীস নং ৪৭৫৩।

৯. *আল-কুরআন*, সূরা ইউসূফ, ১২:৪২।

১০. *আল-কুরআন*, সূরা আল-কুরাইশ, ১০৬ ; ৩।

ঘ. প্রতিপালনকারী : আল্লাহ তা'আলার বাণী,

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

"তুমি তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ করো, যিনি সৃষ্টি করেন। অতঃপর সুসম করেন। আর যিনি নিরূপন করেন অতঃপর পথ নির্দেশ দেন"।[১২]

অসংখ্য দলীল প্রমাণের মাধ্যমে রবকে চিনা যায়। আমাদের রব হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। স্বভাবগতভাবে, বিবেক আকলের মাধ্যমে, আসমানী কিতাব ও নবী রাসূলগণের মাধ্যমে এবং অনুভূতির মাধ্যমে রবকে চিনা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে"।[১৩]

ইবাদাত একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই করতে হবে। কোনো ইবাদাতই একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যাবে না। একটি ইবাদাতও আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য করলে সে কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের ব্যাপারে আলোচনা করা হলো:

ক. প্রার্থনা করা, চাওয়া (الدعاء)

দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। দু'আ মানে কোনো কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা প্রভৃতি। অভিধানে এসেছে,

"وَهُوَ أَنْ تُمِيلَ الشَّيْءَ إِلَيْكَ بِصَوْتٍ وَكَلَامٍ"

"কথা ও আওয়াজের মাধ্যমে কোনো কিছুকে পেশ করা"।[১৪]

"الدُّعَاءُ لِلْقَرِيبِ وَالنِّدَاءُ لِلْبَعِيدِ"

"দু'আ শব্দটি নিকটবর্তীর জন্য ব্যবহার করা হয়, নিদা শব্দটি দুরবর্তীর জন্য ব্যবহার করা হয়"।[১৫]

দু'আ দু'ধরনের হয়ে থাকে।

১. কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য চাওয়া : যখন বান্দা নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমতের প্রত্যাশী হয় তখন এটি ইবাদাতে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

---

১১. *আল-কুরআন*, সূরা আল-ইমরান, ৩ ; ৯।

১২. *আল-কুরআন*, সূরা আল-আ'লা, ৮৭ ; ১-৩।

১৩. *আল-কুরআন*, সূরা আল-ইমরান, ৩; ১৯০।

১৪. আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়া, তাহক্বীক, আব্দুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, *মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ*, মাত্ববায়া মুসত্বাফা আল-হালবী, দ্বিতীয় প্রকাশ, মিশর : ১৯৭০ খ্রি., পৃ. ১৮২।

১৫. আবুল বাকা আইয়ূব বিন মূসা, *আল-কুল্লিয়্যাত মু'জামু ফিল মুসত্বালাহাত*, হামদ আল মিসরী, দামেশক : তা.বি., খ.২০, পৃ. ৩৩৩।

"তোমাদের রব বললেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে"।[১৬]

২. ক. ইবাদাত হিসেবে চাওয়া : যখন বান্দা বিপদে-আপদে, অভাব-অনটনে, সাহায্যের জন্য একমাত্র অভাব পূরণকারী, বিপদ-আপদ দূরকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট সাওয়াবের আশায়, শাস্তির ভয়ে কোনো কিছু চায়, এটি ইবাদাত হিসেবে চাওয়া। নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন,

"اَلدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ"

"দু'আও একটি ইবাদাত"।[১৭]

খ. ভয় করা

কোনো প্রকারের ধ্বংস, ক্ষতি বা কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভয় করা। এ প্রসঙ্গে সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বলেন,

"اِضْطِرَابُ الْقَلْبِ وَحَرَكَتُهُ مِنْ تَذَكُّرِ الْمَخُوفِ"

"যাকে ভয় করা হয় তার স্মরণে অন্তরের বিচলতা ও কম্পনকে 'খাওফ' বা ভয় করা বুঝানো হয়"।[১৮]

গ. আশা করা

আশা করাও একটি ইবাদাত। বান্দা অনুগত হয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই আশা করবে। এ প্রসঙ্গে সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বলেন,

"اَلرَّجَاءُ هُوَ تَأَمُّلِ الْخَيْرِ وَقُرْبَ وُقُوعِهِ"

"যাবতীয় কল্যাণের এবং তা পাওয়ার কাছাকাছি হওয়ার আশা করাই 'রাজা'।[১৯]

ঘ. ভরসা করা

কোনো জিনিসের উপর ভরসা করা মানে তার উপর নির্ভরশীল হওয়া। একমাত্র মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার এবং ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ। উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা বিপদাপদ দূর করার উদ্দেশ্যে কোনো মৃত ব্যক্তির উপর ভরসা করা শির্ক। এ প্রসঙ্গে খালিদ বিন আবদুর রহমান বলেন,

"التَّوَكُّلِ: هُوَ صِدْقُ اعْتِمَادِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي اسْتِجْلَابِ الْمَصَالِحِ، وَدَفْعِ الْمَضَارِّ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كُلِّهَا"

---

১৬. *আল-কুরআন*, সূরা গাফির, ৪০; ৬০।

১৭. সুনান আত-তিরমিযী, অধ্যায় : কিতাবুদ দাওয়াত, পরিচ্ছেদ : ফাদলুদ দু'আ, দারুস সালাম, রিয়াদ : ২০০০ খ্রি., হাদীস নং ২৯৬৯।

১৮. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, *নাদরাতুন নাঈম ফি মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম (সা:)*, দারুল ওয়াসীলাহ লিন নাসর ওয়াত তাওযী', রিয়াদ : ১৯৮৫, পৃ. ১৮৬৬।

১৯. সালেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, *নাদরাতুন নাঈম ফি মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম (সা:)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২২।

"দুনিয়া ও আখিরাতের প্রত্যেকটি ব্যাপারে কল্যাণকর বিষয় লাভ করা এবং ক্ষতিকর বিষয় দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর অন্তরের নির্ভরশীলতার সত্যায়নই 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা করা"।[২০]

ঙ. আগ্রহ, ভীতি ও বিনয়ী হওয়া

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রিয় ব্যক্তি বা জিনিসকে ভালোবাসার আগ্রহ, কোনো কাজের মাধ্যমে ভয় করা, আর আল্লাহ তাআলার বিশালত্বের সামনে কারো এমনভাবে বিনয়ী হওয়া, যাতে সে ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় আল্লাহ তাআলার সামনে আত্মসমর্পণ করে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسٰرِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خٰشِعِينَ

"তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী"।[২১]

চ. সশ্রদ্ধ ভয়

সশ্রদ্ধ ভয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এটি একমাত্র মহান আল্লাহকেই করতে হয়। এ সম্পর্কে অভিধানে এসেছে,

"اَلْخَشْيَةُ: اَلْخَوْفُ، تَكُونُ فِي الْقُلُوبِ، تَظْهَرُ آثَارُهَا عَلَى الْجَوَارِحِ بِالِانْخِفَاضِ وَالسُّكُونِ"

"আল-খাশাইয়াতু অর্থ ভয় করা, এ ভয় অন্তরে হয়ে থাকে। তবে স্থিরতা ও বিনয়ী ভাবের মাধ্যমে তা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়"।[২২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

"সুতরাং, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর"।[২৩]

ছ. ফিরে আসা

আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। ইমাম ত্বাবারী (রঃ) বলেন,

"اَلْإِنَابَةُ هِيَ الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ التَّوْبَةِ"

"তাওবার পরে পরিপূর্ণভাবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে 'ইনাবাহ' বা ফিরে আসা বলে বোঝানো হয়"।[২৪]

---

২০. খালিদ বিন আবদুর রহমান আস-সাঈ, *আত্-তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ*, দারুল ওয়াত্বান, রিয়াদ : ২০১০ খ্রি., পৃ. ০২।

২১. *আল-কুরআন*, সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ ; ৯০।

২২. আবুল হুসাইন আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়া, তাহক্বীক, আব্দুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, *মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৪।

২৩. *আল-কুরআন*, সূরা আল-বাকারাহ, ০২ ; ১৫০।

২৪. আত-তাবারী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, *জামিউল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন (তাফসীরে ত্বাবারী)*, দারুল ফিকর, বৈরুত : ১৯৮৮ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ২৮০।

জ. সাহায্য চাওয়া

বিভিন্ন প্রয়োজনে বান্দা তার রবের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সহকারে কোনো কিছুর সাহায্য চাওয়া, বিষয়টি তার রবের নিকট সোপর্দ করা, এটি প্রদানে রবই যথেষ্ট - এ বিশ্বাস পোষণ করা, এটি একটি ইবাদাত। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই"।[২৫]

এ প্রসঙ্গে ড. সালিহ বিন ফাওযান বলেন,

"الِاسْتِعَانَةُ: طَلَبُ الْعَوْنِ، هِيَ طَلَبُ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْعَبْدُ من الْفِعْلِ، وَيُوجِبُ السَّيْرَ عَلَيْهِ"

"'ইস্তেআনা' হলো সাহায্য চাওয়া। বান্দা যে কোনো কাজে অপারগতা প্রকাশ করে তা পাওয়ার জন্য যে কামনা করা হয় তাই 'ইস্তেআনা'"।[২৬]

ঝ. আশ্রয় চাওয়া

কারো নিকট কষ্টদায়ক বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ বিশ্বাস নিয়ে আশ্রয় চাওয়া যে, আশ্রয় চাওয়া বিষয়ে তিনি আশ্রয় দিতে সক্ষম, তিনি তাকে রক্ষাও করতে পারেন। ইমাম ইবনে কাসীর (রহ:) বলেন,

"هِيَ الِالْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ وَالِالْتِصَاقُ بِجَنَابِهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، وَالْعِيَاذَةُ تَكُونُ لِدَفْعِ الشَّرِّ"

"সব ধরণের অনিষ্টতা থেকে এবং অনিষ্টতার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া"।[২৭]

ঞ. পরিত্রাণ চাওয়া

বিপদ-মুসিবত ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিত্রাণ চাওয়া। মহান আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাওয়া ইবাদাত। কোনো মৃত ব্যক্তির নিকট অথবা জীবিত ব্যক্তির নিকট পরিত্রাণ চাওয়া, যারা পরিত্রাণ দিতে অক্ষম, এ জাতীয় পরিত্রাণ চাওয়া শির্ক। পারিভাষিকভাবে পরিত্রাণ চাওয়া হলো,

"الِاسْتِغَاثَةُ هِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ فِي الشَّدَائِدِ وَالأَزَمَاتِ"

"বিপদে-আপদে ও কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিত্রাণ চাওয়া"।[২৮]

ট. যবেহ করা

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট নিয়মে পশুর রক্ত প্রবাহিত করাকে 'যবেহ' বলে। এটি বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার মহত্বকে সামনে রেখে, তাঁর সামনে নিজের দীনতা প্রকাশ করে, তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা একটি ইবাদাত।

---

২৫. *আল-কুরআন*, সূরা আল-ফাতিহা, ০১ ; ০৫।

২৬. আল-ফাওযান, ড. সালিহ বিন ফাওযান, *শারহুল উসূলিছ ছালাছাহ*, মুআসসাতুর রিসালাহ, রিয়াদ : ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১৪৪।

২৭. ইবন কাসীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন উমার, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, দারুল ফিকর, বৈরুত : তা.বি., খ.১, পৃ. ১৬।

২৮. আবুল বাকা আইয়ূব বিন মূসা, *আল-কুল্লিয়্যাত মু'জামু ফিল মুসত্বালাহাত*, প্রাগুক্ত, খ.২০, পৃ. ১৫৯।

মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'। তাঁর কোনো শরীক নেই"।[২৯]

আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেন,

"لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ"

"যে লোক আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কারো নামে যবেহ করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন"।[৩০]

ঠ. মান্নত করা

মানুষ কোনো কিছু নিজের জন্য আবশ্যক করে নেওয়া অথবা মহান আল্লাহ যা ওয়াজিব করেননি, তা নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া, এটিকে শরী'আতের পরিভাষায় মান্নত করা বলা হয়। যখন কোনো মানুষ মহান আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মান্নত করে, এটি তখন একটি ইবাদাতে পরিণত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত"।[৩১]

ইবনু উমার (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

"إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ"

"তা কোনো রকম কল্যাণ বয়ে আনে না। তবে এর মাধ্যমে কৃপণ লোকের থেকে কিছু বের করা হয়"।[৩২]

২. দীনের পরিচয়

কবরের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, তোমার দীন কী? তাই আমাদেরকে দীন সম্পর্কে জানা আবশ্যক। যে বিষয়গুলো জানতে হবে, তা হলো দীন কী? দীনের স্তর কয়টি? ইসলাম, ঈমান ও ইহসান কাকে বলে এবং প্রত্যেকটির রুকন কয়টি? তা ভালোভাবে জানতে হবে। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন ইসলামকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল-প্রমাণ সহকারে জানা।

ইসলামের সংজ্ঞা

اَلْإِسْلَامُ هُوَ الاسْتِسْلامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

---

২৯. *আল-কুরআন*, সূরা আল-আন'আম, ০৬ ; ১৬২-১৬৩।

৩০. *আস-সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : কিতাবুল আদ্বাহি, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুয যবহি লিগাইরিল্লাহি তাআলা ওয়া লা'নু ফায়িলিহি, বৈরুত : ১৪২৩ হি. হাদীস নং ১৯৭৮।

৩১. *আল-কুরআন*, সূরা আল-ইনসান, ৭৬ ; ০৭।

৩২. আল-বুখারী, ইস্‌মা'ঈল, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল কাদর, পরিচ্ছেদ : ইলকাউন নাযরিল আবদি ইলাল কাদর, রিয়াদ : ২০০০ খ্রি., হাদীস নং ৬৬০৮।

"ইসলাম হলো, তাওহীদ সহকারে মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে এবং শির্ক ও শির্ককারীদের থেকে বিমুক্ত হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে যাওয়া"।[৩৩]

মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ দু'ধরণের হয়ে থাকে। একটি হলো বাধ্য হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়া, এটি ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। এ ধরণের অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলা হয় না। অপরটি হলো, ইবাদাতসমূহকে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাওহীদ সহকারে মহান আল্লাহর অনুগত হওয়া। এটিকেই ইসলাম বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ

"অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে"।[৩৪]

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত যে দীন সেটিই হলো এই ইসলাম। মহান আল্লাহর কাছে তাওহীদ সহকারে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যম হলো দু'টি।

১. আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ মানতে হবে এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. শির্ক এবং শির্ককারীদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করো তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আন"।[৩৫]

দীনের স্তর

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং একমাত্র অনুমোদিত 'দীন' এর তিনটি স্তর রয়েছে। ১. ইসলাম ২. ঈমান ৩. ইহসান। প্রত্যেক স্তরের আবার কয়েকটি রুকন রয়েছে।

১. দীনের প্রথম স্তর ইসলাম

ইসলামের রুকন হলো ৫টি। ১. কালেমার সাক্ষ্য প্রদান ২. সালাত কায়েম করা ৩. যাকাত আদায় করা ৪. সিয়াম পালন করা ৫. বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করা। ইবনু উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لا إله إِلّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقامِ الصَّلاةِ، وَإِيتاءِ الزَّكاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضانَ"

---

৩৩. আল-ফাওযান, ড. সালিহ বিন ফাওযান, *শারহুল উসূলিছ ছালাছাহ*, মুআসসাতুর রিসালাহ, রিয়াদ : ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১০৫।
৩৪. *আল-কুরআন*, সূরা আল-ইমরান, ০৩ ; ৮৩।
৩৫. *আল-কুরআন*, সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০ ; ০৪।

"পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লায় হজ্জ পালন করা এবং রামাদান মাসের সিয়াম পালন করা"।[৩৬]

২. দীনের দ্বিতীয় স্তর ঈমান

ঈমান শব্দের অর্থ স্বীকার করা, মেনে নেওয়া, সত্যায়ন করা প্রভৃতি। পরিভাষায় অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করাকেই ঈমান বলা হয়। ঈমানের ৭০ টিরও বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই, এ সাক্ষ্য দেয়া। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

ঈমানের রুকন হলো ৬ টি। যা হাদীসে জিবরাঈল এর মধ্যে এসেছে। যখন জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কী? নবী (সা.) উত্তরে বললেন,

"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"

"ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে"।[৩৭]

৩. দীনের তৃতীয় স্তর হলো ইহসান

ইহসানের রুকন হলো এক টি। আর তা হলো- এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যেন তাঁকে দেখছি, যদি তাকে দেখতে না পাই অন্তত এতটুকু অনুভব করা যে, তিনি আমাকে দেখছেন। মহান আল্লাহর বাণী,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল"।[৩৮]

হাদীসে জিবরাঈল (আ.) এর মধ্যে ইহসানের সংজ্ঞা এসেছে এভাবে,

"أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"

"ইহসান এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তাকে না দেখ তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে"।[৩৯]

ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কিছু কারণ রয়েছে, এ কারণগুলো থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখতে হবে। না হয় দীনের উপর টিকে থাকা সম্ভব হবে না। ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলো জানা প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরয।

---

৩৬. *আস-সহীহ*, আল-বুখারী, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ : কাওলুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন..." , রিয়াদ : ২০০০খ্রি., হাদীস নং ০৮।

৩৭. *আস-সহীহ* মুসলিম, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ : বায়ানু আরকানিল ঈমান ওয়াল ইসলাম ; বৈরুত : ১৪২৩ হি. হাদীস নং ০৮।

৩৮. *আল-কুরআন*, সূরা আন-নাহল, ১৬ ; ১২৮।

৩৯. *আস-সহীহ* মুসলিম , অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ : বায়ানু আরকানিল ঈমান ওয়াল ইসলাম ; বৈরুত : ১৪২৩ হি. হাদীস নং ০৮।

৩. নবী মুহাম্মদ (সা.) এর পরিচয়

কবরের তৃতীয় প্রশ্ন হলো, মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে। নবী (সা.) সম্পর্কে জানা পাঁচটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

ক. তাঁর বংশ-পরিচয় সম্পর্কে জানা

তিনি এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী, কুরাইশি ও হাশেমী। তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। তিনি ইবরাহীম (আঃ) এর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর।

খ. তাঁর বয়স, জন্মস্থান এবং হিজরতের স্থান সম্পর্কে জানা

তাঁর মোট বয়স তেষট্টি বছর। জন্মস্থান মক্কায়। হিজরতের স্থান মদীনা। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তেপ্পান্ন বছর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে দশ বছর জীবিত ছিলেন। অতঃপর এগারো হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

গ. তাঁর নবুওয়াতের তেইশ বছর সম্পর্কে জানা।

নবুওয়াতের তেইশ বছর সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ঘ. তিনি কিভাবে নবী ও রাসূল হলেন, সে সম্পর্কে জানা

তিনি নবী হলেন, যখন মহান আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ؕ

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না"।[৪০]

অতঃপর তিনি রাসূল হলেন, যখন মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন।

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

"হে বস্ত্রাবৃত, উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোষাক-পরিচ্ছেদ পবিত্র কর। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্যধারণ কর"।[৪১]

আহলুল ইলমদের মতে, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য হলো- যাদের প্রতি এমন শরী'আত সহকারে ওহী নাযিল করা হয়, যে শরী'আত প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয় না, তাঁরাই হলেন নবী। আর যাদের প্রতি এমন শরী'আত সহকারে ওহী নাযিল করা হয়, যে শরী'আত প্রচার এবং তদানুযায়ী আমলের নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাঁরা হলেন রাসূল। প্রত্যেক রাসূল নবীও হবেন, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।

---

৪০. *আল-কুরআন*, সূরা আল-আলাক, ৯৬ ; ১-৫।

৪১. *আল-কুরআন*, সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪ ; ১-৭।

ঙ. তিনি কী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন? সে সম্পর্কে জানা।

তিনি মহান আল্লাহর তাওহীদ সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। একজন মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ শরী'আত সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে শির্ক, কুফর ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে বের করে তাওহীদ, ঈমান ও ইলমের আলোর দিকে পথ দেখান, এর দ্বারা মানুষ মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং তাঁর শাস্তি ও কঠোরতা থেকে রক্ষা পাবে। দশ বছর পর্যন্ত তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহবান করেন। দশ বছর পর তাঁর মিরাজ সংগঠিত হয়। তখন মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। অতঃপর তিন বছর মক্কায় সালাত আদায় করেন। তিন বছর পর তাঁকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

উপসংহার

কবরের এ তিনটি প্রশ্নের মধ্যে সমগ্র দীন অন্তর্ভুক্ত। দীনের এমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই, যার সাথে এ তিনটি প্রশ্নের সম্পৃক্ততা নেই। আকীদা, ইবাদাত, লেন-দেন, আচার-আচরণ, আখলাক সবক্ষেত্রে এ তিনটি প্রশ্ন সংযুক্ত রয়েছে। এ তিনটি প্রশ্ন ঈমানের তিনটি মূলনীতি। এ তিনটি মূলনীতির ইলম শিখতে হবে। আমরা ইলমের মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিধিবিধান মেনে নিতে এবং তা পালন করতে এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে যাব, যাতে শরী'আতের প্রতি অন্তরে বিন্দুমাত্র অপছন্দ না থাকে। ইলমের মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের প্রতি এমনভাবে ধাবিত হব, যাতে তাঁর আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। এ তিনটি মূলনীতি জানার পরে এগুলো মানতে হবে। কারণ, আমল করার জন্যই ইলম। আমলবিহীন ইলমের কোনো গুরুত্ব নেই। এ তিনটি মূলনীতির দাওয়াত দিতে হবে। কারণ, এ মূলনীতিগুলো সকল মানুষের জন্য। মহান আল্লাহকে একমাত্র রব মেনে নেওয়া, ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে গ্রহণ করা এবং মুহাম্মাদ (সা.) কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইত্তেবা করার জন্য দাওয়াত দেওয়া এটি প্রত্যেক মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ তিনটি মূলনীতির দাওয়াতের সাথে অবশ্যই ধৈর্য থাকতে হবে। কারণ, এ তিনটি মূলনীতি গ্রহণ করলে ঐ ব্যক্তির আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে। এ ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত সকল বাতিল মা'বুদকে ও তাগূতকে পরিহার করবে। এতে বাতিল মা'বুদের পূজারীগণ, তাগূতের অনুসারীগণ, বিভিন্ন জীবন ব্যবস্থার ধারক-বাহকগণ, বিভিন্ন ব্যক্তির আদর্শের অনুসারীগণ তাকে অপছন্দ করবে। এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ ব্যতীত তার আর কোনো উপায় নেই।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

হাদীস গ্রন্থসমূহের ধারাক্রম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান: একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. মো: মিজানুর রহমান *

Abstract

The sayings, actions and silent consent of Prophet Muhmmad (PBUH) are called Hadith. Hadith is also revealed knowledge, i.e., Allah's guidance to the Prophet, which the Prophet upheld, expressed in his words, implemented through his actions, and approved. The compilation and preservation of Hadith began during the time of Prophet Muhammad (sm.). This compilation of Hadith was completed gradually over a long period. It seems that the compilation of Hadith was completed with collection of the maximum hadith of Prophet Muhammad (sm.) in book form, from second half of the third century hijri to the end of the fifth century. A group of Sahabah, Tabi'een, Tabe-Tabi'een, and prominent early Hadith specialists, who were dedicated to acquiring the knowledge of Hadith and disseminating it to others, made significant contributions to the compilation of Hadith. Along with memorizing Hadith, all these individuals also recorded Hadith in written form. Therefore, from the initial stage of Hadith compilation to its completion, many manuscripts or books of Hadith were compiled. These books are mainly the preservers and bearers of all the Hadiths of Prophet Muhammad (PBUH). Islamic scholars and hadith specialist believe that there is no any new hadiths outside of these books. However, many Hadith were compiled in the books of tarikh (history), sirat (biography of Prophet peace be upon him) and tafseer (explanation of Holy Qur'an). Since the final stage of the compilation of Hadith until today, Hadith specialists who compiled Hadith with different approaches, such as recognizing sahih or dhaeef Hadith or subject-based Hadith compilations, have mainly relied on the Hadith books compiled up to the 5th century hijri. Therefore, if any reader or researcher of Hadith wants to know the main source of a Hadith, they must refer to these foundational Hadith books. Thus, the Hadith books were compiled up to the 5th century are a very important and invaluable asset to

* সিজিইডি (ইসলামিক স্টাডিজ), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মুগদা, ঢাকা।

the Muslim ummah, as they are the main sources for preserving Hadith and the knowledge of Hadith. Because of this, it is necessary for every reader and researcher of Hadith to understand the sequence, identity, and standard of these books so they can easily determine the authenticity of Hadith.

সার-সংক্ষেপ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলা হয়। হাদীসও ওহী জ্ঞান তথা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়াদি যা মহানবী (সা.) ধারণ করে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ও কাজে বাস্তবায়ন করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন। আর মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন কাজের সূচনা হয়। এ সংকলন কার্য দীর্ঘসময়ে পর্যায়ক্রমে চূড়ান্তরূপ লাভ করে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশ হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মহানবীর প্রায় অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সংকলন কাজের পরিসমাপ্তি হয় বলে ধরে নেয়া হয়। হাদীসের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণে নিবেদিত একদল সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও প্রতিথযশা প্রবীণ মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের এ কাজে সবিশেষ অবদান রাখেন। এসব মহান মনীষী হাদীস মুখস্থ করার পাশাপাশি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। ফলে হাদীস সংকলনের সূচনা লগ্ন থেকে হাদীস সংকলনের চূড়ান্ত কাল পর্যন্ত সংকলিত হয় হাদীসের অনেক পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ। এসব হাদীসগ্রন্থই মূলত মহানবীর সকল হাদীসের ধারক-বাহক। এসব গ্রন্থের বাহিরে নতুন কোন হাদীসের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করেন ওলামা ও মুহাদ্দিসগণ। হাদীস সংকলনের চূড়ান্তকাল উত্তরণের পর অদ্যাবধি যেসব প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে যেমন হাদীসের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা নির্ণয়পূর্বক হাদীসগ্রন্থ সংকলন কিংবা হাদীসের বিষয়ভিত্তিক সংকলন ইত্যাদি রচনা করেছেন, হাদীস সংগ্রহে তারা মূলত হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন। সুতরাং হাদীসের কোন পাঠক বা গবেষক হাদীসের মূল উৎস সম্পর্কে জানতে চাইলে, তাকে এসব গ্রন্থের দিকে ফিরে যেতে হবে। খুব সঙ্গত কারণেই হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত যেসব হাদীসগ্রন্থ রচিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর কাছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক অমূল্য সম্পদ। কেননা হাদীস সম্ভার বা হাদীসের জ্ঞান সংরক্ষণে এগুলোই হলো মূল কিতাব। আর এ কারণেই হাদীসের সকল পাঠক ও গবেষকের এ কিতাবগুলোর ধারাক্রম, পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেননা এ বিষয়টি জানা থাকলে একজন পাঠক সহজেই হাদীসের মান ও অবস্থান বুঝতে পারবেন।

মূল শব্দসমূহ: হাদীস, হাদীস সংকলন, হাদীসগ্রন্থসমূহ, সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ।

ভূমিকা

হাদীস ইসলামী শরী'আর দ্বিতীয় উৎস। কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগস্বরূপ। কুরআন বুঝা ও শরী'আহ মেনে চলার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। যে কারণে সাহাবায়ে কেরাম এবং সাহাবীগণের পরবর্তী যুগে মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস সংরক্ষণে সবিশেষ গুরুত্ব দেন। হাদীস মুখস্থকরণ, সংকলন ও হাদীসের ওপর আমলের মাধ্যমে মূলত: হাদীস সংরক্ষণ করা হয়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ হয়। হাদীসকেন্দ্রীক নানাবিধ সংশয় ও সন্দেহ দূরীকরণে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানের আবিস্কার করেন মুহাদ্দেসীনে কেরাম। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সহীহ ও যঈফ

হাদীস আলাদা করা হয়। হাদীস একটি মৌলিক বিষয়। ইসলামী জীবনচর্চায় হাদীস আবশ্যিকভাবে মেনে চলতে হয়। সে কারণে হাদীসের জ্ঞানার্জন ফরয। তবে হাদীসের মানগত অবস্থান জানা থাকলে মানসিক দৃঢ়তা ও প্রশান্তির সাথে হাদীসের ওপর আমল করা যায়। হাদীস সংকলনের ইতিহাস, সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের ধারাক্রম ও অবস্থান জানা থাকলে হাদীসের মানগত অবস্থান জানা সহজ হয়। অতএব, এ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বক্ষমান প্রবন্ধে হাদীস সংকলনের মূলকথা, মহানবীর যুগ থেকে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত রচিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থসমূহের ধারাক্রম, পরিচিতি ও অবস্থান, এসব গ্রন্থের সংরক্ষণ, অধ্যয়ন ও চর্চার গুরুত্ব এবং বর্তমান ও আগামী সময়ে নানা আঙ্গিকে হাদীস গবেষণা ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার প্রয়াস নেব।

হাদীস সংকলনের মূলকথা

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন। মহানবী (সা.) 'আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে কতিপয় বিধি-বিধান শিক্ষাদানের পর তাদেরকে বলেন, 'তোমরা একে ভাল রূপে মুখস্থ করে নাও এবং যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌঁছে দাও। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৮৭)। বিদায় হজ্জের খুৎবায় লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বলেন, 'প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ইহা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা উপস্থিত ব্যক্তি হয়তো এমন ব্যক্তির কাছে ইহা পৌঁছিয়ে দিবে যে ব্যক্তি তার চেয়ে (হাদীসের) উত্তম রক্ষক হবে। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং ১৭৪১)। মহানবীর এ নির্দেশ পালনে প্রথমে একদল সাহাবী, পরবর্তীতে তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও একদল হাদীসের নিবেদিত খাদিম সবিশেষ ভূমিকা পালন করেন। চারটি পদ্ধতি অবলম্বনে তথা হাদীস শিক্ষা গ্রহণ বা মুখস্থকরণ, হাদীস লিপিবদ্ধকরণ, হাদীস শিক্ষাদান এবং হাদীস মোতাবেক আমল করার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণে আন্তরিক প্রয়াস নেন হাদীসের খাদিমগণ। মহানবী (স.)-এর যুগ থেকেই হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সব হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ সমাপ্তি হয়। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের এ দীর্ঘ ইতিহাসকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

হাদীস সংকলনের প্রথম যুগঃ এ যুগ হলো মহানবীর নবুওয়াতের প্রথম হতে ওমর ইবন আবদুল আযীয খেলাফত লাভ (৯৯হি.) পর্যন্ত মোট ১১২ বছর। এ যুগ মূলত সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈদের যুগ। এ যুগের শেষ পর্যন্ত সাহাবীরা জীবিত ছিলেন। মহানবীর সাহাবীদের মধ্যে যিনি সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তিনি হলেন আনাস ইবন মালেক (রা.)। তিনি ৯৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এ যুগে সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈরা হাদীস শিক্ষা গ্রহণ বা মুখস্থকরণ, হাদীস লিপিবদ্ধকরণ, হাদীস শিক্ষাদান ও হাদীসের ওপর নিজেদের আমল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগঃ এ যুগ হলো হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথমাংশ। এ যুগ মূলত তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগ। এ যুগে হাদীস অনুযায়ী আমল অব্যাহত থাকে। এ যুগে হাদীস শিক্ষাকরণ, শিক্ষাদান, মুখস্থকরণ ও লিখন আরো বহু গুণে

বেড়ে যায়।

হাদীস সংকলনের তৃতীয় যুগঃ এ যুগ হলো হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশ হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। এ প্রায় তিন শতাব্দীর যুগ। এ যুগে হাদীস শিক্ষাকরণ ও শিক্ষাদান, হাদীস মুখস্থকরণ ও হাদীস মোতাবেক আমলের ধারা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে। হাদীস লিখনের ধারা আরো জোরদার হয়ে উঠে। এ যুগকে হাদীসের স্বর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। এ যুগেই সমস্ত হাদীস রাবীদের নিকট হতে সংগৃহীত হয়ে কিতাবরূপে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। অতপর এমন কোন হাদীস কারও নিকট রয়েছে বলে অনুমান করা যায়না যা কোন না কোন কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। (আ'জমী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ, পৃ. ৮৪)।

হাদীস সংকলনের চতুর্থ যুগঃ এ যুগ হলো হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পরের যুগ। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে অনাগত কাল পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত। এ যুগে বিভিন্ন দিক থেকে হাদীস নিয়ে গবেষণা ও হাদীস সংকলন রচনা করা হয়েছে ও তা অব্যাহত আছে। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ কথা পরিস্কার হয় যে, হাদীস সংকলনের এ মহত কাজ মহানবীর সময় থেকে শুরু হলেও দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীতে একাজ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে এবং মহান রবের অপার অনুকম্পায় একাজের নিখুঁত ও সুন্দর পরিসমাপ্তি হয়। এরপর আর নতুন কোন হাদীস নতুন কোন সনদে লেখার অবকাশ নেই কিংবা এমন কোন হাদীস নেই যা সনদসহ ইতোমধ্যে লেখা হয়নি।

তবে মুহাদ্দেসীন মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীস সংকলন করেন। কেউ কেউ সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কিছু বাণী সংকলন করেন। যেমন আলী (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) সংকলিত সহীফাসমূহ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ দুটো সহীফা সাহাবীদের যুগে সংকলন করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম ও মর্যাদা অনুসারে হাদীস সংকলন করেন। যেমন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সংকলিত 'মুসনাদে আহমদ'। আবার কেউ কেউ হাদীস সংকলন করেন বর্ণনাকারীদের নামের আক্ষরিক বিন্যাসে। যেমন ইমাম তাবারানীর 'আল-মু'জাম আল-কবীর ওয়াস সগীর'। কেউ কেউ সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কেবল সহীহ হাদীসের সংকলন রচনা করেন। 'সহীহ আল-বুখারী', 'সহীহ মুসলিম' ও 'আস-সুনান আল-আরবা'আ' তথা চারটি সুনানগ্রন্থসহ (সুনানুন নাসাঈ, সুনানুত তিরমিযী, সুনান আবি দাউদ ও সুনান ইবন মাজাহ-এ চারটি সুনান গ্রন্থকে 'আস-সুনান আল-আরবা'আহ' বলা হয়ে থাকে)। 'সহীহ ইবন খুযাইমাহ' ও 'সহীহ ইবন হিব্বান'-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আবার হাদীসের কোন কোন সংকলন এমন পাওয়া যায় যা সংক্ষেপণমূলক। অর্থাৎ এসব সংকলনে সনদ সংক্ষেপ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ইমাম নববীর 'রিয়াদুস সালিহীন' ও ইমাম আল-খতীব আত-তিবরীযীর 'মিশকাতুল মাসাবীহ'। তদুপরি সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মওযূ' বা বানোয়াট হাদীসের উপরও স্বতন্ত্র সংকলন রচিত হয়। যেমন ইমাম ইবনুল জওযী (৫৯৭হি.) রচিত গ্রন্থ 'আল-মাওযূ'আত'। ইমাম সুয়ূতী (৯১১হি.) উক্ত গ্রন্থটিকে সংক্ষেপ করে 'আল-লাআলী আল মাসনূ'আহ' রচনা করেন। সনদের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ ও যঈফ হাদীস নির্ণয়ের এ কার্যক্রম মুহাদ্দিসরা এখনও

অব্যাহত রেখেছেন। এ অব্যাহত প্রয়াসের অংশ হিসেবেই বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী সনদের মানগত অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সহীহ ও যঈফ হাদীসের পৃথক দুটো সংকলন রচনা করেন। তাছাড়া আধুনিক যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ 'আওয়ামাহ, শায়খ শু'আইব আরনাউত্ব ও শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ বহু হাদীস গ্রন্থের তাহকীক ও তাখরীজ করেছেন। এমনি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অবলম্বনে বহু হাদীসগ্রন্থ সংকলিত, সম্পাদিত ও লিপিবদ্ধ হয়। এরূপ নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসগ্রন্থ চয়ন ও সংকলনের কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হাদীস সংকলক ও সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের ধারাক্রম, পরিচয় ও অবস্থান

ক. মহানবী (স.)-এর যুগ

মহানবী (স.)-এর ওফাতের আগ পর্যন্ত সময়কালকে মহানবীর যুগ বলে ধরা হয়েছে। এ যুগে কেবলমাত্র সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনে সবিশেষ অবদান রাখেন। এ যুগে সাহাবীগণ হাদীস শিক্ষা গ্রহণ বা মুখস্থকরণ, হাদীস শিক্ষাদান এবং হাদীসের ওপর 'আমলের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ করেন। এ যুগে কোন হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়নি। তবে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) মহানবীর (সা.) অনুমতিক্রমে হাদীস লিখে রাখতেন। তার সংকলিত পাণ্ডুলিপিটি 'আস-সহীফাহ আস-সাদিকাহ' নামে খ্যাত। তাছাড়া মহানবী (সা.)-এর সময় অনেক দাওয়াতনামা, হেদায়াতনামা, নির্দেশপত্র, চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখা হয়। এসবের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য নয়। ডক্টর হামীদুল্লাহ ১৪১টি লেখার বিবরণ প্রদান করেছেন। এসব রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বলে অন্তর্ভুক্ত। অতএব বলা যায় যে, হাদীস লেখার কাজ মহানবীর যুগ থেকেই শুরু হয়।

খ. সাহাবী ও প্রবীণ তাবিঈগণের যুগ

এ যুগ হলো মহানবীর নবুওয়াতের প্রথম হতে ওমর ইবন আবদুল আযীযের খেলাফত লাভ (৯৯হি.) পর্যন্ত মোট ১১২ বছর। এ যুগ মূলত সাহাবী ও প্রবীণ তাবিঈদের যুগ। এ যুগে সাহাবী ও প্রবীণ তাবেঈরা হাদীস মুখস্থকরণ এর পাশাপাশি হাদীস লিখে রাখতেন। এ যুগে সমস্ত হাদীস সামগ্রিকভাবে একত্রিত করা হয়নি। এ যুগে যিনি যে বিষয়ের যে হাদীসকে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছেন, স্মরণলিপি স্বরূপ তিনি কেবল সে হাদীসকেই লিখে নিয়েছেন অথবা যিনি যা শুনেছিলেন তা লিখে নিয়েছেন। অতঃপর হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে স্বনামখ্যাত তাবিঈ ইমাম ইবন শিহাব আয-যুহরী প্রথম হাদীসসমূহকে সামগ্রিকভাবে একত্রিত করার প্রয়াস নেন। কিছু সংখ্যক প্রবীণ তাবিঈ তাদের ওস্তাদ সাহাবীদের সামনেই তাদের হাদীস লিখে নিতেন। সাহাবীগণ হিজরী প্রথম শতাব্দী পর্যন্তই জীবিত ছিলেন। এ যুগে সাহাবী ও প্রবীণ তাবিঈরা বিচ্ছিন্নভাবে পাণ্ডুলিপি আকারে হাদীস লিখে রেখেছেন। মহানবীর প্রিয় সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। এ পাণ্ডুলিপিটি 'আস-সহীফাহ আস-সাদিকাহ' নামে খ্যাত।

গ. তাবিঈন ও তাবে'-তাবিঈনদের যুগ

এ যুগ হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম হতে তৃতীয় শতকের প্রথমাংশ। এ যুগ তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগ। এ যুগে হাদীস সংকলন বহু গুণে বেড়ে যায়। এ যুগে তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনরা হাদীস মুখস্থ করেছেন। হাদীস লিখে রেখেছেন। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে খলীফা ওমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.) (মৃ. ১০১ হি.) ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য মদীনার শাসনকর্তা আবূ বকর ইবন হাজম (মৃ. ১১৭ হি.) এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ওলামা ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ফরমান জারি করেন এবং বলেন:

أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولاتقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم و ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لايهلك حتى يكون سرا.

-অর্থাৎ আপনারা রাসূল (সা.)-এর হাদীস তালাশ করে সংগ্রহ করুন। আমার আশংকা হচ্ছে যে, ওলামাদের (সাহাবী ও তাবেঈন) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাদীসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! রসূলুল্লাহর (সা.) হাদীস ব্যতীত অপর কারো হাদীস গ্রহণ করবেন না। এতদ্ব্যতীত আপনারা সর্বত্র মজলিস কায়েম করে হাদীস শিক্ষা দিতে থাকুন, যাতে যাদের জানা নেই তারা জানতে পারে। কেননা, ইলম যখন গোপন করা হয় (অর্থাৎ তার চর্চা করা না হয়) তখন তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ('সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম)। এ আদেশের ফলে হাদীস সংগ্রহ করার এক বিরাট সাড়া পড়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমগণ (তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈরা) হাদীস সংগ্রহ ও লেখার কাজে ওঠে-পড়ে লাগেন। এ যুগে তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনরা হাদীস মুখস্থকরার পাশাপাশি হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন নাদীম (মৃ. ৩২৬) তাঁর 'আলফিহরিস্তান' নামক গ্রন্থ-পরিচিতি গ্রন্থে দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত প্রায় অর্ধশত হাদীসগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। এ যুগের কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ, রচয়িতাদের পরিচয় ও ধারাক্রম নিম্নরূপ:

এক. ইমাম যুহরী (রহ.) রচিত 'মুসনাদুয যুহরী' (مُسْنَدُ الزُّهْرِيّ)

ইমাম যুহরী (রহ.) ৫৮ হিজরীতে মু'আবিয়ার (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুরো নাম হলো মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন শিহাব আয-যুহরী। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিয, 'আবিদ ও যাহিদ। ইমাম যুহরী ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি মদীনায় লেখা পড়া করেন। অনেক সাহাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন ইমাম যুহরী (রহ.)। ইমাম যুহরী হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি মদীনার বড় বড় মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, لَوْ لَا الزُّهْرِيُّ لَذَهَبَ السُّنَنُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ-অর্থাৎ ইমাম

যুহরী না হলে মদীনার হাদীসসমূহ বিলীন হয়ে যেত। ইমাম যুহরী তাঁর সংগৃহীত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে দুইহাজার সহীহ হাদীসের সন্নিবেশে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। যা পরবর্তীতে 'মুসনাদুযযুহরী' (مُسْنَدُ الزُّهْرِيِّ) নামে পরিচিতি লাভ করে। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে এটিই প্রথম সংকলিত হাদীসগ্রন্থ। ইমাম যুহরী হাদীসের সনদ বর্ণনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। (আয-যুহরী, 'মুহাম্মদ হাসান সুররাব, পৃ. ২২৭)। তিনি কেবল হাদীসের সনদের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেননি, বরং হাদীসের মতন বা বক্তব্য বিষয়েরও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করতেন। রাবী বা বর্ণনাকারীর দীনদারীতা, বিশ্বস্ততা, স্মৃতিশক্তির প্রবলতা এবং বর্ণিত হাদীসের মতন বা মূলভাষ্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে যেটিকে সহীহ মনে করেছেন, কেবল সে হাদীসকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। (হোসেন, ড. মোহাম্মদ বেলাল, পৃ. ১২২-২৩)।

দুই. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রচিত 'কিতাবুল আসার' (كتاب الأثار)

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) খলীফা 'আব্দুল মালিকের শাসনামলে ইরাকের কূফা নগরীতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৭২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। (আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, পৃ. ৩৯০; খতীব আল-বাগদাদী, পৃ. ৩২৩; আস-সাম'আনী, 'আব্দুল করীম ইবন মুহাম্মদ, আল-আনসাব, পৃ. ৬৪)। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফাহ, উপাধি 'আল-ইমামুল আ'যম'। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্র উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ৪০ হাজার হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ১০৬৭টি হাদীস নিয়ে 'কিতাবুল আসার' (كتاب الأثار) নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন ও কঠোর শর্তারোপের মাধ্যমে তিনি হাদীস গ্রহণ করতেন। ফলে তাঁর রিওয়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। (আমীন, প্রফেসর মুহাম্মদ, পৃ. ৪২)। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, আমার নিকট কয়েক সিন্দুক পরিমাণ হাদীস ছিল, আমি তা থেকে অল্প পরিমাণ হাদীস গ্রহণ করেছি, যা ব্যবহারিক জীবনে উপকার দেবে। ইয়াহ্ইয়া ইবন ম'ঈন বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। তিনি মুখস্থ ছাড়া কোনো হাদীস বলতেন না। (থানভী, আশরাফ আলী, পৃ. ৭৭)।

তিন. ইমাম মালিক (রহ.) রচিত 'আল-মুওয়াত্তা' (الموطأ)

ইমাম মালিক (রহ.) ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মালিক, কুনিয়ত আবূ 'আব্দিল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরাহ। ইমাম মালিক (রহ.) বড় বড় তাবিঈ পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ইবন শিহাব আয-যুহরীর নিকট দীর্ঘ সময় হাদীস ও মাগাযী অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বড় মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদ ছিলেন। তিনি মদীনায় প্রায় ৫০ বছর ধরে হাদীস ও ফিকহের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) দীর্ঘ

৪০ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে দশ হাজার হাদীস নির্বাচন করেন। এরপর তিনি তাঁর নীতিমালার মানদণ্ডে উক্ত দশ হাজার হাদীসকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাত্র এক হাজার সাতশত কুড়িটি হাদীস নির্বাচন করে তাঁর অনন্য কীর্তি 'আল-মুওয়াত্তা' (الموطأ) সংকলন করেন। তিনি হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের বলিষ্ঠতা ও মতন বা বক্তব্য বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করতেন। (হোসেন, ড. মোহাম্মদ বেলাল, পৃ. ১৩৫)।

চার. ইমাম মুহাম্মদ রহ রচিত 'আল-মুওয়াত্তা' (الموطأ)

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ১৩১ বা ১৩২ হিজরী সনে ইরাকের ওয়াসিত শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার নাম মুহাম্মদ, কুনিয়ত আবূ আবদুল্লাহ, পিতার নাম হাসান এবং দাদার নাম ফারকাদ আশ-শায়বানী। ইমাম মুহাম্মদ সমসাময়িক যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। আল্লামা ইবন হাজার আল আসকালানী বলেন, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তার কাছে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। অনন্তর তিনি আমর ইবন দীনার, মালেক ইবন মিগওয়াল, আওযাঈ, রবীআ ইবন সালেহ, আবূ ইউসুফ, সুফিয়ান সাওরী, কায়েস ইবনুর রবী, উমর ইবন যার ও মিসআর ইবন কুদামা প্রমূখ মনীষীদের নিকট থেকেও হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈর কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন এবং মদীনায় ইমাম মালেকের কাছে তিন বছর হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম মুহাম্মদ অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইলমে হাদীসে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত হাদীসের কিতাব 'আল মুওয়াত্তা' মূলত ইমাম মালেকের আল মুওয়াত্তার প্রতিলিপি। ইমাম মালেকের নিকট অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদ হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন এবং তারা নিজস্বভাবে এর সংকলনও রচনা করেন। কিন্তু ইলমী দুনিয়ায় তাদের কারো সংকলনের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল ইমাম মালেকের প্রখ্যাত দুই ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আন্দালুসীর রচিত সংকলন দুটিই আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে। ইমাম ইয়াহইয়া আন্দালুসীর সংকলনটিই 'আল মুওয়াত্তা ইমাম মালেক' এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের সংকলনটি 'আল মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ' নামে পরিচিত। ইমাম মুহাম্মদের মুওয়াত্তায় মোট ১১৮০টি হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে মরফূ, মওকুফ প্রায় সব ধরনের হাদীসই আছে। এর মধ্যে ইমাম মালেকের ১০০৫ টি এবং অবশিষ্টদের ১৭৫টি হাদীস আছে। তিনি ইমাম আবূ হানীফার সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবূ ইউসুফের সূত্রে ৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ'-এ কোনো মওজু বা জাল হাদীস নেই। এতে যঈফ হাদীস থাকলেও তা ভিন্নসূত্রে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। সেমতে, 'মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ'-এর সকল হাদীস সহীহ হিসেবে পরিগণিত।

পাঁচ. ইমাম শাফিঈ (রহ.) রচিত 'মুসনাদ' (المسند)

ইমাম শাফিঈ (রহ.) ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবু 'আব্দিল্লাহ। উপাধি নাসিরুস

সুন্নাহ। নিসবতী নাম শাফিঈ। ইমাম শাফিঈ (রহ.) মাত্র সাত বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন মজীদ হিফয করেন এবং দশ বছর বয়সে ইমাম মালিকের 'মু'য়াত্তা' মুখস্থ করেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) সমকালীন হাদীসের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সহীহ ও যঈফ হাদীস নিরূপণ, ইলমুর রিজাল, ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল সম্পর্কে অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) ১৬৭৫ টি হাদীস সন্নিবেশিত 'মুসনাদ' (المسند) নামক একটি হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেন।

ছয়. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) রচিত 'মুসনাদ' (المسند)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন (হাজী খলীফা, পৃ. ৪৮; সুয়ূতী, জালালুদ্দিন, পৃ. ৩২৪)। এবং ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল সমকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি কূফা, মক্কা, মদীনা, বসরা, সিরিয়া, ইয়ামান ও জাযীরাহ প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করেন। (আমীন, ড. আহমাদ, দুহাল ইসলাম, পৃ. ২৩৫; আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, পৃ. ১৮৫)। তিনি তাঁর সংগৃহীত সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে ত্রিশ হাজার হাদীস নির্বাচন করে 'আল-মুসনাদ' নামক হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে হাদীস সংযোজনের ফলে শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজার। (খান, নওয়াব সিদ্দীক হাসান, পৃ. ১১১)।

এ যুগে রচিত আরো কতিপয় হাদীসগ্রন্থ ও রচয়িতার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম মকহুল শামী (মৃ. ১১৬ হি.), কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ২. আবূ হেশাম মুগীরা ইবন মাকসাম (মৃ. ১৬৩ হি.), কিতাবুল ফারায়েজ (كتاب الفرائض), ৩. ইমাম আবদুল মালেক ইবন জুরাইজ (মৃ. ১৫০ হি.), কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ৪. সাঈদ ইবন আবি আরূবা (মৃ. ১৫৭ হি.), কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ৫. ইবন আবি জে'ব (মৃ. ১৫৯ হি.), কিতাবুস সুনান, (كتاب السنن), ৬. ইমাম আওযাঈ (মৃ. ১৫৯ হি.), কিতাবুস সুনান, (كتاب السنن), ৭. ইমাম সুফয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), কিতাবুল জামে'উল কবীর, (كتاب الجامع الكبير), ৮. ইমাম সুফয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), কিতাবুল জামে'উস সগীর, (كتاب الجامع الصغير) ৯. জায়েদা ইবনে কুদামা ছকফী (মৃ. ১৬১ হি.), কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহ্দ ও কিতাবুল মানাকিব, كتاب السنن كتاب الزهد و كتاب المناقب, ১০. ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালেমা (মৃ. ১৬৫ হি.), কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ১১. আবদুল মালিক ইবন মোহাম্মদ

ইবন আবূ বকর ইবন হাজম (মৃ. ১৭৬ হি.), কিতাবুল মাগাজী (كتاب المغازي), ১২. ইমাম আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.), কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহদ ও কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, كتاب السنن كتاب الزهد و كتاب البر والصلة - ১৩. আবূ সাঈদ ইয়াহইয়া ইবন জাকারিয়া ইবনে জায়েদা (মৃ. ১৮৩ হি.), কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ১৪. হুশাইম ইবনে বশীর (মৃ. ১৮৩ হি.), কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ১৫. ইমাম ইসমাঈল ইবন উলাইয়া (মৃ. ১৯৩ হি.), কিতাবুত তহারাত, কিতাবুস সলাত ও কিতাবুল মানাসিক, كتاب الطهارة كتاب الصلواة و كتاب المناسك - ১৬. ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম (মৃ. ১৯৪ হি.), কিতাবুস সুনান ও কিতাবুল মাগাযী (كتاب السنن و كتاب المغازي), ১৭. মোহাম্মদ ইবনে ফোজাইল ইবন গোজওয়ান (মৃ. ১৯৫ হি.), কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহদ, কিতাবুস সিয়াম ও কিতাবুদ দো'আ, (كتاب السنن كتاب الزهد كتاب الصيام و كتاب الدعاء), ১৮. ইমাম ওয়াকী' ইবনে জাররাহ (মৃ. ১৯৭ হি.), কিতাবুস সুনান (كتاب السنن), ১৯. ইমাম আবূ মোহাম্মদ ইসহাক আজরক (মৃ. ১৯৫ হি.), কিতাবুল মানাসিক, কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল কেরা'আত, كتاب المناسك كتاب الصلواة و كتاب القراءة - ২০. ইমাম ইয়াইয়া ইবন আদম (মৃ. ২০৩ হি.), কিতাবুল খারাজ (كتاب الخراج), ২১. ইমাম এজীদ ইবনে হারূন (মৃ. ২০৬ হি.), কিতাবুল ফারায়েজ (كتاب الفرائض), ২২. ইমাম আবদুর রাজ্জাক ইবন হুমাম সন'আনী (মৃ. ২১১ হি.), কিতাবুস সুনান ও কিতাবুল মাগাযী (كتاب السنن و كتاب المغازي), ২৩. ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃ. ১৫১ হি.), আল জামে' (الجامع), ২৪. আবূ মা'শার নজীহ সিন্দী (মৃ. ১৭০ হি.), কিতাবুল মাগাযী, (كتاب المغازي), ২৫. ইবনে আবিদ্দুনয়া (মৃ. ১৮০ হি.), কিতাবু যম্মুল মালাহী (كتاب ذم الملاحي), ২৬. ইমাম আবূ ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হি.), কিতাবুল খারাজ (كتاب الخراج), ২৭. ইমাম মোহাম্মদ (মৃ. ১৮৯ হি.), মোআত্তা (المؤطأ), ২৮. আবদুল্লাহ ইবন ওহাব (মৃ. ১৯৭ হি.), মুআত্তা কবীর (المؤطأ الكبير), ২৯. আবদুল্লাহ ইবন ওহাব (মৃ. ১৯৭ হি.), আহওয়ালুল কিয়ামাহ (أحوال القيامة), ৩০. ইমাম শাফিঈ (মৃ. ২০৪ হি.), কিতাবুল উম্মি (كتاب الأم) ।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এ সকল হাদীস গ্রন্থের অধিকাংশ আজ পাওয়া না গেলেও তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। ইবন নাদীম এ সকল গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকটতম যুগের লোক ছিলেন বলে তিনি স্বয়ং এগুলোর প্রায় সব কটি দেখেছিলেন বা এ সম্পর্কে

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছিলেন। তৃতীয় শতাব্দীর হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসগণ এ সকল গ্রন্থকারদের থেকে শুনে সে সকল গ্রন্থের প্রায় সমস্ত হাদীসই তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। (আ'জমী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ, পৃ. ৭৮)।

তাবে'-তাবেঈন ও তাদের পরবর্তী যুগ

তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশ হতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীর দীর্ঘ সময় এ যুগ বলে বিবেচিত। এ যুগে হাদীস সংকলন জোরদার হয়ে উঠে। এ যুগকে হাদীস সংকলনের সোনালী যুগ বলা হয়। এ যুগে সমস্ত হাদীস রাবীদের নিকট হতে সংগৃহীত হয়ে কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর কোন হাদীস কারোও নিকট রয়েছে বলে অনুমান করা যায় না যা কোন না কোন হাদীসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ যুগেই হাদীসের ছয়জন প্রসিদ্ধ ইমামের আবির্ভাব হয়। এ যুগেই সনদ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহীহ হাদীসকে যঈফ হাদীস থেকে আলাদা করা হয়। এ যুগেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসকে সাহাবী ও তাবিঈদের আসার হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করার নীতি গৃহীত হয়। এ যুগে এত অধিক হাদীসের গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে যার পূর্ণ ফিরিস্তি দেয়া এখানে সম্ভবপর নয়। শুধু কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম, পরিচয় ও অবস্থান তুলে ধরা হলো।

এক. ইমাম বুখারী (রহ.) রচিত 'সহীহ আল বুখারী'

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীন-এর শাসনামলে ১৯৪ হিজরী সালে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরীতে সমরকন্দ থেকে ২ ফারসাখ দূরে 'খরতংক' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। হিজরী তৃতীয় শতকে যে সব মুহাদ্দিস হাদীস শাস্ত্রে সবচে' বেশি অবদান রেখেছেন, ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের হাফিয, হাদীসের সনদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সুপণ্ডিত, 'আবিদ, যাহিদ, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ। হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হাদীসের বিশ্বনন্দিত এক অপ্রতিদ্বন্দী ইমাম হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই হাদীসের প্রতি ইমাম বুখারীর ছিল গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহা। হাদীসের প্রতি তাঁর এ গভীর অনুরাগ ও অদম্য স্পৃহাই তাঁকে পরবর্তীতে হাদীসের জগতে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দুর্গম ও গিরিসংকুল পথ অতিক্রম করে তিনি ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। (যিরাকলা, আল-আ'লাম, ৬ খ, পৃ. ৩৪)। ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৭২৭৫ টি (পুনরুক্তি সহ) বা ২৭৬১ টি (পুনরুক্তি ব্যতীত) হাদীস নিয়ে 'সহীহ আল বুখারী' সংকলন করেন। আল-ইরাকী বলেন, أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيْ الصَّحِيْحِ مُحَمَّدٌ وَ خَصَّ فِيْ التَّرْجِيْحِ।.-অর্থাৎ একমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম রচনা করেন ইমাম মুহাম্মদ বুখারী (রহ.)। (আস-সাখাভী, হাফিয শামসুদ্দীন, পৃ. ২৭-২৮)।

দুই. ইমাম মুসলিম (রহ.) রচিত 'সহীহ মুসলিম'

ইমাম মুসলিম (রহ.) ইরানের খুরাসান প্রদেশের নায়সাপুর নামক স্থানে ২০২ হিজরী (ইবন কাসীর, পৃ. ৮৯), মতান্তরে ২০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন (আল-জাযেরী, ইবনুল আসীর, পৃ. ১৮৪) এবং ২৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হুসাইন, উপাধি 'আসাকিরুদ্দীন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে সব মুহাদ্দিস হাদীসের জগতে বিশাল অবদান রাখেন, তিনি তাদের মধ্যে অনন্য। হাদীস সমালোচনা ও রিজালশাস্ত্রে তাঁর ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, হুজ্জাহ এবং হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তিনি ইমাম বুখারীসহ তৎকালীন খ্যাতিমান অনেক মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম' বিশ্বময় সমাদৃত ও সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর স্বীয় ওস্তাদদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৪,০০০ (পুনরুক্তি ব্যতীত) হাদীস নিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করে 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থটি সংকলন করেন।

তিন. ইমাম নাসাঈ (রহ.) রচিত 'আস-সুনান'

ইমাম নাসাঈ (রহ.) ২১৫ হিজরীতে খুরাসান প্রদেশের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন (আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, পৃ. ১২৫) এবং ৩০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম আহমদ। উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান। ইমাম নাসাঈ (রহ.) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, হাদীসের সমালোচক এবং ইসলামের নানাবিধ বিষয়ের এক সুমহান পণ্ডিত। তিনি তাঁর সমসাময়িক যুগে ইসলামী বিশ্বের নানা দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। হাদীস ছাড়াও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সংকলিত ও রচিত হাদীস গ্রন্থ 'আস-সুনান' মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে' বেশি সমাদৃত হয়েছে। ইমাম নাসাঈ (রহ.) দীর্ঘকাল হাদীস সংগ্রহের পর প্রথম 'আস-সুনান আল-কুবরা' নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু এ হাদীস গ্রন্থে সহীহ ও যঈফ উভয় প্রকারের হাদীস বিদ্যমান ছিল। 'আস-সুনান আল-কুবরা' সংকলনের পর রামলার তৎকালীন আমীর হাদীসের সংকলনটি দেখার ইচ্ছা পোষণ করলে ইমাম নাসাঈ তা আমীরের সামনে পেশ করেন। তখন আমীর তাকে জিজ্ঞেস করেন, أكل ما فيها صحيح-অর্থাৎ এতে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস কি সহীহ? ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর জবাবে বলেন, এতে সহীহ, হাসান এবং এ দুটোর কাছাকাছি হাদীস রয়েছে। এতে আমীর তাঁকে বলেন, আপনি আমার জন্য শুধু সহীহ হাদীসকে পৃথক করে একটি গ্রন্থ সংকলন করুন। তখন তিনি 'আস-সুনান আল-কুবরা' থেকে যঈফ হাদীসগুলো ছাটাই করে ৫৭৫৪ টি হাদীস নিয়ে 'আস-সুনান আস-সুগরা' সংকলন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'আল-মুজতবা মিনাস-সুনান' (اَلْمُجْتَبَى مِنَ السُّنَنِ) (আল-খুলী, মুহাম্মদ আবদুল আযীয, পৃ. ৭৯; আস-সাব্বাগ, ড. মুহাম্মদ, পৃ. ৩৮৭; রহমান, ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর, পৃ. ১১৯)। ইমাম নাসাঈ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি হাদীস গ্রহণে যেসব শর্ত আরোপ করেন তা ছিল অত্যন্ত কঠোর। ইমাম নাসাঈ

রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীদের নানাদিক অত্যন্ত গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। যেসব হাদীস তাঁর স্বীয় অনুসৃত নীতিমালার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি কেবল সেসব হাদীসই গ্রহণ করেন।

চার. ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) রচিত 'সুনান'

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ২০২ হিজরীতে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন (খতীব আল-বাগদাদী, পৃ. ৫৫; ইবন আসাকীর, পৃ. ১৯১) এবং ২৭৫ হিজরীতে বসরায় ইন্তিকাল করেন। (ইবনু কাসীর, পৃ. ৪৭; ইবন খাল্লিকান, পৃ. ৪০৫)। তাঁর নাম সুলায়মান, উপনাম আবূ দাউদ। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের ইমাম, হাদীস সমালোচক, মুফাসসির ও ফকীহ। হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাদীস বিষয়ে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি লক্ষ লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশত হাদীস নিয়ে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থটি সংকলন করেন।

পাঁচ. ইমাম তিরমিযী (রহ.) রচিত 'আল-জামি'

ইমাম তিরমিযী (রহ.) ২০৯ হিজরীতে তিরমিয শহরের 'বুগ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ। কুনিয়ত আবূ ঈসা। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে সব মুহাদ্দিস হাদীসের জগতে প্রতিভাদীপ্ত ও অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, ইমাম তিরমিযী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাদীসের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সুপণ্ডিত, ফিকহ ও ইসলামী নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। হাদীসের জ্ঞান আহরণে ইসলামী দুনিয়ার নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করেন। তিনি 'আল-জামি' হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ গ্রন্থটি সব স্তরের পাঠকের কাছে সমাদৃত ও অতীব সহজবোধ্য।

ছয়. ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) রচিত 'সুনান'

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) ২০৯ হিজরীতে ইরাকের কাযভীন নামক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন (আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, পৃ. ২৭৭; আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, পৃ. ৬৩৬; ইবন কাসীর, পৃ. ১১১) এবং ২৭৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (ইবনুল-জাওযী, পৃ. ২০৯; ইবনু কাসীর, পৃ. ৪৪)। তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তিনি ইবন মাজাহ নামেই সমধিক পরিচিত। ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ মুহাদ্দিস ও হাদীস সমালোচক। তিনি হাদীসের জ্ঞানার্জন ও হাদীস সংগ্রহের জন্য তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার হাদীসসমৃদ্ধ স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) লক্ষাধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস সংকলনের মাধ্যমে স্বীয় 'সুনান' গ্রন্থ রচনা করেন।

সাত. ইমাম আল হাকেম আন-নায়সাপুরী (রহ.) রচিত 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন'

ইমাম আল-হাকেম আন-নায়সাপুরী (রহ.) ৩২১ হিজরীতে নায়সাপুরে জন্মগ্রহণ করেন (আল-কাত্তানী, পৃ. ২১; খতীব আল-বাগদাদী, পৃ. ৪৭৩) এবং ৪০৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। ইমাম হাকেম আন-নায়সাপুরী নয় বছর বয়সে হাদীসের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। বিশ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইরাক ভ্রমণ করেন। তিনি সহস্রাধিক শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেন। ইমাম আল-হাকেম হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' নামক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আল-হাকেম হাদীস সংকলনে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নীতিমালা অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্বীয় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তাদের অনুসৃত শর্তাবলীর আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক হাদীস পরিত্যাগ করেন। ইমাম আল-হাকেম তাঁদের পরিত্যাজ্য হাদীসসমূহ যাচাই বাছাই করে এগুলোর সমন্বয়ে 'আল-মুসতাদরাক' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি সংকলন করেন।

এ যুগে রচিত আরো কতিপয় হাদীসগ্রন্থ ও রচয়িতার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম সন'আনী (মৃ. ২১১ হি.), ২. আবূ উবায়দ কাসেম ইবনে সাল্লাম (মৃ. ২২৪ হি.), কিতাবুল আমওয়াল, ৩. মুসান্নাফ আবূ বকর ইবনে আবি শায়বা (মৃ. ২৩৫ হি.), ৪. মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই (মৃ. ২৩৮ হি.), ৫. আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারেমী সমরকন্দী (মৃ. ২৫৫ হি.), সুনানুদ দারেমী, ৬. ইব্রাহীম ইবনুল আসকারী (মৃ. ২৮২ হি.), মুসনাদে আবূ হুরাইরা (রা.), ৭. হাসান ইবন সুফয়ান (মৃ. ৩০৩ হি.), মুসনাদে কবীর, ৮. ইবন জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০), তাহযীবুল আছার, ০৯. ইবন খুযাইমা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃ. ৩১১ হি.), সহীহ ইবন খুযাইমা, ১০. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (মৃ. ৩১৩ হি.), মুসনাদ, ১১. আবূ জা'ফর তাহাবী মিসরী (৩২১ হি.), শরহু মা'আনিল আছার ও শরহু মুশকিলুল আছার, ১২. সোলাইমান ইবনে আহমদ তবারানী (মৃ. ৩৬০ হি.), মুজামে কবীর, মুজামে সগীর ও মুজামে আওসাত, ১৩. আবুল হাসান আল দারাকুতনী (মৃ. ৩৮৫ হি.), সুনানু কুবরা, ১৪. আবূ সুলাইমান আহমদ ইবন মুহাম্মদ বুস্ত খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি.), মা'আলেমুস সুনান, ১৫. আবু বকর আল বায়হাকী আল খুরাসানী (মৃ. ৪৫৮ হি.), সুনানু কুবরা, শু'আবুল ঈমান, ১৬. আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবন আহমদ সমরকন্দী হানাফী (মৃ. ৪৯২ হি.), বাহরুল আসানীদ মিন সিহাহিল মাসানীদ।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পরের যুগ

হাদীস সংকলনের ইতিহাসে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে অনাগত কাল পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত। এ যুগে বিভিন্ন দিক থেকে হাদীস সংকলন রচনা ও হাদীস নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। তবে নতুন কোন সনদসহ নতুন কোন হাদীস সংকলনের আর কোন অবকাশ নেই। কেননা হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সকল হাদীস রাবীদের নিকট হতে সংগৃহিত হয়ে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। এ যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী হাদীস গ্রন্থের আলোচনা-সমালোচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কেহ কারো কোন গ্রন্থের সনদ বিচার করেন। কেহ

উহার সংক্ষেপণ করেন, আর কেহ উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। কেহ বা বিভিন্ন গ্রন্থের হাদীসসমূহ একত্রিত করে হাদীসের বিশ্বকোষ রচনা করেন। আর কেহ বা বিভিন্ন গ্রন্থ হতে হাদীস নির্বাচন করে সংকলন তৈরী করেন। কেহ হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দসমূহের অভিধান রচনা করেন। কেহ হাদীস সংশ্লিষ্ট অপরাপর ইলম উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগ দেন। একদিকে সকল হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ চূড়ান্তভাবে পরিসমাপ্তি হয়, অন্যদিকে হাদীস সম্পর্কীয় বহু শাখা ইলমের দ্বার উম্মুক্ত হয়, নতুন নতুন জ্ঞানগত বিষয় সৃষ্টি হয়। হাদীসকেন্দ্রীক জ্ঞানগত এ গবেষণা অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হাদীস সংকলনের চূড়ান্তকালের পরের যুগে হাদীসগ্রন্থ সংকলনের ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই বলা হয়েছে, হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সকল হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধকরণের কাজের পরিসমাপ্তি হয়। এ যুগের পরে নতুন করে আর নতুন কোন হাদীস লিখার অবকাশ নেই। কেননা সকল হাদীসই কোন না কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। ফলে হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর হাদীস অধ্যয়ন এবং নতুন কোন হাদীসগ্রন্থ সংকলনের মূলভিত্তি হলো পুরাতন হাদীসগ্রন্থ বা ইতোপূর্বে যেসব হাদীসগ্রন্থ লেখা হয়েছে সেগুলো। কেননা সেগুলোই মূলত হাদীসের মূল কিতাব বা মূল উৎস। হাদীসের জ্ঞান অর্জন করতে হলে মুসলিম উম্মাহকে এসকল হাদীস গ্রন্থের ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তবে পূর্বে সংকলিত হাদীসের মূল গ্রন্থ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে নানা আঙ্গিকে হাদীসগ্রন্থ সংকলনের অবকাশ এখনো আছে। এরূপ গ্রন্থ সংকলন বা রচনার সুযোগ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। যাতে মুসলিম উম্মাহ হাদীসের জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। যাতে মুসলিম উম্মাহ জীবন চলার পথে হাদীসের জ্ঞানকে নানাভাবে তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি রচিত হাদীসগ্রন্থসমূহের চর্চার গুরুত্ব

হাদীস সংকলনের চূড়ান্তকাল তথা হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি যেসব হাদীসের গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোই মূলত হাদীসের মূল গ্রন্থ। এ গ্রন্থগুলোই মূলত হাদীসের ধারক ও বাহক। এ গ্রন্থগুলোই মূলত হাদীসের জ্ঞানের উৎস। অতএব হাদীস চর্চা ও সংরক্ষণে এসব গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। অতএব মুসলিম উম্মাহর মূল দায়িত্ব হবে এ গ্রন্থগুলো সংরক্ষণ করা। এসব গ্রন্থে যেন কোন ধরনের পরিবর্তন ও সংযোজন না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর আজোবধি রচিত হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহের সত্যতা যাচাইয়ে এ গ্রন্থগুলোকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা। অতএব এসব হাদীস গ্রন্থসমূহের চর্চা ও সংরক্ষণ করা হলো মুসলিম উম্মাহর বড় আমানত।

উপসংহার ও গবেষণার ফলাফল

ইসলামী জীবন-দর্শনের প্রথম উৎস হলো আল কুরআন আর দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীস। ইসলাম বুঝার জন্য কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। কুরআন সরাসরি রসূল (স.)-এর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে একদল সাহাবীর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে কুরআন মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত। অন্যদিকে হাদীস সাহাবীদের হৃদয়-মনে সংরক্ষিত ও তাদের আমলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত

থাকলেও তা গ্রন্থাকারে পূর্ণাঙ্গ অবয়বে লিপিবদ্ধ করতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগে যায়। এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অনেক সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও অনেক প্রতিথযশা মুহাদ্দিস হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনে নিবেদিত ছিলেন আমৃত্যু। যেহেতু হাদীসের সংখ্যা অনেক, যেহেতু দীর্ঘ সময় নিয়ে হাদীস লিপিবদ্ধকরণের কাজ সমাপ্ত হয়, সেহেতু মুহাদ্দিসদের একাজ করতে গিয়ে এক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়। একাজে নানা রকম জটিলতা তৈরী হয়। একদল ইসলাম বিদ্বেষী-যিন্দিক, কাফের ও মুনাফিক হাদীসের নামে জাল হাদীস তৈরী করে হাদীসের ক্ষেত্রে সন্দেহ, সংশয় সৃষ্টি করে হাদীসের জ্ঞানকে বিলুপ্ত করার অপ-প্রয়াসে লিপ্ত হয়। এদের হীন ষড়যন্ত্র, নানাবিধ কূট-কৌশলকে মোকাবিলা করে সহীহ হাদীসগুলো আলাদা করে মহানবীর সকল হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা ছিল মুহাদ্দিসদের জন্য এক চ্যালেঞ্জিং কাজ। আল্লাহর অশেষ রহমতে নিবেদিতপ্রাণ মুহাদ্দিসগণ কঠোর অধ্যাবসায় ও সাধনার মাধ্যমে সহীহ হাদীসগুলো আলাদাকরে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত সফলভাবে মুকাবিলা করেন। হাদীসের ব্যাপারে সকল সংশয়-সন্দেহের অপনোদন করেন। মহানবী (স.)-এর যুগ থেকে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস, হাদীসের মৌলিক ও প্রাচীন গ্রন্থগুলোর ধারাক্রম ও অবস্থান সম্পর্কে জানার মাধ্যমে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত ও দিবালোকের মত স্পষ্ট। এ গবেষণার মাধ্যমে যা তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

এক. মহানবী (সা.)-এর যুগে হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আল কুরআনের সাথে যেন হাদীস মিশ্রিত হয়ে না যায়, সেজন্য বিশেষ সর্তকতা স্বরূপ আল কুরআনের মত হাদীস লিখার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় কতিপয় সাহাবীকে হাদীস লিখার অনুমতি দেয়া হয়।

দুই. সাহাবীগণের মাধ্যমে কিছু কিছু গ্রন্থ সংকলিত হয়। যেমন : 'সাহীফাহ সাদিকাহ'। সে সবের হাদীসসমূহ পরবর্তীতে সংকলিত গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশিত করা হয়। ফলে সে গ্রন্থ তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। হাদীস সংকলন কাজে আলী (রা.), আবূ হুরায়রাহ (রা.), জাবির (রা.), আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ অবদান রাখেন।

তিন. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে আজোবধি তথা যুগে যুগে সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ধরন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কোনটা বর্ণনাকারীর নাম অনুসারে, কোনটা বিষয়ভিত্তিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় সংকলিত। বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনেও বৈচিত্র রয়েছে। কোনটিতে ঈমান অধ্যায় দিয়ে শুরু হয়েছে, আবার কোনটিতে তাহারাত অধ্যায় দিয়ে শুরু হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের সংকলন কর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

চার. হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর পর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহের হাদীসের ভিত্তি যাচাইয়ে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি রচিত গ্রন্থসমূহকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, এসব গ্রন্থে যদি হাদীসটি না পাওয়া যায়, তাহলে হাদীসটি ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে হাদীছ নির্বাচনে শর্তাবলী অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

পাচ. হাদীসের মূল কিতাবসমূহ জ্ঞান-সাধনা বা চর্চায় রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে

কোনো প্রাচ্যবিদ বা চক্রান্তকারী যেন এসব গ্রন্থে কোনো ধরনের পরিবর্তন, সংযোজন কিংবা বিয়োজন না করতে পারে।

ছয়. হিজরী পঞ্চম শতাব্দী অবধি যেসব হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়, সেগুলোই হাদীসের মূল কিতাব, হাদীস বিজ্ঞানের মূল উৎস। অতএব, এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বড় আমানত।

সাত. হাদীস গবেষণা ও নানা আঙ্গিকে হাদীসগ্রন্থ সংকলনের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। যেমন বিংশ শতকে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (র.) সহীহ ও যঈফ হাদীস নির্ণয়পূর্বক সহীহ ও যঈফ হাদীসের পৃথক সংকলন রচনা করেন। তাছাড়া পূর্বে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের মান নির্ণয় করে সহীহ ও যঈফ হাদীসের বিভাজন করেন এবং পৃথক সংকলন রচনা করেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে এ এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেন শায়খ আল-আলবানী। হাদীস গবেষণায় এ ধরনের নতুনত্ব ও অভিনবত্বের ধারা চলমান থাকবে।

তথ্যসূত্র:

আল বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল ইলম, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরবর্তীদেরকে তা জানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নবী (স.)-এর উদ্বুদ্ধকরণ পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৮৭, পৃ. ২৪।

আল বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল হজ্জ, মিনা দিবসে খুৎবা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

আ'জমী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৮ খ্রী.), পৃ. ৮৪।

আল বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *'সহীহ আল বুখারী*, কিতাবুল ইলম।

আয-যুহরী, 'মুহাম্মদ হাসান সুররাব (দামিস্ক: দারুল কলম, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২২৭।

হোসেন, ড. মোহাম্মদ বেলাল, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, গবেষণাপত্র সংকলন-৭, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২২-২৩।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* (বৈরুত: মুআস্সাতুর রিসালাহ, তাবি), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯০; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ* (মিসর: মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৩৪৯ হি.), ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩২৩; আস-সাম'আনী, 'আব্দুল করীম ইবন মুহাম্মদ, *আল-আনসাব* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৪।

আমীন, প্রফেসর মুহাম্মদ, *মাসানীদুল ইমাম আবী হানীফাহ (রহ.)* (করাচী, তাবি), পৃ. ৪২।

থানভী, আশরাফ আলী, *ইনহাউস সাকান লিমাই ইউতালি'উ ই'লাআস সুনান*, পৃ. ৭৭।

হোসেন, ড. মোহাম্মদ বেলাল, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি*, পৃ. ১৩৫।

হাজী খলীফা, *কাশফুয যুনুন* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮; সুয়ূতী, জালালুদ্দিন, *আল-লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪।

আমীন, ড. আহমাদ, *দুহাল ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহ্দা, ১৯৫৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৮৫; তাশ-কুবরা, *মিফতাহুস সা'আদাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

খান, নওয়াব সিদ্দীক হাসান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১১১।

আ'জমী, মাওলানা নূর মোহাম্মদ, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ৭৮।

যিরাকলা, *আল-আ'লাম* (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাইঈন, ১৯৯৭ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪।

আস-সাখাভী, হাফিয শামসুদ্দীন, *ফাতহুল-মুগীস* (দারুল ইমামিত তাবারী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৯ হি./ ১৯৯৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮।

ইবন কাসীর, *জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস-সুন্নাহ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫হি./১৯৯৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

আল-জাযেরী, ইবনুল আসীর, *জামি'উল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত-তুরাসিল 'আরাবী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫।

আল-খুলী, মুহাম্মদ আবদুল আযীয, *মিফতাহুস সুন্নাহ* (মিসর: আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭৯; আস-সাব্বাগ, ড. মুহাম্মদ, *আল-হাদীসুন-নববী* (আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৬ হি./১৯৮২খ্রি.), পৃ. ৩৮৭;

রহমান, ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর, *আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা*, পৃ. ১১৯।

খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৫; ইবন আসাকীর, *তারীখ মাদীনাতি দিমাশক*, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯১।

ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৭; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতিল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬; ইবন কাসীর, *জামি'উল মাসানীদ ওয়াস সুনান*, মুকাদ্দমাহ, পৃ. ১১১।

ইবনুল-জাওযী, *আল-মুনতাযাম* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; ইবনু কাসীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪।

আল-কাত্তানী, *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ* (করাচী: মাকতাবাতু নূর মুহাম্মদ আত-তিজারিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ২১; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নে ইউসুফ (আ.) এর চরিত্রঃ একটি পর্যালোচনা

নূর মোহাম্মদ*

[Abstract : *Hazrat Yusuf (As) is one of the most respected prophets of the Bani Israel mentioned in the Quran. His personality and morality are revealed through his excellent qualities that attract us and others. In our civilized and appreciative society, others are influenced by one's personality. So Allah has perpetuated the inspiration of Yusuf (As) character in the world. His impeccable ideology must be propagated for the sake of creation welfare. Yusuf (As) endured the same hardships, sufferings, pains and imprisonment like as other people. The effects of warmth and truth and fatigue and exhaustion have affected him. That is why Allah has revealed His ideal behavior to the people. Despite the strong goodwill of the government and parents, our moral character is not improving much. In order to improve one's moral character and reach the ultimate goal of human life, It is must necessary to follow a Ideal Human being. Hence the incarnation of this Article. His story shows that Yusuf (As) defended his instincts in the fear of Allah, despite the wonderful opportunities he had in his youth. He came out the peril of calamity through reliance on Allah and patience. His holy character can be source of inspiration to prevent the moral decay of today's society. In Yusuf (As) character there is a myriad of mysteries of human nature, a variety of activities of human thought and a myriad of moral, and educational reason for human society. These are the teachings of this story and the signs of Allah's power.****]***

Kewords: Yusuf (As), Patience, Character, Justice, Development

* সহকারী অধ্যাপক (ইসলামিক স্টাডিজ) সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা: মানবকল্যাণের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যা সর্বযুগের, সর্বকালের ও সর্ব মানুষের এবং তা টিকে আছে হাজার হাজার বছর ধরে। নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ. হলেন একমাত্র নবী, যাঁর পুরো কাহিনী একটি সূরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এর ১১১ টি আয়াতের মধ্যে ৯৯ টি আয়াতে হযরত ইউসুফ আ. এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এছাড়া সূরা আন'আমের ৮৪ এবং সূরা মুমিনের ৩৪ নং আয়াতে তাঁর নাম এসেছে। এর মধ্যে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা যেমনি অলৌকিক, তেমনি চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়। এর কাহিনীতে রয়েছে দুনিয়ার তিক্ত বাস্তবতা এবং আল্লাহর উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতার সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অতুলনীয় ও অভাবনীয় এক ট্রাজিক জীবন নাট্য। যা পাঠ করলে যে কোন বোদ্ধা পাঠকের জীবনে সৃষ্টি হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা ও তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণের এক অনুপম উদ্দীপনা। হযরত ইউসুফ আ. এর জীবনী ও ঘটনাবলী শুধু জীবনবৃত্তান্ত নয় বরং এর প্রতি পদে পদে রয়েছে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন তথা সার্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য আদর্শ ও চিরন্তন শিক্ষণীয় বিষয়। নৈতিক চরিত্র উৎকর্ষ সাধন এবং মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট আদর্শ মানুষের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এতে হিংসা-বিদ্বেষ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ও জেল-যুলুম, অহংকার, আবেগ, মানব মনের দুর্বলতা, ধৈর্য, আনুগত্য, সাহসী, আভিজাত্য, তাকওয়া, মহানুভবতা এবং করুণা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি : "নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্র একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক বা পর্যালোচনা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন রকমের উপকরণ যেমন: কুরআন, হাদিস, বই, পুস্তক, তাফসির, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট এবং জার্নাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে ৫ জন ইসলামিক স্কলারের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ. এর যে সকল গুণাবলী আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে সে সকল বিষয় ইসলামের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সমস্যা বিবৃতিকরণ: বর্তমানে আমাদের সমাজে ক্রমান্বয়েই চরম অবক্ষয়ের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠছে। এ অবক্ষয় সমাজের সকলকে প্রভাবিত করেছে, দোলা দিচ্ছে আমাদের মন-মানসিকতাকে। আমাদের সমাজে অধুনা কোন আদর্শ নেই, নেই অনুপ্রাণিত করার মত কোন মহৎ মানুষ। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ মনুষ্যত্বের দীনতার চিত্র। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মত কোন পরিকল্পনা নেই ফলে আমরা প্রতিনিয়ত অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসরমান। সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে আধুনিকতা ও প্রাচুর্যপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপনের অপরিহার্য পরিণতিরূপে নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজে অশ্লীলতা, পরকীয়া প্রেমের চর্চা, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই আমাদের উন্নত চরিত্র গঠন ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্র কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা: মানব সমাজে যারা অনন্যসাধারণ, যাঁদের মধ্যে আমরা দেখেছি মনুষ্যত্বের অপার বিস্ময়, তাদের শ্রদ্ধা করি। যা মানুষের জীবনকে করে সুন্দর, নির্মল ও রুচিস্নিগ্ধ। এর সাথে জড়িয়ে আছে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রম, উত্তম চরিত্র, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হওয়ার বিশেষ কতগুলো গুণ। মোটকথা মানুষের অনাগত ভবিষ্যতের অন্ধকার পথে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন একটি আলোক-বর্তিকার প্রয়োজন হয়। শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনচরিতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়, সত্যকে আবিষ্কার করে, উদ্বুদ্ধ হয়ে নবতর চেতনায়। ফলে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়, সৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, জীবনকে একটি উদ্দেশ্যময় ও সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করতে তৎপর হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

প্রধান উদ্দেশ্য: নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইউসুফ (আ.) এর চরিত্র সম্পর্কে জানা।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

১. আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.) ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানা
২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্রের কার্যকারিতা নির্ণয় করা
৩. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্রের প্রভাব নির্ণয় করা; এবং
৪. অবক্ষয়ের প্রতিকারের উপায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ বের করা।

গবেষণার প্রশ্ন:

১. হযরত ইউসুফ (আ.) কে ছিলেন?
২. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক কী?
৩. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্রের প্রভাব কী?
৪. অবক্ষয়ের প্রতিকারের উপায় কী?

সাহিত্য পর্যালোচনা: আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তাঁর নবীগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন ও এসব ঘটনা বিশ্ববাসীর জন্য অনন্য উপদেশ ও নসিহত।[১] আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নবী-রাসূলদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব স্থান ও কালকে অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এঁদের ব্যক্তিত্বালোক সূর্যালোকের ন্যায় সবার উপর পড়ে। সূর্যালোকের সীমাবদ্ধতা আছে। এটি অস্বচ্ছ ও প্রতিবন্ধকতাকে ভেদ করতে পারে না। মহত্তম ব্যক্তিত্বালোক কেবল মিত্রের নয়, শত্রু ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের হৃদয়কে আলোকিত করে। মানুষ শক্তিশালী সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বকে কাল-কালান্তরে অনুসরণ ও অনুকরণ করে। এ অনুকরণ কোন মোহচ্ছলে বা আবেগ তৃপ্তির জন্য নয়। এর মধ্যেই ব্যক্তি জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে। অনুসরণের স্বার্থকতার জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব মানবের নিকট অনুসরণের দাবি রাখে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাকে আহসানুল কাসাস (অতীব সুন্দর ঘটনা) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] প্রবন্ধকার আলী (২০০৭), নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষের জন্য এবং মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট আদর্শ মানুষের অনুসরণ

ও অনুকরণের আবশ্যক হয়ে পড়ে। হযরত ইউসুফ আ. এর চরিত্র অনুশীলন করার মতোই আদর্শ। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি ও দৃষ্টিভঙ্গি যে কোন ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।[৩] প্রবন্ধকার খালিক (২০১১), একজন ব্যক্তি, সমাজ, সংস্থা ও রাষ্ট্রকে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নান্দনিক চরিত্র অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।[৪] প্রবন্ধকার আবিদ (২০০৬), কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নৈতিক প্রয়াস হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণের প্রমাণিত সাফল্যের ফলস্বরূপ হযরত ইউসুফ আ. এর নিষ্পাপ চরিত্র নির্দেশক হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।[৫] প্রবন্ধকার রওনক দেখিয়েছেন, কোনো ব্যক্তির চরিত্র কোনো সমাজের নৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ড হতে পারে না। কেবল শিক্ষাই নৈতিক উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।[৬] হক দেখিয়েছেন, কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ মানুষকে বিজ্ঞানবিমুখ, গোঁড়া ও কূপমণ্ডক তৈরি করে। যা সমাজের নৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।[৭] নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হযরত ইউসুফ আ. এর চরিত্র : একটি ইসলামী পর্যালোচনা এই শিরোনামে কোন গবেষণা প্রবন্ধ হয়নি। উপরোক্ত গবেষণাগুলোতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্র সাধারণ মানুষের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে তা প্রয়োগের বিভিন্ন দিক ফুঁটে ওঠেনি। তাই এ প্রবন্ধের অবতারণা। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, অনেকের ব্যক্তিত্বই আকর্ষণীয়। সকল নবী-রাসূলের অনুকরণ করা দূষণীয় নয়। ইউসুফ (আ.)-এর ইতিহাসের তথ্য মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সুযোগ-দুর্যোগ ও সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে মানুষের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার বহুল উপকরণ। সেই সাথে ইতিহাসের জন্য প্রয়োজনীয় সমকালীন বিশ্বের মানুষের ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ উপকরণ রয়েছে। ইউসুফ আ. ঘটনাটি শুধু একটি কাহিনী নয় বরং তা চারিত্রিক উৎকর্ষের এমন এক স্বর্ণোজ্জ্বল উপাখ্যান যার প্রতিটি দিক মানব জাতির জন্য জ্ঞান, শিক্ষা ও উপদেশে পরিপূর্ণ। ঈমানী শক্তি, অবিচলতা, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, পবিত্রতা, সততা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা, উদারতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, ধৈর্য, আল্লাহপ্রেম, তাক্ওয়া, আত্মিক পরিশুদ্ধি, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার লক্ষ্যে সঠিক ধর্মমত প্রচারে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাধনার একটি সোনালী ধারা তাঁর জীবন কাহিনীতে চিত্রিত হয়েছে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনীকে "আহসানুল কাসাস" বলা হয়েছে।[৮]

পরিধিঃ মানুষের যত ধরনের জীবন ব্যবস্থা রয়েছে বা থাকা সম্ভব প্রায় সবধরনের জীবন ব্যবস্থার নমুনা ও নির্দেশনা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে রয়েছে। তাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবন ব্যবস্থা ব্যাপক ও বিস্তারিত। একজন অভাবীর জন্যে যে আদর্শ প্রয়োজন তা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে রয়েছে। একজন শাসকের জন্য যে আদর্শের প্রয়োজন তা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনে রয়েছে, এভাবে সাধারণ ব্যক্তি, অত্যাচারিত, শোষিত, শ্রমিক, নির্ধন-নিঃস্ব, ধনবান-দাতা, যোদ্ধা, ছাত্র, শিক্ষক, দাস, স্বামী, পিতা, সমাজসেবক, সাম্রাজ্যধিপতি অনুকরণীয় আদর্শ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনীতে রয়েছে। তাই তাঁর সমগ্র জীবনচরিতকে যে কোন পেশা ও প্রেক্ষাপটে মানুষ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তাই এ প্রবন্ধে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক যেমন তাঁর

চারিত্রিক নান্দনিকতা, সত্যবাদিতা, সহজ অমায়িকতা, ধৈর্য, কষ্ট, উদারতা, তাকওয়া, মহানুভবতা, আমানতদারিতা, তার কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বিস্তারিতভাবে ফুঁটিয়ে তোলা এবং পাঠকদের জন্য তা স্মারক হিসেবে উন্মেচিত করা যা আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পরিচয়ঃ লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইউসুফ শব্দটি আরবি আল আসফ থেকে নির্গত। যার অর্থ রাগান্বিত হওয়া, দ্রুত দুঃখিত হওয়া। ইব্ন মানজুর বলেন, অতিরিক্ত দুঃখ রাগকে আরবিতে আসফ বলা হয়।[৯] হযরত ইউসুফ (আ.) জীবনে অনেক দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। তাই তিনি ইউসুফ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।[১০] কিন্তু ইউসুফ (আ.) ছিলেন দৃঢ়বিশ্বাসী, আল্লাহর উপর ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। তিনি সকল বন্ধুর পথ সফলতার সাথে অতিক্রম করতে পেরেছেন। ইউসুফ (আ.) ছিলেন নবী পরিবারের সন্তান।[১১] তাঁর বাবার নাম হযরত ইয়াকুব (আ.)। ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে কেবল হযরত ইউসুফ (আ.) ই নবী ছিলেন।[১২] তাঁর জন্মের সময় হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বয়স ছিল ৭৩ বছর। হিব্রু ভাষায় ইউসুফ শব্দের অর্থ বৃদ্ধি ও বরকত। ইউসুফ (আ.) সহ হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বার জন পুত্র সন্তান ছিল। এই বারোটি পরিবার সবাই বনী ইসরাইল নামে খ্যাত হয়। বারো পুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ.) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আ.)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা পিতা ইয়াকুব (আ.)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যার জন্য তারা ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল : আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনিয়ামিনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না।[১৩] আমাদের পিতার উচিত হলো এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে না পারে।[১৪] তারা ভাবল ইউসুফের অনুপস্থিতিতে বাবার মনের টান আমাদের দিকেই আকৃষ্ট হবে।[১৫] যার ফলে তারা ইউসুফ (আ.) থেকে নিরাপদ থাকবে আর তারা তাদের পিতাকে নিয়ে ভালো থাকতে পারবে।[১৬]

ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ.)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তান-প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর

কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যেই দেখত, সেই আদর করতে বাধ্য হতো। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। বাচ্চা শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরি বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব (আ.) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অত:পর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি আটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আ.)-এর কাছ থেকে একটি হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হতো। ফুফু এই হাঁসুলিটিই ইউসুফ (আ.)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিলেন। ইউসুফ (আ.)-চলে যাওয়ার সময় ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে তা বের হলো। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আ.) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আ.) তার কাছেই রইলেন।[১৭] ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ইয়াকুব (আ.)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আ.)-নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়াতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন বর্ণনামতে আশি বছর বলা হয়েছে। [১৮] দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়।[১৯]

পরবর্তীতে ইউসুফ (আ.) কে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে বণিক দল (যারা ইউসুফ কে কূপ থেকে উঠিয়েছিল) বিক্রি করে দেন। প্রভুপত্নী যুলেখা ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন। ইউসুফ (আ.) তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে যুলায়খা স্বামীর কাছে ইউসুফের বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগ করেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হয়। ইউসুফ আ. ছিলেন বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টের অধিকারী। স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিসরের তৎকালীন বাদশার এক অদ্ভুত স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। এরপর নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে তিনি মিসরের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর জন্মস্থান কেনানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা খাদ্যের সন্ধানে মিসরে আগমন করলে ইউসুফের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত ঘটে। উদার হৃদয় ইউসুফ (আ.) ভাইদের পূর্বাপরাধ ক্ষমা করে তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। [২০] আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি কে? প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ (অভিজাত) ব্যক্তি আল্লাহর নবী ইউসূফ (আ.), যিনি আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র।[২১] তার সৌন্দর্য সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে।[২২] ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চেহারায় বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দ্যুতি ছিল। যখন কোন মহিলা

কোন কাজে তাঁর কাছে আসত তখন তিনি নিজের চেহারা ঢেকে রাখতেন। [২৩] রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর মাতাকে দান করা হয়েছে আর দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য দান করা হয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীকে। রবীআহ আলজারশী (র.) হতে বর্ণনা করেন, সৌন্দর্য দুই ভাগে ভাগ করে হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার মাতা হযরত রাহীলকে অর্ধেক দান করা হয়েছে। আর অর্ধেক সমস্ত মাখলুকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।[২৪] বাগাবী (র.) বলেন, তিনি তার দাদী সারা (আ.)-এর সৌন্দর্য পেয়েছিলেন।[২৫]

পরিশেষে এক পর্যায়ে মিসরের নৃপতি রাইয়ান আযীযে মিশরের স্ত্রী রা'য়িল যার ডাক নাম জুলেখা এর সাথে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বিবাহ দেন। তাঁতে তাঁর ওসিয়াত অনুযায়ী পূর্বপুরুষদের সাথে সিরিয়ায় দাফন করা হয়। [২৬]

নৈতিক মূল্যবোধ : নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে অলিখিত সামাজিক বিধান। যা সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, আদর্শ, পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। মূল্যবোধ হচ্ছে এমন এক ধরনের যোগ্যতা বা উৎকর্ষ যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করতে সহায়তা করে। স্পেফার বলেন, ভালো-খারাপ, ঠিক-বেঠিক এবং কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নাম মূল্যবোধ।[২৭] আর সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় মূল্যেবোধ হচ্ছে এমন একটি আদর্শের মাপকাঠি, যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ এবং আকাঙ্খার নৈতিক, নান্দনিক ও যৌক্তিক প্রাসঙ্গকিতা যাচাই করে।[২৮]

David M. Newman বলেন, A value is a standard of judgement by which people decide on desirable goals and outcomes.[২৯] হযরত ইউসুফ আ. এর নিম্নোক্ত গুণাবলি সামাজিক অবক্ষয় রোধ করবে এবং নৈতিক চরিত্র উৎকর্ষের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। এ সকল গুণাবলি সমাজে প্রচলিত হলে সর্বত্রই শান্তির সু-বাতাস বিরাজমান থাকবে। আর তা সমাজে না থাকলে সর্বত্রই অশান্তি থাকবে যা যে কোনো জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত ইউসুফ আ. এর চরিত্রের যে দিকগুলো মানুষের মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে তা বিশ্লেষণের জন্য ০৫ জন ইসলামিক স্কলারের সাথে ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

ধৈর্যঃ ধৈর্য মুমিনের ভূষণ। উত্তম চরিত্রের বিশেষ কল্যাণকর গুণ ও সফলতার চাবিকাঠি। হযরত ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে ধমক, মারধর ও অভিশাপ দিয়ে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। কূপ থেকে ওঠার চেষ্টা করলে তাঁর ভাইয়েরা হাতে আঘাত করলে তিনি কূপের নিচে পড়ে গেলেন।[৩০] এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছিল। কারণ তিনি জানতেন ধৈর্যের কারনে আল্লাহ তাঁকে সফলতা দান করেছেন। দুনিয়ায় মানুষের বিপদ-আপদ আসা স্বাভাবিক। যাদের আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা আছে, তারা কোন পরিস্থিতিতে বিচলিত হন না। বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে পরিস্থিতি বুঝে তা মোকাবেলা করেন। ধৈর্যই মানুষকে সব বিপদ আর দুরাবস্থার মধ্যে আশা করার শক্তি দেয়। তাকওয়া দ্বারা

বিপদ থেকে বেঁচে থাকা যায় আর বিপদে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন জায়গায় এ দু'টি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১] এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, وَجَآءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ "তারা তাঁর জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।[৩২]

তাকওয়াঃ পুরো কুরআন মাজীদ তাকওয়ার আদেশে পরিপূর্ণ। ইসলামের মূলনীতি হলো, কোন নির্দেশ বা বিধান জারি করার পূর্বে বা পরে সাধারণত তাকওয়ার আদেশ করা হয়। কারণ তাকওয়া হচ্ছে ঔ বস্তু, যা মানুষকে আল্লাহর যে কোন হুকুম পাবন্দির সাথে মেনে চলতে বাধ্য করে। অন্তরে আল্লাহ প্রেমের গভীরতার কারণে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও লাভ ক্ষতির উর্ধ্বে মানুষের কল্যাণ এবং আল্লাহর দীনের জন্য নিজের দেহ-মন উৎসর্গ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। তাকওয়ার কারণেই বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ আ. এর নিকট তা'বীর অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা জানতে চাইলো, তখন তিনি তা'বীর দানে বিলম্ব করলেন না এবং কোনো শর্তও আরোপ করলেন না অথচ তিনি তখন জেলে অনেক কষ্টে সময় পার করছিলেন। এমন কি সেই ব্যক্তিকে এই বলে লজ্জিতও করলেন না যে, এতদিন পর আজ আমার কথা তোমর মনে পড়ল? তা'বীর দানের মধ্যে ইউসুফ আ. বললেন, প্রথম সাত বছর যে শস্য জন্মাবে, তা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করো এবং অল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তুলো। অবশিষ্ট শস্য শীষসহ রেখে দিও। এতে করে তা কীট-পতংগ থেকে রক্ষা পাবে এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সক্ষম হবে। [৩৩] কুরআনুম মুবিনে এসেছে,

يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ "সে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, এদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সমন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।[৩৪] এছাড়াও হযরত ইউসুফ আ. এর আল্লাহভীতির ফলে কারাবাসের কঠিন দুঃখের সময় ও বন্দিদ্বয়কে দীনের আহ্বান প্রদানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَاهِلِينَ "ইউসুফ বললো, হে আমার প্রতিপালক এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।[৩৫]

নিষ্পাপ চরিত্রঃ নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক। হযরত ইউসুফ আ. এর রূপ ও অসাধারণ গুণাবলী জেলখানায়ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। তাঁর বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, সেবা ও মানবপ্রেম, ইবাদত-বন্দেগী

ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা এবং কারাবন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা জেলের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়লো এবং কারাবন্দিরা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভক্তে পরিণত হলো। ঐ সময়ের কয়েদখানাসমূহের নিবর্তনমূলক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের ইউসুফ (আ.)-এর কাছে অবাধ গমণাগমণ, তাদের সাবলীল ও স্বত:স্ফূর্ত আলাপচারিতা, যুবক বন্দীদ্বয়ের মুখে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মহাত্মা ও সদাচারের স্বীকৃতিমূলক উচ্চারণ প্রমাণ করে যে, জেলখানায়ও তাঁর গুণাবলি সর্বজনবিদিত হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.) সেখানে সসম্মানে অবস্থান করছিলেন।[৩৬] এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে এসেছে, وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ "সে বললো, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৭] তাছাড়া হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্পাপ চরিত্রের স্বাক্ষী দিয়েছেন আযীযের স্ত্রী ও রাজদরবারের নারীগণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَاوَدْتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

"বাদশা নারীগণকে বলল, যখন তোমরা ইউসুফ হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কী হয়েছিল? তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মহাত্মা! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এখন সত্য প্রকাশ হলো আমি তাকে ফুঁসলিয়ে ছিলাম, সে তো সত্যবাদী।[৩৮]

নারীদের খাস মজলিসে প্রবেশ থেকে বিরত থাকা: যে নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ নয় এমন নারীর সাথে কোনো পুরুষলোকের একান্ত সাক্ষাতকার বর্জন করতে হবে। তার সাথে সাক্ষাত প্রয়োজন হলে নারীর মাহরাম আত্মীয় তার সাথে থাকতে হবে। অন্যথায় সাক্ষাত হবে চরিত্র হননের বড় কারণ। আসলে জুলেখা স্বামীর অনুপস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় কাজে তার ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে একাজ করার সাহস পেয়েছিল। তাই সর্বাবস্থায় নারীদের খাস মজলিসে প্রবেশ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও বড়ই মন্দের পথ। [৩৯]

অশ্লীলতার প্রচার না করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, শহরের কতিপয় নারী বলল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক ভৃত্যের কাছে অসৎ কর্ম কামনা করেছে। প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।[৪০] আযীযের স্ত্রী তার ঘরের ভৃত্যকে তার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। তার সাথে গর্হিত কাজ করার কুপ্রস্তাব দেয়। এ বিষয়টি মিসরের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় এবং এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি দ্রুত গতিতে প্রচার হতে লাগল। যেখানেই মেয়েরা একত্রিত হত সেখানেই মুখরোচক হয়ে উঠত এ ঘটনা। শহরের আনাচে কানাচে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। আযীযের স্ত্রী কী করে একজন ভৃত্যের প্রেমে হাবুডুবু খায়? [৪১] এখানে বড় শিষ্টাচার হল অন্যায়, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ কাজের প্রচার বন্ধ করা।

দয়াঃ জীবের প্রতি দয়া সমাজে শান্তি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পথ ত্বরান্বিত করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুণ ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবের জন্য দয়ার হাত সম্প্রসারিত করা। হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে প্রবেশ করে দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্তনা দিতেন। কোন কয়েদীর জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গেলে তিনি তা প্রশস্থ করে দিতেন। কারও আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে তার সমাধানের চেষ্টা করতেন। [৪২] ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ইয়াকুব (আ.)-এর নিকটে পৌঁছলো তখন তারা দেখল যে তাদের প্রদেয় মূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললো : বাদশা আমাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন, উত্তম আতিথেয়তা করেছেন, আমাদের কাছে রসদ বিক্রয় করেছেন, তদুপরি রসদের মূল্যও ফেরত দিয়েছেন। এর চাইতে বেশি আর কি আশা করা যায়? অথবা এর অর্থ, আমরা এর বেশী দয়া বা অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি না। কিংবা বাদশাহর দয়া সম্পর্কে কথা বলার জন্য আমরা আর কি জিনিস খুঁজবো।[৪৩]

সত্যবাদিতাঃ যে সব গুণ মানব চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলে তার মধ্যে অন্যতম হলো সত্যবাদিতা। সত্য ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার নিজেকে আবিষ্কার করে এবং মনুষ্যত্বকে অর্জন করে। সত্যবাদিতা থেকে বিচ্যুত হলে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে ফলে সমাজ জীবনে অবৈধ কার্যকলাপ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মানুষের মহৎ গুণাবলির তিরোধান ঘটে। হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। তিনি অন্যায়কারী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার পর কোন কিছু গোপন না করে তাঁর মনিবের স্ত্রীর বিরুদ্ধে সত্য বলেছিলেন। قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي "ইউসুফ বললো, সে-ই আমার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছে। [৪৪] এর মাধ্যমে মিথ্যা ও অসত্যকে বিতাড়িত করে সত্য চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকে বলে এর মূল্য হাজার হাজার বছর ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাঃ ইউসুফ (আ.)-কে কূপে ফেলে তাঁর ভাইয়েরা পিতার কাছে এসে বললো, ইউসুফ (আ.)-কে বাঘে খেয়ে ফেলেছে এই হলো তাঁর রক্তমাখা জামা। তখন হযরত ইয়াকুব (আ.) বললেন, তাকে কি করে বাঘে খেল অথচ তার জামাটি ছিঁড়ল না।[৪৫] পরবর্তীতে বিনা দোষে দীর্ঘ কারাভোগের দুঃসহ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) নিশ্চয়ই মুক্তির জন্য উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু বাদশাহর পক্ষ থেকে মুক্তির নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি দূতকে ফেরত দিলেন। এর কারণ এই যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কারামুক্তির চাইতে তার উপরে আপতিত অপবাদ মুক্তিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এরপরে ইউসুফ (আ.) যখন কারাগার থেকে বের হয়ে বাদশাহর সম্মুখে আসেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। বাদশাহ্ সত্তরটি ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলেন। যখন যে ভাষায় তিনি কথা বলেন, ইউসুফ (আ.) তখন সেই ভাষায়ই তার উত্তর দিতে থাকেন। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ অসাধারণ যোগ্যতা দেখে বাদশাহ বিস্মিত হন।[৪৬] হযরত ইউসুফ (আ.) কে মুক্তিদান ও মিসরে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে, মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে নেতৃত্ব দেবে এবং আল্লাহর কিতাব ও বিধি-বিধান শিক্ষা করে তা জারি করবে। এছাড়া আমি ইউসুফকে

অনিবার্য বিপদ-আপদের ইঙ্গিতবহ স্বপ্নের ব্যাখ্যা শেখাব, যাতে সে তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বিপদ শুরু হওয়ার আগেই তা থেকে রক্ষার উপায় অবলম্বন করতে সক্ষম হয়।[৪৭] আল্লাহ্ বলেন, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ "সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং এভাবেই আমি সৎ কর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।[৪৮]

অপবাদ ও মিথ্যার প্রতিবাদঃ কারও প্রতি কোন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফাই করা সুন্নাত। এ সময় চুপ থেকে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা ঈমানদারের কাজ নয়। তাই ইউসুফ (আ.) বললেন, সে-ই আমাকে স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করতে ফুসলিয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ

"ইউসুফ বলল, সেই আমার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিল। স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, যদি তার জামার সামনের দিক ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে স্ত্রী লোকটি সত্য বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী কিন্তু তার জামা যদি পিছন দিক হতে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।[৪৯] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মিথ্যা অপবাদ মাথায় পেতে নেয়া তাওয়াকুল বা বুযুর্গী নয়, বরং এর প্রতিবাদ করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করাই নবীগণের সুন্নাত। আবার অন্যায় করেও অপরাধ ঢাকার কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। যেমন ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা অপবাদ থেকে মুক্তির জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নিল। ফলে তারা রাতের বেলায় ফিরে আসে, যাতে তাদের চেহারায় মিথ্যার আলামত দেখা না যায়। সাধারণত রাখালরা ফিরতে ঈশা পর্যন্ত দেরী করে না।[৫০]

স্বীয় পবিত্রতার স্বপ্রমাণ ও অপবাদ থেকে মুক্তিঃ বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ আ. কারাগার থেকে বের করার জন্য দূত প্রেরণ করলো, তখন তিনি দূতকে বললেন: প্রথমে ঐ মহিলাদের অবস্থা তদন্ত করা হোক যারা হাত কেটে ফেলেছিল। এটা এ জন্য যে, যে অপকর্মের অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ্ ও অন্য সবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক এবং তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এই যে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জনসাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই যে মালিকের স্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোন সময় এ জাতীয় ধারণা দ্বারা স্বয়ং বাদশাহরও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পূর্বে এ ব্যাপারে সাফাই ও তদন্তকে জরুরী মনে করলেন।[৫১] তখন হস্ত কর্তনকারীগণ বলল : আল্লাহ মহান, আমরা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মন্দ কোন কিছু জানি না। আযীয মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হলো এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

"বাদশাহ বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে আস। যখন দূত তার নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্যক অবগত।[৫২] এ সম্পর্কে আল্লাহ্ আরও বলেন,

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بَشَراً إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ

"স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনলো, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল, তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলল, তাদের সামনে উপস্থিত হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তাঁর গরিমায় অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহ্র মহাত্মা! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্তা।[৫৩]

অপরাধ হতে মুক্ত থাকার জন্য দু'আ ও চেষ্টা: "হযরত ইউসুফ (আ.) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।[৫৪] ইউসুফ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এসব নারী আমাকে যার দিকে আহবান করছে, তা থেকে কারাগারই আমার জন্য অধিক শ্রেয়।[৫৫] ইউসুফ (আ.)-এর প্রচেষ্টা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন স্থানে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান এবং সম্পূর্ণ নিরূপায় অবস্থায় ও আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ও সাধ্য অনুসারে কাজ করা বাঞ্ছনীয়।

পরকালের চিন্তার প্রভাব: পরকালের চিন্তা মানুষকে দুনিয়াবি লোভ-লালসা কমিয়ে নৈতিক হতে সহায়তা করে। "নির্জনতায় যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.) কে আকৃষ্ট করার জন্য তার রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। যুলায়খা বলল, তোমার মাথার চুল কত সুন্দর! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন ঃ মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল ঃ তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোহর। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন ঃ মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমন্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরোও বললো ঃ তোমার মুখমন্ডল কতই না কামনীয়। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন ঃ এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশি প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগবিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।[৫৬]

আল্লাহর নির্দেশ পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা: যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালনে চেষ্টারত থাকেন তিনি কোন অপরাধ করতে পারেন না। আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনাবলি পালনে সাধ্যানুযায়ী

চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়া; যেমন ইউসুফ আ. সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌঁড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দিয়েছেন। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহর সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করে দেন।[৫৭] আল্লাহ্ বলেন,

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

"তারা উভয়ে দৌঁড়িয়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পেল। স্ত্রী লোকটি বলল, যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হতে পারে? [৫৮]

সর্বদা আল্লাহর উপর নির্ভরঃ কোনো গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার তাওফীক হলে তার জন্যে গর্ব করা উচিত নয় এবং এর বিপরীতে যারা গুনাহ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয় বরং ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার সত্তাগত গুণ নয় বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা। মানুষ যখন কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদমুক্তি ও আল্লাহর নিয়ামত লাভের পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। এ কারণেই ইউসুফ আ. ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেননি বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন। তাই আল্লাহ ব্যতীত কারো উপর নির্ভর করা আমাদের উচিত নয়। মালিক ইব্ন দীনার র. বলেন, ইউসুফ আ. যখন সাকীকে বললেন : তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলো, তখন তাকে বলা হলো, হে ইউসুফ! তুমি আমাকে ভিন্ন অন্যকে উকিল ধরেছ? অতএব আমি তোমার কারাবাস দীর্ঘায়িত করে দেব। এ কথা শুনে ইউসুফ আ. কেঁদে দিলেন। বললেন : ওগো আল্লাহ! বিপদের পর বিপদ আমার হৃদয়কে ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই একটি কথা বলে ফেলেছি। আর কোন দিন বলব না। হাসান র. বলেন : জিবরাঈল আ. কারাগারে ইউসুফ আ. এর নিকটে আসলেন। ইউসুফ আ. তাঁকে দেখা মাত্রই চিনে ফেললেন। বললেন : হে নবী-রাসূলদের বন্ধু! আপনাকে এ অপরাধীদের মাঝে দেখছি যে? তখন তাকে জিবরাঈল আ. বললেন : "হে পবিত্রতম পিতৃ-পুরুষদের পবিত্রতম সন্তান! নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আপনাকে সালাম বলেছেন! আর তোমার কি লজ্জা হয় না যে তুমি মানুষের সুপারিশ চাইলে? আমার মহিমার শপথ! আমি তোমাকে আরও কয়েক বছর কারাগারে রাখব।" ইউসুফ (আ.) বললেন : এতে করে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন তো? জিবরাঈল আ. বললেন : হ্যাঁ, তা বটে। তিনি বললেন : তাহলে আমার কোন পরওয়া নেই। [৫৯] فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ "অতঃপর তার প্রতিপালক তার

আহবানে সাড়া দিল এবং তাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৬০]

মানবকল্যাণ: সাধারণ লোকদের পরলৌকিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে পরকালের ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গাম্বরদের কর্তব্য, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দায়িত্ব। ইউসফ (আ.) এ ক্ষেত্রে শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি ; বরং বিজ্ঞজনোচিত ও হিতাকাঙ্খীর ন্যায় পরামর্শও দেন যে, উৎপন্ন গম শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে এবং খোরাকির পরিমাণে বের করবে-যাতে সেসব শস্য নষ্ট না হয়ে যায়। [৬১] কুরআনুল আযীমে এসেছে,

ثُمَّ يَأْتِى مِن بَعْدِ ذٰلِكَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ

"ইউসুফ (আ.) বলল, তোমরা সাত বছর একে একে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে এর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সকল শীষসমেত রেখে দিবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর এই সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে, কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত।[৬২]

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: হযরত ইউসুফ (আ.) চেয়েছিলেন সকলের জন্য প্রযোজ্য একটি সুন্দর শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি ইউসুফকে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে।" ইউসুফ (আ.) যখন তাঁর ভাইদের খাদ্যশস্যের বোঝা প্রস্তুত করে দিলেন, তখন প্রস্থানের সময় বলে দিলেন, এ খাদ্যশস্য শেষ হওয়ার পর যদি আবার আসতে চাও তবে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে সাথে আনবে যাতে তার অংশ দেয়া যায়। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরোপুরি মাত্রায় মেপে দেই এবং সর্বাধিক অতিথিপরায়ণ? অতএব তোমাদের ঐ ভাই আসলে তাকে আমি পুরোপুরি অংশ দেব এবং তাকে আদর ও আপ্যায়ন করব; যেমন তোমরা নিজেদের ব্যাপারে তা দেখেছ।[৬৩] কুরআনুল কারীমে এসেছে,

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِين

"এবং সে যখন তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম আতিথিপরায়ণ।"[৬৪]

আমানতদারিতা: হযরত ইউসুফ আ. বাদশাহর দূতকে এই জন্যই ফেরত দিয়েছেন যেন আযীয এ কথা বুঝতে পারে যে আমি তার অবর্তমানে তার খেয়ানত করিনি। আর আল্লাহ তা'আলা খেয়ানতকারীদের খেয়ানত চলতে দেন না।[৬৫] পরবর্তীতে হযরত ইউসুফ (আ.) কে

ধনভাণ্ডারের সংরক্ষণকারী বা আমানতদ্বার হিসেবে নিয়োগ দিলেন। তখন তিনি বললেন আপনি আমার নিকট যা আমানত রাখবেন তা আমি সংরক্ষণকারী।[৬৬]

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَائِنِينَ

"এটা এই জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না ।[৬৭]

আতিথেয়তা: ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের বললেন, আগামী বছর তোমরা যখন আসবে তোমাদের অন্য ভাইকে সাথে নিয়ে আসবে। তোমরা কি দেখছ না , আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই এবং মেহমানদেরকে সমাদর করি অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে উত্তমভাবে মেহমানদারী করেছি, তোমাদের থাকার ভালো ব্যবস্থা করেছি।[৬৮] খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে যখন তারা বাড়িতে পৌঁছলো তখন তারা বলল, "আমরা একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে এত আদর-আপ্যায়ন করেছেন যে, আমাদের স্ববংশের কোন লোক হলেও তা করতো না। ইউসুফ আ. দিনে একবার আহার করতেন এবং অন্যদেরও ব্যবস্থা করতেন। ইউসুফ আ. রাজা ও তার লোকজনের জন্য প্রত্যহ একবার আহারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। শুধু দুপুরের খাবার" ।[৬৯]

সৌজন্যতা ও অধিকার এবং মর্যাদার ভিত্তিতে সম্মান প্রদর্শন: সৌজন্যতা মুমিনের অপরিহার্য গুণ। হযরত ইউসুফ আ. যখন কারাগারে প্রেরিত হন তখন কারাগার মূলত গুন্ডা, বদমায়েশ ও অপরাধীর আড্ডাখানা ছিল। তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন যে, তারা সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায়।[৭০] এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাপাচারীদের সৌজন্যতা দ্বারা বশে আনা সম্ভব। এছাড়া অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়, তবে এতেও সাধ্যানুযায়ী অধিকার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবি। ইউসুফ (আ.) স্বীয় পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আযীয ও তাঁর পত্নীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে ঐ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত কেটে ফেলেছিলেন।[৭১]

ক্রোধ সংবরণ: চারদিকে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লে হযরত ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা (যারা তাকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল) যখন খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহের জন্য মিসরে আসলেন তখন তিনি তাদের ভাইদের চিনে ফেললেন এবং তাদেরকে বললেন, আমার এই শহরে তোমরা কি জন্য এসেছ? তারা বলল, হে আযীয! আমরা খাদ্যদ্রব্য নেয়ার জন্য এসেছি। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা গোয়েন্দা, তারা বলল, আল্লাহর পানাহ! আমরা গোয়েন্দা না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় বাস কর? তারা বলল, আমরা কেনানের অধিবাসী এবং আমাদের পিতা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ব্যতিত তার আর কি কোনো সন্তান আছে? তারা বলল আমরা মোট বারো ভাই কিন্তু আমাদের কনিষ্ঠ ভাই যে আমাদের আব্বার সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ছিল সে জঙ্গলে মারা গেছে এখন তার আপন আর এক ভাই আছে। তাকে আব্বা আসতে দেননি। তিনি তার দ্বারাই সান্ত্বনা লাভ করেন। এগুলো

জেনে ও শুনে তাঁর ক্রোধ সংবরণ করেন "তারপর হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের যত্ন ও সম্মান করার নির্দেশ দিলেন।[৭২]

ক্ষমা: হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন ক্ষমাশীলতার মূর্ত প্রতীক। ক্ষমাশীলতা ছিল তার জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। হযরত ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যে অন্যায় করেছিল, এক. মিথ্যা কথা বলে ইউসুফ আ. কে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে সম্মত করা। দুই. পিতার সাথে অঙ্গিকার করে ভঙ্গ করা। তিন. কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। চার. বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোঃকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। পাঁচ. একটি নিরাপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। ছয়. একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোর-জবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া। তার ভাইদের এত অপরাধের পরও হযরত ইউসুফ (আ.) কে কূপে নিক্ষেপ করেছিল তা তিনি একবারও বলেননি বরং এতটুকুই বলেছিলেন আল্লাহ আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ ভাইদের অপরাধ তিনি পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।[৭৩] এবং যাদের হাতে সাত অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতা পেয়েও হযরত ইউসুফ আ. তাদের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দেয়াও পছন্দ করেননি। মহিমান্বিত কুরআনে এসেছে, قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ "সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[৭৪]

দক্ষ প্রশাসক: শাসক হিসেবে হযরত ইউসুফ আ. অত্যন্ত সফলকাম ছিলেন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকলহ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সমাজসেবার মাধ্যমে তাঁর সময়ে মিসরে খাদ্যশস্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে এবং সর্বত্র সুখ-শান্তি বিরাজ করে। "হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশে ব্যাপক ফসল উৎপন্ন হয়। "রাজকার্যে স্থির হয়ে সবার পর খাদ্য শস্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। তিনি প্রচুর খাদ্য ভাণ্ডার ও গুদাম তৈরি করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নির্দেশক্রমে উৎপন্ন ফসলের বৃহদাংশ সঞ্চিত রাখা হয়। এতে বুঝা যায় যে, আধুনিক এলএসডি, সিএসডি খাদ্য গুদামের অভিযাত্রা বিগত দিনে হযরত ইউসুফ আ. এর মাধ্যমেই হয়েছিল। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশের বাস্তবতা শুরু হয় এবং দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় জানতেন যে, এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হবে এবং আশে-পাশের রাজ্যসমূহে বিস্তৃত হবে। তাই সংরক্ষিত খাদ্যশস্য খুব সতর্কতার সাথে ব্যয় করা শুরু করলেন। তিনি ফ্রি বিতরণ না করে স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সাথে মাথাপ্রতি খাদ্য বিতরণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। তাঁর আগাম হুঁশিয়ারি মোতাবেক মিসরীয় জনগণের অধিকাংশের বাড়িতে খাদ্যশস্য মওজুদ ছিল। ফলে পার্শ্ববর্তী দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্যসমূহ থেকে দলে দলে লোকেরা মিসরে আসতে শুরু করেন। অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে খাদ্য বিতরণের তদারকি হযরত ইউসুফ আ. নিজেই করতেন। তাঁর দক্ষতার কারণে মহা বিপর্যয় থেকে কাটিয়ে উঠতে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন।[৭৫] আল্লাহ্ বলেন, قَالَ

اَجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ "ইউসুফ বললো, আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি তো উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ। [৭৬]

দোষারোপ নয়: কাউকে অহেতুক দোষারূপ করা মুমিনের কাজ নয়। যেমনটা হযরত ইউসুফ আ. কোনোভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদের লজ্জা দেওয়া সমীচীন মনে করেন নি। শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে বলেছিলেন আমার ভাইয়েরা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোকায় ফেলে এ কাজটি করিয়েছে। হযরত ইউসুফ আ. কে আযীযে মিসর ও যুলায়খা লালন-পালন ও অনুগ্রহ করেছেন এবং উত্তম জায়গা দেওয়ার কারণে পরবর্তীতে যুলায়খা কে সরাসরি দোষারোপ না করে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যখন বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হলো তখন ভাইয়ের প্রতি চুরির দোষারোপ করেছো। আল্লাহ্ বলেন, قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ "তারা বললো, হে আযীয, এর পিতা তো অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।[৭৭]

অহংকারমুক্ত: সৃষ্টিজগতের প্রথম পাপ হচ্ছে অহংকার। অহংকার সকল আত্মিক পাপের মূল। অহংকার মঙ্গল ও কল্যাণ অনুভবের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। হযরত ইউসুফ (আ.) অহংকারহীন ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ী, নম্র ও সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। যাদেরকে সবাই নিঁচু মনে করতো সেই দাস-দাসীদের সাথে তিনি ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি যখন আল্লাহর ইচ্ছায় আযীয মিশর হলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি বরং এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না।[৭৮]

আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ: আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে কারাগারে এক বিরাট সঙ্কট ও কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে কোন অভিযোগও করেননি। ইউসুফ (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রমাণ–নির্দোষ হয়েও দীর্ঘ কারাভোগের পর বাদশাহর নিকট হতে মুক্তির ফরমান পাওয়া সত্ত্বেও তদন্তের মাধ্যমে নিজের নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারাগার হতে বের হতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন। এছাড়া ইউসুফ আ. এর উপর তাঁর ভাইয়েরা চোরের অপবাদ দিলে, তিনি অপবাদ শুনে আত্মবিশ্বাস হারালেন না এবং গোপন রহস্যও ফাঁস করলেন না। আত্মমর্যাদাবোধের কারণে জওয়াব দিয়ে তাদের অপবাদের স্বরূপ উদঘাটন করলেন না। মনে মনে বললেন, أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ "সে মনে মনে বলল, তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।[৭৯] চোর হয়ে কোতোয়ালকে শাসানি? উল্টো আমাকে চোর বানাচ্ছো? অথচ তোমরাই এই চুরি করেছ যে, পিতার অলক্ষ্যে ভাইকে বিক্রয় করে দিয়েছ।[৮০]

চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অবিচলতাঃ প্রলোভন ও হুমকি, বিপদের ঘনঘটা কিংবা সুখ-সাচ্ছন্দ্য, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ভোগ-বিলাসের অবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে স্মরণ রেখে ও তাঁর শরণাপন্ন হয়ে অবিচল থাকা এবং সকল পরীক্ষায় পূর্ণাঙ্গরূপে উত্তীর্ণ হওয়া, আযীয পত্নী ও তার বান্ধবীদের আসক্তির জবাবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা, অনুশোচনা ও হতাশাবোধ ছাড়াই কারারুদ্ধ হওয়ার বিপদকে বরণ করা এবং আযীয অথবা বাদশাহর নিকট আবেদন-নিবেদন না করা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ বহন করে।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوۤءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ

"সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। আমি তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। [৮১]

দানশীলতাঃ দান করার জন্য ধনী হওয়া আবশ্যক নয় বরং কারো শুভ কামনা, সুন্দর ব্যবহার, সুপরামর্শ, পথহারাকে পথ দেখানো, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সড়িয়ে ফেলা, অসচ্ছল ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা সবই দানের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম ধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। গরীব-দুঃখীদের মাঝে খাদ্য বিতরণে হযরত ইয়াকূব আ. এর অসম্মতি ছিল না। মুজাহিদ র. বলেন, একদিন ইউসুফদের বাড়িতে একজন ভিক্ষুক আসে। ইউসুফ লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে একটি ডিম দেয়। ওয়াহাব র. বলেন, বালক ইউসুফ খাদ্যদ্রব্য হতে কিছু সরিয়ে রাখত এবং গরীব-দু:খীর মাঝে বিতরণ করত। [৮২] তিনি যখন মিশরের অর্থমন্ত্রী হলেন তার পরবর্তী সময়ে চারদিকে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ল। "দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ মিসরে খাদ্যে শস্যের আশায় ছুটলো। যত বড় ব্যক্তিই হোক, ইউসুফ (আ.) কাউকেই এক উটের বোঝা হতে বেশি শস্য দিতেন না। যাতে সকলের মধ্যে ন্যায় নীতি রক্ষা হয়। কারণ কাউকে তো বঞ্চিত করা যায় না! [৮৩] অন্য দেশের নাগরিকদের অর্থ প্রদান, অর্থহীনদের বিনা অর্থে গম প্রদান অব্যাহত রেখেছিলেন।

কৃতজ্ঞতাঃ আযীয মিসরের স্ত্রী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি আসক্ত হয়ে ও অত্যধিক লোভাতুর হয়ে আপন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে আহ্বান জানায়। ইউসুফ (আ.) বললেন, (আল্লাহর পানাহ চাই) মহিলার স্বামী এ বাড়ির মালিক আমার মনিব। তিনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন এবং আমাকে অনেক মর্যাদার সাথে তার কাছে থাকার বন্দোবস্ত করেছেন।[৮৪] যার ফলে ইউসুফ (আ.) আল্লাহর কাছে সাহায্য ও আশ্রয় চাইলেন। এছাড়া যিনি তাকে সম্মানিত করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া কখনও কোন বিবেকবান ব্যক্তির কাজ নয়।[৮৫] এছাড়া বাদশাহের দরবারে হযরত ইউসুফ (আ.) হস্ত কর্তনকারী সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি, অথচ সে-ই ছিলো ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা বাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা হযরত ইউসুফ আ.আযীযের গৃহে লালিত-পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। পিতামাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি

ও পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে গ্রাম থেকে মিশর শহরে এনে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।[৮৬] আল্লাহ্ বলেন,

وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"ইউসুফ যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে ইউসুফ হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল, আস। ইউসুফ বলল আমি আল্লাহর শরণ নিচ্ছি, তিনিই আমার প্রভু তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীগণ সফলকাম হয় না। [৮৭]

সত্যের দিকে আহ্বান: তাওহীদ একমাত্র আল্লাহ্ নির্ধারিত মানবতার জন্য কল্যাণকর পথ। তাই ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, আমি বিশ্ব-মানবতাকে আহ্বান করি মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ছেড়ে যাতে এক আল্লাহ্র অভিমুখী হয়...আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এক আলো দান করেছেন, যাতে সব সাথীর দিক-দেমাগ সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে। কারও অন্ধ অনুকরণ নয়, সঠিক তাওহীদের পথচারী প্রতিটি কদমে তার মন-মানসে আল্লাহর মা'রিফত ও অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ জ্যোতি ও পরম দাসত্বের স্বাদ উপলব্ধি করে অবচেতন মনে বলে ওঠে । কুরআনে এসেছে, وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ "আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (আল কুরআন, ১২ : ১০৮)।" এছাড়াও যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে যে কক্ষে পাপকর্ম করতে চেয়েছিল, সে কক্ষে বিদ্যমান একটি মূর্তিকে যুলায়খা বস্ত্রাবৃত করে রেখেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো (যুলায়খা) পাপকর্মে রত অবস্থায় সে আমাকে দেখবে এটাতে আমি লজ্জাবোধ করি। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, যে কিছু শোনে না, দেখে না এবং বোঝে না তুমি তাকে লজ্জা দিয়েছো। সুতরাং সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা প্রতিপালককে আমার লজ্জা করাই অধিক সমীচীন।[৮৮] ইউসুফ আ. তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষদেরকে সত্যের বা মানুষের মঙ্গলের দিকে আহ্বান করেছেন। যখন তিনি কারাগারে ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, হে কারাসঙ্গীরা! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই সরল দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।[৮৯] قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِى أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى "বল এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও।[৯০]

অপরাধীকে সংশোধনের চেষ্টা: হযরত ইউসুফ (আ.) যখন যুলায়খার কুপ্রস্তাব দৃঢ়বাক্যে ও আন্তরিক ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তিনি আল্লাহর আশ্রয় ও শরণ নিয়ে যুলায়খাকে এই কুকর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য মর্মস্পর্শী উপদেশ দান করলেন। তিনি নবীসুলভ পন্থায়

যুলায়খার অন্তরেও আল্লাহর ভয় এবং স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করার মনোভাব জাগ্রত করার জন্য প্রজ্ঞাসুলভ উপদেশ বাণী উচ্চারণ করলেন এবং অন্যায় ও গর্হিত আচরণকারীর অশুভ পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোন এক সময় তার এই কুর্কীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং তখন চরমভাবে নিন্দিত ও ধিকৃত হওয়ার সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি আরও বললেন আমি যদি আযীযের অল্পদিনের অনুগ্রহ ও সদাচরণের প্রতি লক্ষ্য করে কারও অধিকারে হস্তক্ষেপকে অন্যায় ও অপরাধ মনে করি তবে তোমার জন্য তো তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে জঘন্যতম ও অমার্জনীয় অপরাধ মনে করা এবং আসন্ন পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে কুমতলব হতে নিবৃত্ত হওয়া একান্ত অপরিহার্য।[৯১]

তাড়াহুড়া না করা: তাড়াহুড়া একটি আত্মিক ব্যাধি। যর উৎস হচ্ছে মানসিক অস্থিরতা ও অহংকার। এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই ইসলাম সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ করেছে। তাড়াহুড়া একটি নিন্দনীয় স্বভাব। হযরত ইউসুফ আ. কারাগার থেকে মুক্তিলাভের জন্য দু'আ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাড়াহুড়া না করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়। আল্লাহ্ বলেন,

وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَانِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَانِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"তার সাথে দুইজন যুবক কারাগারে প্রবেশ করলো। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর নিংড়িয়ে রস বের করতেছি এবং অপরজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করতেছি এবং পাখী তা হতে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর তাৎপর্য বলে দাও, আমরা তো তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখতে পাচ্ছি।[৯২] হযরত ইউসুফ (আ.) অপরাধে লিপ্ত হওয়ার চাইতে কারাগারে যাওয়াটাকে পছন্দ করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) যদি আল্লাহর কাছে কারারুদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা না জানাতেন, তাহলে তাঁকে এ বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না।[৯৩] হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্থলে যদি আমরা হতাম তবে সাথে সাথে আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম এবং দোষমুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম না। নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন : আমিতো হযরত ইউসুফ আ.এর ধৈর্য ও ভদ্রতায় বিস্মিত না হয়ে পারি না! স্বপ্নে বাদশাহ্ সাতটি দুর্বল ও মোটাতাজা গরু দেখে তাঁর নিকট তাবীর জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি বিনা দ্বিধায় ও বিনা শর্তে এর তাবীর বলে দেন। যদি আমি তার স্থলে হতাম তবে কারাগার হতে মুক্তির শর্ত ছাড়া তার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য ও ভদ্রতায় আমার বিস্ময় হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন, যখন তার নিকট বাদশাহ্র দূত এসে কারাগার হতে মুক্তি সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বের হতে বিরত থাকলেন যতক্ষণ না তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। যদি আমি তার স্থলে হতাম তবে সংবাদ শ্রবণ করতেই দরজার নিকট দৌড়িয়ে যেতাম। কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন।[৯৪]

উদারতা: মিসরের জনগণ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাদের অর্থ, অলংকার, গৃহপালিত পশু, সহায়-সম্পত্তি শেষ করে সপ্তম বছরে তারা প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের গোলামে

রুপান্তরিত করেছিলেন। "যা হোক ইউসুফ (আ.) যখন মিসরের সব কিছুর মালিক। মানুষ বলতে লাগলো : ইউসুফের চেয়ে বড় কোন বাদশাহ আমরা আর দেখিনি। এরপর ইউসুফ (আ.) আযীয মিশরকে বললেন, আমাকে কর্তৃত্বদানে মহাত্ম্য কেমন দেখলেন? এখন আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। তিনি বলেন : আপনার মতই আমার মত। আমরা তো আপনার অধীন মাত্র। ইউসুফ (আ.) বললেন : আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনিও সাক্ষী থাকুন- মিসরের প্রতিটি মানুষকে আমি মুক্ত করে দিলাম। তারা সকলে স্বাধীন। তাদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলাম।[৯৫] দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে হযরত ইউসুফ (আ.) কখনই উদরপূর্তি করে খেতেন না। জিজ্ঞেস করা হলো রাজ্যের ধন ভান্ডার আপনার মুঠোয়, আর আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন? তিনি বললেন : আমার আশংকা হয়, পেট ভরে খেয়ে পাছে ক্ষুধার্তকে ভুলে যাই"।[৯৬] ইউসুফ (আ.) পরিপূর্ণ সদাচারণ ও অনুগ্রহ এবং পরম সম্মান প্রদর্শনার্থে তার ভাইদের পণ্যমূল্য ফেরত দিয়েছিল যাতে তারা বুঝতে পারে যে, বাদশাহ আমাদের প্রতি অত্যধিক সম্মান দেখিয়েছেন। সুতরাং আমাদের পুনরায় কার কাছে যাওয়া উচিত? তিনি চিন্তা করেছিলেন পিতা ও ভাইয়ের থেকে মূল্যগ্রহণ নীঁচুতার পরিচায়ক। বিশেষত : এই মুহূর্তে যখন তাদের এ অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন। এ জন্যই তিনি মূল্য প্রত্যার্পণের মহানুভবতা প্রদর্শন করেছিলেন।[৯৭] বায়দাবী (র.) বলেন, ইউসুফ (আ.)-এর আরও একটি মহানুভবতা এই যে, তার ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালো, আপনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল আমাদের আপ্যায়ন করান এতে আমরা ভীষণ লজ্জা পাই। কারণ আপনার সাথে আমরা যে আচরণ করেছি, তারপর আমরা আর এর যোগ্য থাকিনি।[৯৮]

আশাবাদঃ হযরত ইউসুফ (আ.) জীবনের বহু সময় অনেক কষ্টে কাটিয়েছেন কিন্তু কখনো হাল ছেড়ে দেননি। সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে তাঁর উপর সন্তুষ্ট থেকে আশাবাদী ছিলেন। কখনও নিরাশ হননি। বিপদে পুরোপুরি ধৈর্য ধারণ করেছেন। ভেঙ্গে পড়েননি কিংবা নিরাশও হননি। তিনি অতীত নিয়ে বিচলিত হতেন না কিংবা ভবিষৎকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বর্তমান সময়ের কাজের উপর অধিক মনোযোগী থাকতেন। যারা হতাশাবাদী তারা কখনই আন্তরিকভাবে কাউকে ক্ষমা করতে পারেন না। আর বিপরীতে আশাবাদীরা সাধারণত অন্যকে ক্ষমা করে দেন যাতে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে সুযোগ দেয়।

উপসংহারঃ ইউসুফ (আ.) উপরোল্লিখিত জীবনী শুধু একটি কাহিনী নয় বরং তা চারিত্রিক উৎকর্ষের এমন এক স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যার প্রতিটি দিক মানব জাতির জন্য জ্ঞান, শিক্ষা ও উপদেশে পরিপূর্ণ। কারণ তিনি ছিলেন আমাদের জন্য নিখুঁত মডেল। বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজকীয় শিষ্টাচার থেকে দূরে ছিলেন। মানুষের অবিচলতা, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্র যে কোন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রতার উৎকর্ষের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে। তাঁর নৈতিক চরিত্র একজন মানুষের পক্ষে বিরল এবং ব্যতিক্রমী ছিল। তিনি তাঁর ব্যতিক্রমী মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা এবং আধ্যাত্মিক মূল্যায়নের দ্বারা নিজেকে অন্যের থেকে আলাদা করেছিলেন। যারা এ সকল আদর্শ গঠন ও ধারন করবে, নিজের জীবনে ও কাজে-কর্মে তা বাস্তবায়ন করবে তারা হবে সোনার মানুষ। পর প্রজন্মের জন্য তারা হবে আদর্শ পূর্বসূরি। নৈতিক অবক্ষয় রোধে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর

চরিত্র কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এবং একজন মানুষের চারিত্রিক পূর্ণতার চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছাতে তাঁর জীবন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

তথ্যনির্দেশ

১. *আল কুরআন*, ১২: ১১

২. *আল কুরআন*, ১২: ০৩

৩. *Ali, J.S. "Leadership: An Islamic Perspective." Paper presented at the International Conference on Management from Islamic Perspective at Hilton Kuala Lumpur, 2007, Malaysia, 15-16 May*

৪. *A.Khaliq, and R. Fontaine, Management From an Islamic Perspective. 2nd Edition. Singapore: 2011, Pearson Customer Publishing*

৫. *A. A Aabed, Study of Islamic Leadership Theory and Practice in K12 Islamic School in Michigan. A published doctoral dissertation AAT 3206991 2006, Brigham Young University*

৬. *রওনক জাহান, নৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা,পার্ল পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাবাজার, ২০১২, পৃ,১৩*

৭. *মোজাম্মেল হক, নেতৃত্বের গুণাবলি, মেট্রো পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ,৩৬*

৮. *ড: সিরাজুল হক ও অন্যান্য, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, ২২ শ খণ্ড, পৃ. ১১৭*

৯. *ইবন ফারেস, মু'জামু মাকইয়িসিল লুগাহ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৭৯, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪*

১০. *কুরতুবী, আল জামে' লিআহকামিল কুরআন, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৭৯, ৯ম খণ্ড, পৃ.১২১*

১১. *আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, দারু আল জীল, বৈরুত, ২০০১ হাদীস নং-৪৩২০*

১২. *ইবনুল আছীর, আল কামিল ফিত-তারীখ, দারুল কুতুব আল আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৭, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪*

১৩. *রাযী, মাফাতীহুল গায়ব, দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, তেহরান, তা.বি, ৯ম খণ্ড, পৃ.৫৯*

১৪. *হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম খণ্ড, ২০১৮, পৃ. ২৪*

১৫. *সায়্যিদ কুতুব, ফি যিলালিল কুরআন, দারু ইহয়া আল তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, ১৯৭, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৬৯৯*

১৬. *ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, দারু আল জীল, বৈরুত, ১৯৮৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২*

১৭. *হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭*

১৮. *কামিল ফিত-তারীখ, ইবনুল আসীর, ১৩ম খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬*

১৯. *Abdel Haleem, M.A.S., The Story of Joseph in the Qur'an and the Old Testament, Islam and Christian Muslim Relations, Volume 1, Number 2, December 1990, pp 171-191*

২০. *মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যার যা ধর্ম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ৬৯-৭০*

২১. অধ্যাপক এ. টি. এম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য, সীরাত বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৩, পৃ. ২২
২২. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনূ. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
২৩. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর দামেশকী (র.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৫, পৃ. ৪৫৬।
২৪. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র.), তাফসীরে ইবনে কাছীর, খ. ৫, পৃ. ৩৪৪
২৫. কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র.), তাফসীরে মাযহারী, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ৪২২
২৬. ইবনুল আসীর, কামিল ফিত-তারীখ, ডিজিটাল লাইব্রেরী অফ ইন্ডিয়া, ২০১৫, ১৩ম খণ্ড, ২০১৭, পৃ. ৪৫-৪৬
২৭. Ara, Shawkat, Ucchatar Samaj Monobiggan, 2006, Dhaka: Ganabitarany, p.219
২৮. Das, Sampa, Samaj Karma, Eithas o Darshan, 2006, Dhaka: Book Choice, p. 137
২৯. Newnan, David m., Sociology, expploring the Architecture of Everyday life, California, Sage publication inc, p. 36
৩০. Ali Musa Raza Muhajir (1965), Lesson from the Stories of the Qur'an, p 83
৩১. জাফর ইসহাক আনসারী, কুরআন (অনুবাদ), টুওয়ার্ডস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি কুরআন, লেস্টার, ইউকে, দ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০, পৃ. ১৪৭
৩২. আল কুরআন, ১২: ১৮
৩৩. শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান র. ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী র., তাফসিরে উসমানী, মাওলানা আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪১০
৩৪. আল কুরআন, ১২: ৪৬
৩৫. আল কুরআন, ১২: ৩৩
৩৬. অধ্যাপক এ. টি. এম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য, সীরাত বিশ্বকোষ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৩, পৃ. ৬৫
৩৭. আল কুরআন, ১২: ৫৩
৩৮. আল কুরআন, ১২: ৫১
৩৯. আল কুরআন, ১৭: ৩২
৪০. আল কুরআন, সূরা ইউসুফ: ৩০
৪১. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, আন নবুয়াত ওয়াল আনবিয়া, দারু আল সাবুনী, ১৯৯৮, পৃ. ২৭৬
৪২. কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র.), তাফসীরে মাযহারী, ষষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭
৪৩. ইবন কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, বৈরূত : দারু তায়্যিবা, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৩৭০
৪৪. আল কুরআন, ১২: ২৬
৪৫. আল কুরতুবী, আল জামে' লিআহকামিল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৯ম খন্ড, পৃ. ২৫৯-২৬০

৪৬. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর দামেশকী (র.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অনুবাদ, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৮
৪৭. ইমাম বাগাবী, মাআলিমুত তানযীল, বৈরূত : দারু তায়্যিবাহ, ১৪১৭ হি., খ. ৪, পৃ. ২৪৫
৪৮. আল কুরআন, ১২: ২২
৪৯. আল কুরআন, ১২: ২৬-২৭
৫০. আল বুকা'য়ী, নাযমুদ দুরার, মাকতাবা ইব্ন তাইমিয়া, কায়রো, ১৩৯৬হি., ১০ম খন্ড, পৃ.৩০
৫১. ফখরুদ্দীন আর-রাযী, তাফসীরে মাফাতীহুল গায়ব, কায়রো : দারুল কুতুব, তা.বি., খ. ৮, পৃ. ৫০৭
৫২. আল কুরআন, ১২: ৫০
৫৩. আল কুরআন, ১২: ৩১
৫৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৫৫. আল কুরআন, সূরা ইউসুফ: ৩৩
৫৬. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৫৮. আল কুরআন, ১২: ২৫
৫৯. কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র.), তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫
৬০. আল কুরআন, ১২: ৩৪
৬১. Shaykh Abu Ali al-Fadl trans Tabarsi, al-, Tafsir Majma' al Bayan (Persian), Tehran: Intesharat-e Far, Majma' al Bayan, 1981, Vol.5, p.132
৬২. আল কুরআন, ১২: ৪৭-৪৮
৬৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭ ও ৮২
৬৪. আল কুরআন, ১২: ৫৯
৬৫. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র.), তাফসীরে ইবনে কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
৬৭. আল কুরআন, ১২: ৫২
৬৮. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর দামেশকী (র.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অনুবাদ, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য, প্রথম খন্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩, পৃ. ৬৭০
৬৯. কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র.), তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮ ও ৪৭৩
৭০. ইবন জারীর আত-ত্বাবারী, আল-জামিউল বায়ান ফী তাবিলিল কুর'আন, কায়রো : বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪২০ হি., খ. ১৫, পৃ. ৫৬৮
৭১. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৭২. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র.), তাফসীরে ইবনে কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫
৭৩. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৯০ ও ১২৯

৭৪. *আল কুরআন*, ১২: ৯২

৭৫. *Amili, Muhammad bin Hasan al-Hurr trans, A.H al-, Wasa'ilu sh-Shi'ah. . Beirut: Dar Ihya'i't-, 1391, vol.12,p.136-140*

৭৬. *আাল কুরআন ১২: ৫৫*

৭৭. *আল কুরআন*, ১২: ৭৮

৭৮. *হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)*, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ১২১

৭৯. *আল কুরআন*, ১২: ৭৭

৮০. *শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী র.*, *তাফসিরে উসমানী*, *মাওলানা আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম অনূদিত*, *ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *পৃ. ৪২৫*

৮১. *আল কুরআন*, ১২: ২৪

৮২. *Amili, Ibid, p. 140*

৮৩. *কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র.)*, *তাফসীরে মাযহারী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৪৭৪*

৮৪. *আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর দামেশকী (র.) , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩*

৮৫. *আবূস সা'উদ*, *ইরশাদুল আকলিস সালীম ইলা মাজায়াল কুরআন আল কারীম*, *দারুল মা'রিফাহ*, *বৈরুত*, *২০০৭*, *৩য় খণ্ড*, *পৃ.৩৭৯*

৮৬. *হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)*, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬৬ ও ১৩০*

৮৭. *আল কুরআন*, ১২: ২৩

৮৮. *অধ্যাপক এ. টি. এম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৫৩*

৮৯. *আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর দামেশকী (র.)*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৪৫৮*

৯০. *আল কুরআন*, ১২: ১০৮

৯১. *অধ্যাপক এ. টি. এম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ*, *৫০-৫১*

৯২. *আল কুরআন*, ১২: ৩৬

৯৩. *কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র.)*, *তাফসীরে মাযহারী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৪৪৩-৪৪৫*

৯৪. *ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র.)*, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৩৫৪-৩৫৮*

৯৫. *মীর*, *মুনতাসির , দি কু'রআনিক স্টোরি অফ জোসেফ : প্লট*, *থিমস এন্ড ক্যারেক্টার*, *১৯৮৬ এল এক্স এক্স ভি এল নং-১*, *পৃ. ১১*

৯৬. *Yakan, Fathi, Islamic movement problems and perspective, America: American Trust Publication, 1984, p.83*

৯৭. *কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র.)*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৪৭৭*

৯৮. *Rida, Muhammad Rashid Rida trans, Tafsir Nur –Ul-Thaqalayn, Cairo: Maktabatal-Qahira. vol.5, 1990, p. 95*

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

হযরত ফাতিমা (রা.) এর কাব্যচর্চা : একটি বিশ্লেষণ

আব্দুল্লাহ যোবায়ের*

Abstract : The Islamic perspective on poetry primarily depends on its type. Islam encourages virtuous and noble poetry and discourages lewd and defamatory poetry. Prophet Muhammad (SM) himself listened to certain poet's of poems. He also used the poetic talents to his companions as a weapon for cultural war against the offensive poetry of the disbelievers. The Prophet (SM) was not a poet himself, nor was poetry suitable for him. Among his chil, only Fatima (RA) is known to have recited some poems. Her profound understanding of life and her poetic talent are reflected in these poems. The themes of these poems include the reality of worldly life, the contemporary condition, love for the Prophet, and so on. These poems are invaluable in understanding the position of the Prophet's hourehold (Ahlul Bayt) and their perspectives. Many poems are attributed to Fatima (RA). Some of them were falsely attributed to her. This article verification the poems of Fatima (RA) based on primary sources. It also makes an approach to provide an analysis and identify those poems which, despite being attributed to her, were not actually her work.
Keywords: Fatima, poetry, Islam.

সার-সংক্ষেপ : কবিতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যের ধরনের উপর নির্ভর করে। বিশুদ্ধ ও মার্জিত কবিতাকে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। অপরদিকে অশালীন ও কুৎসামূলক কবিতা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কোনো কোনো কবির কবিতা শুনেছেন। কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার মোকাবেলায় সাহাবীদের কাব্যশক্তিকে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি নিজে কবি ছিলেন না। কবিত্ব তাঁর জন্য সমীচিনও ছিল না। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেবল ফাতিমা (রা.) এর কিছু কবিতার কথা জানা যায়। সে সব কবিতায় ফাতিমা (রা.) এর গভীর জীবনবোধ ও কাব্যপ্রতিভার পরিচয় মেলে। পার্থিব জীবন, সমকালীন পরিবেশ, নবীপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে নবী-পরিবার তথা আহলুল বায়তের অবস্থান জানার ক্ষেত্রে এসব কবিতা অমূল্য। অনেক কবিতা ফাতিমা (রা.) এর নিজের রচনা না হওয়ার পরেও তাঁর দিকে আরোপ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে ফাতিমা (রা.) এর কবিতাগুলো প্রাথমিক উৎসগুলোর আলোকে যাচাই-বাছাই করে প্রসঙ্গ নির্দেশ পূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং যে সব কবিতা তাঁর নামে প্রচলিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর নয়, সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।
মূলশব্দ: ফাতিমা, কবিতা, ইসলাম।

---

* লেখক প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

হযরত ফাতিমা (রা.) পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনধারা, তাঁর কর্মপন্থা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শত কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং এখনও করছে। ধর্মীয়ভাবেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তিনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়তম কন্যা, চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) এর স্ত্রী, জান্নাতের যুবকদের সর্দার হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) এর মাতা এবং জান্নাতের সমস্ত নারীদের নেত্রী। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন। তাঁর ওফাতে তিনি অত্যন্ত শোকাতুর ও বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে তিনি কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাগুলোতে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালে তাঁর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও কিছু কবিতা তিনি তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও সমকালীন পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে তাঁর কবিতাগুলো বিশ্লেষণের কোনো বিকল্প নেই।

ফাতিমা (রা.) কে নিয়ে শিয়া ও সুন্নি উভয় ধারায় প্রচুর গবেষণা হয়েছে। তাঁর জীবনীগ্রন্থের সংখ্যাও অগণিত। এসব গ্রন্থে তাঁর বহু কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অনেক কবিতা তাঁর নিজের রচনা হলেও এমন বহু কবিতা আছে, যা তাঁর নামে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। অথচ তা আদৌ তাঁর রচনা নয়। তা হয়তো পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী যুগের অন্য কারও রচনা। এছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সনদ না থাকায় তাঁর সাথে এসব কবিতার সম্পৃক্ততা প্রমাণ করাও অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রবন্ধে তাঁর নামে প্রচলিত কবিতাগুলো যাচাইবাছাই করে যেসব কবিতা প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত, সেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসাথে তাঁর নামে প্রচলিত অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁর নয়, এমন কবিতাগুলো বানোয়াট প্রমাণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনায় প্রধানত পর্যালোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ফাতিমা (রা.) এর কবিতা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলাদাভাবে কোনো গ্রন্থ কিংবা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হয়নি। তবে সাহাবীদের কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে ফাতিমা (রা.) এর কাব্যচর্চার কথা এসেছে এবং তাঁর কাব্যগুলোর মধ্যে শুধু শোকগাঁথামূলক কাব্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ড. আব্দুল জলীলের কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসুল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব। কিন্তু কবিতাগুলোর বিশ্লেষণ ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা হয়নি। ফাতিমা (রা.) এর কাব্যগুলোর সংকলন নিয়ে ২০০০ সালে দিওয়ানু ফাতিমা নামে মুহাম্মদ আব্দুর রহিম তা সংকলন করে প্রকাশ করেন। তবে দামেস্কের দারু কুতাইবা থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থে ফাতিমা (রা.) এর নামে প্রচলিত সকল কবিতা যাচাই-বাছাই ছাড়াই তুলে ধরা হয়েছে। সেখানেও কোনো বিশুদ্ধতা বিচার কিংবা সূত্র বিশ্লেষণ করা হয়নি। এছাড়া বৈরুতের মুয়াসসাসাতুল বাসাহ থেকে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'ফাতিমা আয যাহরা আলাইহাস সালাম ফি দিওয়ানিশ শি'রিল আরাবি'। সেখানে মোট ১৮ টি কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো বেশিরভাগই বিহারুল আনওয়ারসহ বিভিন্ন শিয়া সূত্র থেকে প্রাপ্ত কবিতা। সেখানেও কবিতাগুলোর বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়নি। ইরাকের নাজাফের আল জামেয়াতুল ইসলামিয়্যাহ'র সহযোগী অধ্যাপক আদিল লুআইবি সালমান রাবিঈ '*তাওসিকু শিরি ফাতিমা আয যাহরা আলাইহাস সালাম*' নামে একটি প্রবন্ধে শিয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু সূত্রবিচার করেছেন। কিন্তু সুন্নি লেখকদের লিখিত গ্রন্থাবলির আলোকে ফাতিমা (রা.) এর

কবিতাসমূহের বিশুদ্ধতা বিচারমূলক কোনো গবেষণা ইতোপূর্বে হয়নি। ফাতিমা (রা.) এর নিজের রচিত কবিতা ঠিক কোনগুলো? অন্য কবিতাগুলো কেন তাঁর কবিতা নয়? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

ফাতিমা (রা.): সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

হযরত ফাতিমা (রা.) মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কনিষ্ঠ কন্যা। তিনি মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওহীলাভের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কুরায়শরা কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ করছিলো।[১] ফাতিমা (রা.) এর শৈশব ও কৈশোর মক্কায় কেটেছিল। মহানবী (সা.) এর উপর কাফিরদের জুলুম-নির্যাতনের মুখে তিনি সবসময় সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন।

ফাতিমা (রা.) এর উপনাম উম্মু আবিহা (তাঁর পিতার মা)। তাঁর উপাধি আল বাতুল, আয যাহরা, সায়্যিদাতু নিসাইল আলামিন ইত্যাদি। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করার কয়েকদিন পর তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। বদর মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা.) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে হাসান, হুসাইন, মুহসিন, উম্মু কুলসুম ও যয়নব (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।[২] রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারা তাঁর মাধ্যমেই প্রবাহিত হয়েছে।[৩] এ কারণ ছাড়াও ফাতিমা (রা.) নানাভাবে বিরাট মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন নারীর একজন তিনি। তিনি জান্নাতি নারীদেরও নেত্রী। তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা সবই ছিল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আয়েশা (রা.) বলেছেন,

أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

'ফাতিমা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটার ভঙ্গির মতো হাঁটতে হাঁটতে আসলেন।'[৪]

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা (রা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সফর থেকে ফিরলে ফাতিমা (রা.) এর সাথে দেখা করে তাঁকে চুমু দিতেন।[৫] তিনি বলেছেন,

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

'ফাতিমা আমার অংশ। যে ফাতিমাকে রাগান্বিত করবে, সে আমাকেও রাগান্বিত করবে।'[৬]

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে ফাতিমা (রা.) সর্বপ্রথম পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি ২৯ বছর বয়সে ১১ হিজরির ৩ রমজান ইন্তিকাল করেন। আলী (রা.) মতান্তরে আব্বাস (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। এরপর তাঁর অসিয়্যত অনুযায়ী রাতের বেলা তাঁকে দাফন করা হয়।[৭]

---

১. উমর রিদা কাহহালা, *আলামুন নিসা*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত ২০১১, খ. ৪, পৃ. ১০৮।
২. শামসুদ্দিন আয যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, মুয়াসসাতুর রিসালা, বৈরুত ১৯৮২, খ. ২, পৃ. ১১৯।
৩. ইবনুল আসির, *উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা*, দারু ইবনি হাযম, বৈরুত ২০১৪, পৃ. ১৫৬৪।
৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *আল জামেউস সাহিহ*, দারু ইবনি কাসির, বৈরুত ২০০২, পৃ. ৮৯১, হাদিস নং: ৩৬২৩।
৫. ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬৪।
৬. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১৫, হাদিস নং: ৩৭১৪।
৭. ইবনুল আসির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬৬।

ফাতিমা (রা.) এর কাব্যচর্চা: বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু

হযরত ফাতিমা (রা.) কোনো পেশাদার কবি ছিলেন না, কাব্য রচনা করা তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্যও ছিল না। এরপরও কিছু প্রেক্ষাপটে তিনি কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন। বিশেষত যখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়েছেন, তীব্র দুঃখ বোধ করেছেন, তখন সংক্ষেপে তাঁর মনোভাব প্রকাশের জন্য গভীর অর্থবোধক কোনো কবিতা রচনা করেছেন। কারণ স্বাভাবিক কথায় গভীর আবেগ বোঝানো দুষ্কর। এসব কবিতায় তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় মেলে। এই প্রবন্ধে আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করেছি, ফাতিমা (রা.) খুযায়া গোত্রের এক নারীর অনুকরণে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এতে বুঝা যায়, সমকালীন কাব্যচর্চা সম্পর্কেও তাঁর পরিষ্কার জানাশোনা ছিল।

ফাতিমা (রা.) এর কাব্যের ভাষা সহজ-সরল কিন্তু এর মর্মার্থ অত্যন্ত গভীর। কবিতায় ক্ষেত্রবিশেষে তিনি বিভিন্ন রূপক বাক্য ব্যবহার করেছেন, স্বার্থক উপমারও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। পিতাকে হারানোকে তিনি মাটির আদ্রতা হারানোর সাথে তুলনা দিয়েছেন। বলেছেন,

إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الأَرْضِ وابِلَها

শুস্ক ভূমি যেভাবে আদ্রতা হারিয়ে কাঁদে আমরাও আপনাকে সেভাবে হারিয়েছি।

আবার তাঁর ব্যক্তিগত বিষাদ ও বেদনাকে প্রকৃতি বেদনাহত রূপ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন,

اَغْبَرَّ آفَاقُ السَّمَاءِ وَكُوِّرَتْ شَمْسُ النَّهَارِ وأُظْلَمَ العَصْرَانِ
فَالأَرْضُ مِن بعدِ النبيِّ كَئِيْبَةٌ أَسَفاً عليهِ كَثِيْرَةُ الرجفانِ

'দিগন্ত ধূলোমলিন, দিনের সূর্য বিবর্ণ আর দিন-রাত সবই হয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন
নবীর বিদায়ে পৃথিবী গভীর বিষাদে ভারাক্রান্ত, তাঁর দুঃখে প্রবলভাবে কম্পমান।'[৮]

ফাতিমা (রা.)-এর বেশিরভাগ কবিতা তাঁর মহান পিতার জন্য শোকগাঁথা নিয়ে। কবিতা ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যেও এ বিষয়টি স্পষ্ট। যখন সাহাবীগণ রওজা শরীফে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন সম্পন্ন করেন, তীব্র বেদনা নিয়ে তিনি আনাস (রা.)-কে বলেছিলেন,

يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ؟

'আনাস। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মাটি ঢালতে তোমাদের ভালো লাগলো?'[৯]

ফাতিমা (রা.) এর সিংহভাগ কবিতার বিষয়বস্তু মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পরবর্তী তাঁর ও দুনিয়ার অবস্থা নিয়ে। এছাড়া দুটি কবিতায় তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা প্রকাশ পেয়েছে।

ফাতিমা (রা.) এর নামে প্রচলিত কবিতাসমূহের শ্রেণিবিভাগ

ফাতিমা (রা.) এর নামে প্রচলিত সমস্ত কবিতাকে নিম্নোক্ত কয়েকভাবে ভাগ করা যায়:

১. বিশুদ্ধভাবে ফাতিমা (রা.) এর রচনা বলে প্রমাণিত।
২. সনদবিহীনভাবে ফাতিমা (রা.) এর প্রতি নিসবতকৃত।
৩. ফাতিমা (রা.) এর প্রতি নিসবত করা হলেও অন্য কারও কবিতা বলে প্রমাণিত।

---

৮. আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন আলী হুসরী আল কায়রাওয়ানি, *যাহরুল আদাব ওয়া সামারুল আলবাব*, দারুল জিল, বৈরুত তাবি, খ. ১, পৃ. ৭০।

৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯২, হাদিস নং: ৪৪৬২।

৪. ফাতিমা (রা.) এর নামে রচিত বানোয়াট কবিতা।

প্রথম প্রকারের কবিতাগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি। দ্বিতীয় প্রকারের কবিতাগুলো আসলেই ফাতিমা (রা.) এর কি না, তার সম্ভাব্যতা যাচাই করেছি। তৃতীয় প্রকারের কবিতাগুলো আসলে কার লেখা সেটা উদঘাটন করেছি। চতুর্থ প্রকারের কবিতাগুলোও চিহ্নিত করেছি।

ফাতিমা (রা.) এর কবিতাসমূহ

ফাতিমা (রা.) এর যেসব কবিতার নিসবত আমাদের কাছে প্রাথমিক উৎসের বিভিন্ন গ্রন্থ ও সনদের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোকে বিষয়বস্তুর আলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
ক. মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য শোকগাঁথা;
খ. হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) এর উদ্দেশে রচিত কবিতা।

ক. মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য রচিত শোকগাঁথা

ফাতিমা (রা.) এর জীবনে সবচেয়ে শোকের মুহূর্ত ছিল মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত। তাঁর ওফাতের পরে ফাতিমা (রা.) কে কেউ সামান্যতম হাসতে দেখেননি। এজন্য জীবনী গ্রন্থাবলি যাচাই করলে দেখা যায়, ফাতিমা (রা.) এর বেশিরভাগ কবিতা তাঁর মহান পিতা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোকগাঁথায় রচিত। যেসব কবিতা তাঁর দিকে সম্বন্ধিত করার ব্যাপারে আলিমগণ একমত হয়েছেন, সেগুলো নিম্নরূপ:

(১)

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেছেন, আমরা যখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফনের কাজ শেষ করলাম, ফাতিমা (রা.) আমার কাছে আসলেন। বললেন, 'আনাস। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় মাটি দিতে তোমাদের ভালো লাগলো?' এরপর তিনি কেঁদে ফেললেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন:

يا أَبتاه أَجابَ ربّاً دعاه   يا أَبتاه مَن ربّه ما أُدناهُ

يا أَبتاهُ إِلى جبريل ننعاهُ   يا أَبتاهُ إِلى جنّة الفردوسِ مأْواهُ

'হায় আব্বা! আপনি রবের ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বা! আপনি আপনার রবের কত নিটকবর্তী হলেন। হায় আব্বা! জিবরাঈলের কাছেও [আপনার ইন্তিকালের] শোকবার্তা জানাই। হায় আব্বা! জান্নাতুল ফিরদাউস আপনার অবস্থানস্থল'।[১০]

আল মুনসারিহ (المنسرح) ছন্দে রচিত দু'টি পঙতির এই কবিতাটি সন্দেহাতীতভাবে ও বিশুদ্ধভাবে হযরত ফাতিমা (রা.) থেকে প্রমাণিত। ইমাম বুখারি[১১] ও ইমাম ইবন মাজাহ[১২] স্ব স্ব সনদে এটি শাব্দিক কিছু ভিন্নতাসহ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অসংখ্য গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে।

(২)

আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন আলী হুসরী আল কায়রাওয়ানি (মৃ. ৪১৩ হি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন শেষে আনসার-মুহাজিররা যার যার ঘরে ফিরে গেলেন। ফাতিমা (রা.) নিজ ঘরে আসলেন। অন্য নারীরা তাঁর কাছে সমবেত হলো। তখন তিনি আবৃত্তি করলেন,

---

১০. আল ফাকিহ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আবদি রাব্বিহি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১৯৪।

১১. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯২, হাদিস নং: ৪৪৬২।

১২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, *আস সুনান*, দারুত তাসিল, কায়রো ২০১৪, খ. ২, পৃ. ২০৭, হাদিস নং: ১৬|১৩

اَغْبَرَّ آفَاقُ السَّمَاءِ وَكُوِّرَتْ شَمْسُ النَّهَارِ وأَظْلَمَ العَصْرَانِ
فَالأَرْضُ مِن بعدِ النبيّ كَئِيْبَةٌ أَسَفاً عليهِ كَثِيْرَةُ الرجفانِ
فَلْيبكهِ شَرْقُ البلادِ وغَربُها وَلْيَبكهِ مُضرٌ وكلّ يَماني
وَلْيبكهِ الطَّوْدُ المعظّمُ جوّهُ وَالبيتُ ذو الأستارِ والأركانِ
يا خاتمَ الرّسلِ المبارك ضوؤه صلّى عليكَ منزّلُ الفرقانِ

'দিগন্ত ধূলোমলিন, দিনের সূর্য বিবর্ণ' আর দিন-রাত সবই হয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন নবীর বিদায়ে পৃথিবী গভীর বিষাদে ভারাক্রান্ত, তাঁর দুঃখে প্রবলভাবে কম্পমান।

তাঁর জন্য পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত দেশ কাঁদুক, সমস্ত ইয়ামানবাসী আর মুদার গোত্র কাঁদুক।

সুউচ্চ শিখরের পর্বতমালা আর গিলাফ ও স্তম্ভওয়ালা ঘরও তাঁর জন্য কাঁদুক।

হে সর্বশেষ রাসুল! আপনার আলো বরকতময়, আপনার উপর দরুদ পড়েন স্বয়ং তিনি-যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন'।[১৩]

আল কামিল (الكامل) ছন্দে রচিত ৬ টি পঙতির এ কবিতাটি আমাদের অনুসন্ধান মতে সর্বপ্রথম আলী হুসরী আল কায়রাওয়ানি (মৃ. ৪৮৮ হি.) উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে ইবনু সায়্যিদিন নাস[১৪]এবং তাঁর সূত্রে ইমাম সুয়ূতি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শেষে ফুরকান শব্দের বদলে 'কুরআন' শব্দ উল্লেখ করেছেন।[১৫] এছাড়া এ কবিতাটি আব্দুর রউফ মানাভি,[১৬] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ,[১৭] উমর রিদা কাহহালা[১৮]সহ পূর্বাপরের অনেক জীবনীকার ও ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতে সাহাবীগণ প্রত্যেকে যে প্রবল বিষণ্নতায় তাড়িত হয়েছিলেন, তার স্বার্থক প্রকাশ এই কবিতার লাইনগুলোতে ফুটে উঠেছে। আলোকোজ্জ্বল দিনও তাঁর প্রস্থানে সবার কাছে অন্ধকারময় লাগছিল। তাঁর পবিত্র উপস্থিতির অভাব সবাই অনুভব করতে পারছিলেন। যেমন আনাস (রা.) বলেছেন,

لَمَّاكَانَالْيَوْمُالَّذِيدَخَلَفِيهِرَسُولُاللَّهِصلىاللهعليهوسلمالْمَدِينَةَأَضَاءَمِنْهَاكُلُّشَيْءٍفَلَمَّاكَانَالْيَوْمُالَّذِيمَاتَفِيهِأَظْلَمَمِنْهَاكُلُّشَيْءٍ

যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসেছিলেন, সেখানকার প্রতিটি জিনিস আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তারপর যে দিন তিনি ইন্তিকাল করলেন, সেখানকার প্রত্যেকটি বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।'[১৯] ফাতিমা (রা.) এর কবিতায় এ বিষয়টি স্বার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

---

১৩. আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন আলী হুসরী আল কায়রাওয়ানি, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৭০।

১৪. ইবনু সায়্যিদিন নাস, *উয়ুনুল আসারি ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামাইলি ওয়াস সিয়ার*, দারু ইবনি কাসির, বৈরুত তাবি, খ. ২, পৃ. ৪৫১; উমর রিদা কাহহালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১১৩।

১৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, *আস সুগুরুল বাসিমাতি ফি মানাকিবিস সায়্যিদাতিল ফাতিমা*, দায়েরাতুশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, দুবাই ২০১১, পৃ. ৮৫।

১৬. আব্দুর রউফ মানাভি, *সায়্যিদাতু নিসাই আহলিল জান্নাহ ফাতিমাতুয যাহরা আও ইত্তিহাফুস সাইল বিমা লি ফাতিমাতা মিনাল মানাকিব*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০২, পৃ. ৫৮-৫৯।

১৭. সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ, *আর রিছা ফিশ শিরিল আরাবি*, দারুর রাতিব আল জামিইয়্যাহ, বৈরুত তাবি, পৃ. ১৩।

১৮. উমর রিদা কাহহালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ.১১৩।

১৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২০৭, হাদিস নং: ১৬১৩।

(৩)

ফাতিমা (রা.) এর কবিতার দুটি লাইন আল ইকদুল ফরিদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

إِنَّا فَقَدْنَاكَ فَقْدَ الأَرْضِ وَابِلَهَا وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتبُ

فَلَيت قبلكَ كانَ الموتُ صادفنا لما نُعِيَتْ وَحالتْ دونك الكُثُبُ

'মাটি যেভাবে তীব্র বৃষ্টিপাতকে হারিয়ে ফেলে, আমরাও তেমনি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি।

আপনি বিদায় নেয়ার পর থেকে ওয়াহি আর কিতাবও বিদায় নিয়েছে।

যদি আপনার আগেই আমাদের মৃত্যু হতো-

আর বিলাপ হতো না, আর আপনার সামনে আড়াল হতো বালুর স্তুপ'।[২০]

এই পঙতির প্রথম লাইনের শেষ শব্দ الكُثُبُ কে অনেক গ্রন্থে كتب লেখা হয়েছে, যা কোনো বোধগম্য অর্থ দেয় না। كثيب শব্দের বহুবচন الكُثُبُ। এর অর্থ বালুর স্তুপ, বালুর টিলা, উঁই-ঢিবি ইত্যাদি। কাউকে দাফন করা হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বালু অথবা মাটির আড়ালে চলে যান। এদিক থেকে الكُثُبُ হওয়াটা যুক্তিযুক্ত। এ কবিতার ব্যাখ্যায় জাবি যাদাহ আলি ফাহমি এটি ব্যাখ্যা করেছেন।[২১]

এছাড়া মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত ফাতিমা (রা.) এর জন্য বিরাট বড় মুসিবত ছিল। এজন্য দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি যেমন মুসিবতের আগে মৃত্যু কামনা করে, তিনিও করেছিলেন। لما نُعِيَتْ অর্থাৎ আর বিলাপ হতো না- এই কথায় ফাতিমা (রা.) এর ভেতর মারইয়াম (আ.) এর মতো মৃত্যুবরণ ও বিস্মৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি বলেছিলেন,

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا

'এরপর প্রসব-বেদনা তাকে খেজুর গাছের কান্ডের কাছে নিয়ে এলো। সে বলল, 'হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং পুরোপুরি বিস্মৃত হতাম'![২২]

(৪)

তাহির ইবন ইয়াহইয়া আল আলাবি, ইবনুল জাওযি প্রমুখ আলী (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করার পর ফাতিমা (রা.) তাঁর কবরের কাছে এসে দাঁড়ান। এরপর কবরের এক মুঠি মাটি নিয়ে তিনি আবৃত্তি করেন,

مَاذَا عَلَىٰ مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ أَلَّا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الأَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيَا

'যে আহমাদের কবরের মাটির ঘ্রাণ নিয়েছে, সারা জীবনে তার আর কোনো সুগন্ধীর ঘ্রাণ নেয়ার প্রয়োজন নেই। আমার উপর এমন সব বিপদ আপতিত হয়েছে- যা দিনের উপর পড়লে তাও রাত হয়ে যেতো।'[২৩]

---

২০. আল ফাকিহ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আবদি রাব্বিহি, *প্রাগুক্ত*, খ ৩, পৃ ১৯৪।

২১. জাবি যাদাহ আলি ফাহমি, *হুসনুস সাহাবা ফি শারহি আশআরিস সাহাবা*, মাতবাআ সে, বসনিয়া-হার্জগোভিনা ১৩২৪ হি., খ. ১, পৃ. ১২৭।

২২. আল কুরআনুল কারিম, ১৯:২৩।

ইবন সায়্যিদিন নাস,[২৪] মানাভি প্রমুখ এ লাইন দুটিকে হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত ফাতিমা (রা.) এর বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য শামসুদ্দিন আয যাহাবি ফাতিমা (রা.) এর সাথে এ কবিতা সম্পৃক্ত করা বিশুদ্ধ নয় বলে মত দিয়েছেন।[২৫]

অন্যান্য গ্রন্থে এই ২টি পঙতিসহ মোট ৭ টি পঙতি একসাথে পাওয়া যায়:

قُل للمغيّب تحتَ أَطباقِ الثّرى   إِن كنتَ تسمعُ صَرخَتي وَنِدائِيا
صُبَّتْعَلَيَّمَصَائِبُلَوْأَنَّهَا   صُبَّتْعَلَىالأَيَّامِعُدْنَلَيَالِيَا
قَد كنتُ ذاتَ حِمى بظلِّ محمّدٍ   لا أَخشَ مِن ضيمٍ وكان جماليا
فَاليومَ أَخشعُ لِلذليلِ وأَتّقي   ضَيمي وَأَدفع ظالِمي بِرِدائيا
فَإِذا بَكَت قمريّة في ليلها   شَجناً عَلى غصنٍ بكيتُ صباحِيا
فَلأجعلنّ الحزنَ بَعدكَ مُؤنسي   وَلأجعلنّ الدمعَ فيكَ وِشاحيا
مَاذَاعَلَىمَنْشَمَّتُرْبَةَأَحْمَدَ   أَلَايَشُمُّمَدَىالزَّمَانِغَوَالِيَا

'মাটির ভেতর অদৃশ্য হয়ে থাকা তাঁকে বলো- আপনি যদি আমার আর্তনাদ আর ডাক শোনেন;

আমার উপর এমন সব বিপদ আপতিত হয়েছে- যা দিনের উপর পড়লে তাও রাত হয়ে যেতো।

মুহাম্মদের ছায়ায় আমি ছিলাম নিরাপত্তা-বেষ্টিত তাই কোনো জুলুমকে ভয় পেতাম না। তিনিই ছিলেন আমার সৌন্দর্য।

কিন্তু আজ হীনের কাছেও নত হই, জুলুম এড়িয়ে চলি আর জালিমকে প্রতিরোধ করি আমার চাদর দিয়ে।

বুলবুলি যেখানে বৃক্ষশাখায় দুঃখ ভরে ডাকে, আমিও কাঁদি ভোরবেলায়।

আপনার বিদায়ের পর শোককে আমার সঙ্গী বানাবো আর আপনার জন্য অশ্রু হবে আমার অলঙ্কার।

যে আহমাদের কবরের মাটির ঘ্রাণ নিয়েছে, সারা জীবনে তার আর কোনো সুগন্ধীর ঘ্রাণ নেয়ার প্রয়োজন নেই।[২৬]

(৫)

ইবন সায়্যিদিন নাস উল্লেখ করেছেন, ফাতিমা বিনত আহজামের অনুকরণে ফাতিমা (রা.) নিম্নের শোকগাঁথা আবৃত্তি করেছিলেন:

قَدْ كُنْتَ لِي جَبَلا أَلُوذُ بِظِلِّهِ   فَتَرَكْتَنِي أَمْشِي بِأَجْرَدِ ضَاحِ
قَدْ كُنْتَ ذَاتَ حَمِيَّةٍ مَا عِشْتَ لِي   أَمْشِي الْبراز وَكُنْتَ أَنْتَ جَنَاحِي

---

২৩. আব্দুর রউফ মানাভি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

২৪. ইবনু সায়্যিদিন নাস, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৫১।

২৫. শামসুদ্দিন আয যাহাবি, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৩৪।

২৬. মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আস সালিহি আশ শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়া রাশাদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১২, খ. ১২, পৃ. ২৮৯।

فاليوم أخضع للذليل وَأَتَّقِي مِنْهُ وَأَدْفُعُ ظَالِمِي بِالرَّاحِ

وَإِذَا دَعَتْ قُمَرِيَّةٌ شَجَنًا لَهَا لَيْلا عَلَى فَنٍ دَعَوْتُ صَبَاحِي

'আপনি ছিলেন আমার জন্য এক পর্বত, যার ছায়ায় আমি আশ্রয় নিতাম। এখন আমাকে [সূর্যের সামনে] উন্মুক্ত এমন বিরান প্রান্তরে ছেড়ে গেলেন, যেখানে আমাকে চলতে হচ্ছে।

আপনি আমার শক্তির উৎস ছিলেন- যতদিন বেঁচে ছিলেন। তৃণহীন প্রান্তরে আমি চলতাম আর আপনি ছিলেন আমার ডানা।[২৭]

কিন্তু আজ হীনের কাছেও নত হই, জুলুম এড়িয়ে চলি আর জালিমকে প্রতিরোধ করি আমার হাত দিয়ে।[২৮]

রাতের বেলা ডালে বসে বুলবুলি যখন দুঃখভরে ডাকে, আমিও প্রভাতকে ডাকি।'[২৯]

ফাতিমা বিনত আহজাম ইবন দানদানাহ খুযাআ গোত্রের একজন কবি ছিলেন। তাঁর স্বামীর ইন্তিকালে তিনি একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। উমর রিদা কাহহালা তাঁর কবিতাটি উল্লেখ করেছেন, যার সাথে ফাতিমা (রা.) এর আবৃত্তি করা কবিতার স্পষ্ট মিল রয়েছে:

يا عين بكي عند كل صباح جودي بأربعة على الجراح

قد كنت لي جبلاً ألوذ بظله فتركتني أمشي بأجرد ضاح

قد كنت ذات حمية ٍما عشت لي أمشي البراز وكنت أنت جناحي

فاليوم أخضع للذليل وأتقي منه وأدفع ظالمي بالراح

وأغض من بصري وأعلم أنه قد بان حد فوارسي ورماحي

وإذا دعت قمرية شجناً لها يوماً على فنٍ دعوت صباحي

'হে চোখ, প্রতিটি সকালে কাঁদো আর জখমের জন্য অশ্রু ফেলো অঝোর ধারায়।

আমার জন্য তুমি ছিলে পাহাড়ের মতো, যার ছায়ায় আমি আশ্রয় নিতাম, এখন তুমি আমাকে এমন পথে রেখে গেলে, যেখানে চলতে হচ্ছে খোলা প্রান্তরে।

আপনি আমার শক্তির উৎস ছিলেন- যতদিন বেঁচে ছিলেন। তৃণহীন প্রান্তরে আমি চলতাম আর আপনি ছিলেন আমার ডানা।

কিন্তু আজ আমি হীনের কাছেও নত হই এবং জুলুম এড়িয়ে চলি আর জালিমকে প্রতিরোধ করি আমার হাত দিয়ে।

আমি চোখ নত করি আর বুঝি- আমার বীরত্ব আর বর্শার ধার কমে গেছে।

রাতের বেলা ডালে বসে বুলবুলি যখন দুঃখভরে ডাকে, আমিও প্রভাতকে ডাকি'।[৩০]

---

২৭. অর্থাৎ আপনার ডানায় আমি আশ্রয় পেতাম। আপনিই আমার শক্তি ছিলেন। আপনি যতদিন ছিলেন, উন্মুক্ত বিরান প্রান্তরেও আমি নির্ভয়ে একাকী পথ চলতে পেরেছি। আপনি আমার শক্তি হওয়ায় কাউকেই ভয় পেতাম না।

২৮. অর্থাৎ আজ আমি এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, এমনকি হীন ব্যক্তিরাও আমাকে আক্রমণ করতে আসলে আমার হাত ছাড়া অন্য কোনোভাবে মোকাবেলা করতে পারছি না, অস্ত্রধারন করতে পারছি না।

২৯. ইবনু সায়্যিদিন নাস, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪৫১; এখানে প্রভাতকে ডাকার অর্থ- 'হায় সকাল!' বলা।

৩০. উমর রিদা কাহহালা, *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ. ২৬।

মহানবী (সা.) এর ওফাতে আয়েশা (রা.) এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন বলেও বর্ণনা রয়েছে।[৩১] আবার জাফর তাইয়ার (রা.) এর ইন্তিকালে আসমা বিনত উমায়স (রা.) এ কবিতা আবৃত্তি করেছেন।[৩২]এতে বুঝা যায়, কবিতাটি সে সময়ে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল এবং বিয়োগব্যাথা অথবা বড় কোনো দুর্যোগে এটি পড়ার রেওয়াজ ছিল। তাই ফাতিমা (রা.) এর এই কবিতা পাঠ করার সম্ভাবনা রয়েছে। ইবনু সায়্যিদিন নাস ছাড়াও ইবন দাউদআল ইসবাহানি,[৩৩] বাহাউদ্দিন ইরবিলি[৩৪] প্রমুখ এই কবিতাটির কিছু অংশ ফাতিমা (রা.) আবৃত্তি করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

খ. হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) এর উদ্দেশে রচিত কবিতা

(১) ফাতিমা (রা.) কখনও কখনও হযরত হাসান (রা.)-কে দোলাতেন। তখন তিনি আবৃত্তি করতেন:

وابأبي شبهُ النبي غير شبيهٍ بِعَلي

'কসম! আমার ছেলের মিল আছে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে, আলীর সাথে নয়।'[৩৫]

(২) উপরোক্ত কবিতার কাছাকাছি শব্দে তিনি আরও আবৃত্তি করেছেন,

إنبنيشبهالنبي ليسشبيهبعلي

'আমার ছেলের মিল মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে, আলির সাথে নয়।'[৩৬] উমর রিদা কাহহালার মতে হুসাইন (রা.) কে দোল দেওয়ার সময় ফাতিমা (রা.) এই কবিতা পড়েছেন।[৩৭]

কিন্তু এ কবিতাটি আসলে ফাতিমা (রা.) এর নাকি আবু বকর (রা.) এর তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। যেমন ইবন আবি মুলাইয়া উশবা ইবন হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার আবু বকর (রা.) আসরের নামাজ পড়ে বের হয়ে হাঁটছিলেন। তাঁর সাথে আলী (রা.) ও ছিলেন। তিনি দেখলেন, হাসান (রা.) অন্য শিশুদের সাথে খেলছেন। তিনি তখন তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। বললেন, وَابِأَبِي شِبْهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ -'কসম! আমার পিতা কুরবান হোক। এ তো নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সদৃশ, আলীর সদৃশ নয়।'[৩৮]

---

৩১. আত তিজানি সাঈদ মাহমুদ, *আত তামাসসুলু বিশ শিরি*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১৩, পৃ. ৩৭।

৩২. ইউসুফ ইবনুয যাকি আব্দুর রহমান আবুল হাজ্জাজ আল মিযযি, *তাহযিবুল কামাল*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৮০, খ. ২, পৃ. ২৭৩।

৩৩. আবু বকর মুহাম্মদ ইবন দাউদ আল আসবাহানি, *আয যাহরা*, মাকতাবাতুল মানার, জর্ডান ১৯৮৫, খ. ২, পৃ. ৮৩৮।

৩৪. বাহাউদ্দিন আল মুনশি আল ইরবিলি, *আত তাযকিরাতুল ফাখরিয়্যাহ*, দারুল বাশায়ে, দামেস্ক ২০০৪, পৃ. ২৭।

৩৫. আল ফাকিহ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আবদি রাব্বিহি, *প্রাগুক্ত*, খ ২, পৃ ২৭৪।

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতিমা আয যাহরা আলাইহাস সালাম ফি দিওয়ানিশ শি'রিল আরাবি*, মুয়াসসাসাতুল বাসাহ, বৈরুত ১৯৯৭, পৃ. ২৪।

৩৭. উমর রিদা কাহহালা, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১১৩।

৩৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭৪, হাদিস নং: ৩৫৪২।

ইমাম আহমদ কবিতাটি ফাতিমা (রা.) ও আবু বকর (রা.) এর- উভয় ধরনের বর্ণনা এনেছেন।[৩৯] এ সমস্যার সমাধানে বলা যায়, উভয়েই হয়তো একই কথা বলেছেন অথবা ফাতিমা (রা.) এ কবিতা বলেছেন বলে আবু বকর (রা.) জানতেন। তাই তিনিও তাঁর অনুসরণে বলেছেন। ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (রা.) এমন মতামত দিয়েছেন।[৪০]

ফাতিমা (রা.) এর নামে কথিত কবিতাসমূহ

হযরত ফাতিমা (রা.) এর নামে প্রচলিত কবিতাগুলোর মধ্যে কয়েকটি কবিতার ব্যাপারে বিপরীতমুখী বর্ণনা পাওয়ায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সেগুলো তাঁর নয়। কিছু ক্ষেত্রে জীবনীকারগণ এবং মুহাদ্দিসগণ নিজেরাই সেগুলোর ব্যাপারে পরিষ্কার বলে গেছেন। আবার কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন কোনো কবির একই কবিতা দেখে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সে কবিতা আসলে ফাতিমা (রা.) এর নয়। ফাতিমা (রা.) এর নামে কথিত এমন কিছু কবিতা নিম্নরূপ:

(১)

قَد كانَ بَعدكَ أنباءٌ وهنبثة لَو كنت شاهدها لَم تكثر الخطبُ

إِنّا فَقَدناكَ فَقدَ الأَرضِ وابِلها وَاِختلّ قومكُ فَاِشهدهم ولا تغبُ

فَلَيت قبلكَ كانَ الموتُ صادفنا لما نعيت وَحالت دونك الكثبُ

تجهّمنا رجالٌ فَاِستخفّ بنا مُذ غبت عنّا وكلّ الخيرِ قد غصبوا

'আপনার পরে অনেক জটিল আর ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আপনি যদি এতে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে বাগাড়ম্বর বেশি হতো না।

মাটি যেভাবে তীব্র বৃষ্টিপাতকে হারিয়ে ফেলে, আমরাও তেমনি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। আপনার গোত্র বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। তাদেরকে আপনি দেখুন, চলে যাবেন না।

যদি আপনার আগেই আমাদের মৃত্যু হতো- আর বিলাপ হতো না। আর আপনার সামনে আড়াল হতো বালুর স্তূপ।

আপনি যাবার পর থেকেই লোকেরা আমাদের ভ্রু কোঁচকাচ্ছে আর তুচ্ছ করছে, সব সম্পদ তারা ছিনিয়ে নিল।'

আবু বকর আল জাওহারির মতে, আলী (রা.) এর বাইয়াত নিতে দেরী হওয়ার প্রেক্ষিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মিসতাহ ইবন উসাসা-এর মা[৪১] মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।[৪২] অন্যদিকে ইবন আবি শায়বা এটাকে হযরত সাফিয়্যাহ (রা.) এর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

خَرَجَتْ صَفِيَّةُ وَقَدْ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَلْمَعُ بِثَوْبِهَا يَعْنِي تُشِيرُ بِهِ وَهِيَ تَقُولُ»: قَدْ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَنْبَثَةٌ لَوْ كُنْتَ شَاهِدُهَا لَمْ تُكْثِرِ الْخَطْبَ

৩৯. ইমাম আহমদ ইবনমুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, দারুল হাদিস, কায়রো ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ১৮৪।

৪০. ইবন হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, দারুল মারেফাহ, বৈরুত২০০৭, খ. ৭, পৃ. ৯৬।

৪১. মিসতাহ-এর মায়ের নাম সালমা বিনতে আবি রিহম। তাঁর স্বামীর নাম উসাসা। (আল্লামা মোল্লা আলী কারী, *উমদাতুল কারী*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১, খ.১৩, পৃ ৩২৭।

৪২. আবু বকর আল জাওহারি, *আস সাকিফা ওয়া ফাদাক*, উতবাতুল হুসায়নিয়্যা আল মুকাদ্দাসাহ, ইরাক ২০১১, পৃ. ১০৭।

'মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সাফিয়্যাহ (রা.) বের হলেন। তিনি তাঁর কাপড় নাড়াচ্ছিলেন অর্থাৎ কাপড় দিয়ে ইশারা করছিলেন আর বলছিলেন: 'আপনার পরে অনেক জটিল আর ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আপনি যদি এতে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে বাগাড়ম্বর বেশি হতো না।'[৪৩] তাঁরাও প্রথম দু'লাইন আবৃত্তি করেছেন।

অতএব ইবন মানজুর আফ্রিকি,[৪৪] জাবি যাদাহ আলি ফাহমি[৪৫] প্রমুখ এটিকে ফাতিমা (রা.) এর কবিতা বললেও নিশ্চিতভাবে এটি অন্য কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির রচনা।

(২)

ইবন শাহরাশুব নিম্নোক্ত কবিতাটি ফাতিমা (রা.) এর বলে উল্লেখ করেছেন:

أَشْبِهْ أَبَا كَيَا حَسَن وَاخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَن

وَاعْبُدْ إِلٰهًا ذَا مِنَن وَلَا تُوَالِ ذَا الْإِحَن

'হাসান! তুমি তোমার বাবার মতো হও আর হকের পথ থেকে বাধা দূর করো।

মহা অনুগ্রহশীল ইলাহের ইবাদত করো। কখনও শত্রুভাবাপন্ন কারও সাথে বন্ধুত্ব করো না।'[৪৬]

ইবন শহরাশুবের (মৃ. ৫৮৮ হিজরি) আগে কেউ এই কবিতা উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না। পরবর্তীতে বাসসাম মুহাম্মদ হামামিসহ[৪৭] অনেকেই এই কবিতা উল্লেখ করেছেন। ইবন শাহরাশুব ছাড়া তাঁদেরও এই কবিতা পাওয়ার অন্য কোনো সূত্র থাকার কথা নয়। এটি ফাতিমা (রা.) এর কবিতা হওয়ার আর কোনো প্রমাণ নেই।

(৩)

ইবন শহরাশুব এ কবিতাটি ফাতিমা (রা.) এর বলে উল্লেখ করেছেন:

نَعَت نفسها الدنيا إلينا وَأَسرعت وَنادَت أَلا جدّ الرحيل وَودّعت

'পৃথিবী নিজেকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং দ্রুত সরে যেতে শুরু করেছে। সে ডাক দিয়ে বলছে, 'বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে' এবং বিদায় জানিয়েছে।[৪৮]

ইবন শহরাশুব এ কবিতাটি ফাতিমা (রা.) এর বললেও প্রকৃতপক্ষে এটি আবুল আতাহিয়া এর কবিতা।[৪৯] সম্ভবত এজন্য ইবন শহরাশুবের মানাকিবু আলি আবি তালিব গ্রন্থের নতুন সংস্করণে কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। সেখানে কবিতাটি আর নেই।[৫০]

(৪)

ইবন শহরাশুব আরেকটি কবিতা ফাতিমা (রা.) এর বলে উল্লেখ করেছেন:

---

৪৩. আবু বকর ইবন আবি শায়বা, *আল মুসান্নাফ*, মুয়াসসাসাতু উলুমিল কুরআন, সিরিয়া২০০৬, খ. ২০, পৃ. ৫৬৫-৫৬৬, হাদিস নং: ৩৮১৮৩।

৪৪. ইবন মানজুর আফ্রিকি, *লিসানুল আরব*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত২০০৫, খ. ২, পৃ. ২২৫।

৪৫. জাবি যাদাহ আলি ফাহমি, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২৬।

৪৬. ইবন শহরাশুব, *মানাকিবু আলি আবি তালিব*, আল মাতবাআতুল হায়দারিয়্যাহ, নাজাফ ১৯৫৬, খ. ৩, পৃ. ১৫৯।

৪৭. বাসসাম মুহাম্মদ হামামি, *নিসাউন হাওলার রাসুল*, দারু দানিয়া লিন নাশরি ওয়াত তাওবিখ, দামেস্ক ১৯৯৪, পৃ. ২৮০।

৪৮. ইবন শহরাশুব, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৮।

৪৯. আবুল আতাহিয়া, *দিওয়ানু আবিল আতাহিয়া*, দারু বৈরুত, বৈরুত ১৯৮৬, পৃ. ৮৮

৫০. ইবন শহরাশুব, *মানাকিবু আলি আবি তালিব*, দারুল আদওয়া, বৈরুত ১৯৯১, খ. ১, পৃ. ৩০০

كُنتَ السوادَ لِمُقلتي يَبكي عليك الناظرُ
مَن شاءَ بعدكَ فَليَمُت فَعَليك كنتُ أحاذرُ

'আপনি ছিলেন আমার চোখের মণি, আপনার জন্যই চোখ কাঁদছে।
আপনার পরে যে চায় মারা যাক, আমি শুধু আপনার [মৃত্যু] নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম।'[৫১]

পূর্বের কবিতাটির মতো এ কবিতাও হযরত ফাতিমা (রা.) এর রচিত নয়। কারণ *আল ইকদুল ফারিদ* গ্রন্থে এটিকে অপ্সাতনামা এক বেদুঈন নারীর কবিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এ কবিতাটি সন্তান হারিয়ে রচনা করেছিলেন।[৫২]

(৫)

মুহাম্মদ বাকির মাজলিসি *বিহারুল আনওয়ার* গ্রন্থে ফাতিমা (রা.) এর নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করেছেন,

إذااشتدّشوقيزرتقبركباكياً أنوحوأشكولاأراكمجاوبي
فياساكنالصحراءعلّمتنيالبكاء وذكركأنسانيجميعالمصائب
فإنكنتعنّيفيالترابمغيّباً فماكنتعنقلبيالحزينبغائب

'আমার শোক তীব্র হলে কাঁদতে কাঁদতে তোমার কবর যিয়ারত করি, বিলাপ করি, অনুযোগ করি। কিন্তু তোমাকে সাড়া দিতে দেখি না।
হে মরুবাসী! তুমি আমাকে কান্না শিখিয়েছো। তোমার স্মৃতি আমার সমস্ত বিপদ ভুলিয়ে দিয়েছে।
যদিও তুমি মাটির ভেতর আমার থেকে অদৃশ্য, তবে আমার দুঃখী হৃদয় থেকে কখনোই অনুপস্থিত নও।'[৫৩]

পরবর্তীতে এই কবিতা ফাতিমা (রা.) এর দিওয়ানেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৪] কিন্তু আমাদের অনুসন্ধান অনুসারে এটি ফাতিমা (রা.) এর কবিতা নয়। পূর্বাপরের কোনো বিখ্যাত জীবনীকার এই কবিতা উল্লেখ করেননি। এছাড়া কবিতায় মরুভূমিতে শায়িত একজনের স্মরণে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরিফ মরুভূমিতে নয়। এছাড়া তিনটি পঙতির এই কবিতায় প্রথম পঙতির ছন্দ আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙতির ছন্দ এক নয়। একই কবিতায় দু'ধরনের ছন্দ হওয়া স্বাভাবিক নয়।

(৬)

একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে ফাতিমা (রা.) এর তিনটি কবিতার কথা সালাবি উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হল, একবার হাসান ও হুসাইন (রা.) অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিয়ে তাঁদের দেখতে আসেন। তারা আলী (রা.) কে বলেন, আপনারা যদি কোনো মানত করতেন। তখন আলী ও ফাতিমা (রা.) মানত করলেন, তারা সুস্থ্য হয়ে উঠলে তিন দিন রোজা রাখবেন।

---

৫১. ইবন শহরাশুব, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২০৮; সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতিমা আয যাহরা আলাইহাস সালাম ফি দিওয়ানিশ শিরিল আরবি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
৫২. আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আবদি রাব্বিহি, *প্রাগুক্ত*, খ ৪, পৃ ১০
৫৩. মুহাম্মদ বাকির মাজলিসি, *বিহারুল আনওয়ার*, দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান তাবি, খ. ২২, পৃ. ৫৪৭
৫৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতিমা আয যাহরা আলাইহাস সালাম ফি দিওয়ানিশ শিরিল আরবি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

অবশেষে হাসান ও হুসাইন (রা.) সুস্থ্য হয়ে উঠলে তাঁরা রোযা রাখেন। প্রথম দিন রোযা রাখার পর ঘরে ইফতারির জন্য কিছুই ছিল না। তখন আলী (রা.) ধার করলেন এবং ফাতিমা (রা.) খাবার রান্না করলেন। ইতোমধ্যে একজন ভিক্ষুক এসে খাবার চাইল। তখন আলী (রা.) বললেন,

فاطِمُ ذاتَ المَجدِ وَاليَقينِ   يا بِنتَ خَيرِ الناسِ أَجمَعين

أَما تَرينَ البائِسَ المَسكين   قَد قامَ بِالبابِ لَهُ حَنين

'ফাতিমা। তুমি গৌরব আর দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের কন্যা।

তুমি কি দেখছো না দুঃখী এই মিসকিনকে? সে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার দরজায়।'

এর উত্তরে ফাতিমা (রা.) বললেন,

أمرك يا اِبن عمّ سمعٌ وطاعة   ما بِيَ مِن لؤمٍ وَلا ضَراعة

غُذيت باللبِّ والبَراعَة   أَطعمهُ وَلا أُبالي الساعة

أَرجو إِذا أَشبعتُ ذا مَجاعة   أن أَلحقَ الأَخيارَ وَالجَماعة

وَأَدخلَ الخلدُ وَلي شفاعة

'হে চাচাতো ভাই! আপনার আদেশ শোনা ও মানা আমার কর্তব্য। আমার কোনো কার্পণ্য কিংবা দূর্বলতা নেই।

আমি প্রজ্ঞা আর শ্রেষ্ঠত্বের সাথে বড় হয়েছি, তাকে আমি খাবার দেবো আর এতে এ সময়ের পরোয়া করি না।

আমার আশা একজন ক্ষুধার্তকে খাওয়ালে শ্রেষ্ঠতম মানুষ আর [তাদের] জামাতে আমি মিলিত হবো।

আর চিরস্থায়ী [জান্নাতে] প্রবেশ করবো এবং শাফায়াত করতে পারবো।'

সাআলাবীর বর্ণনানুসারে এভাবে প্রথমদিন তাঁরা খাবার দান করে অভুক্ত থেকে যান। দ্বিতীয় দিনের রোযার ইফতারির সময় আরেকজন ইয়াতিম এসে খাবার চায়। তখনও আলী (রা.) নতুন একটি কবিতা বলেন। তাঁর জবাবে ফাতিমা (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা বলে খাবার দিয়ে দেন:

إِنِّي لأُعطيهِ ولا أُبالي   وأُوثر الله على عيالي

أَمسَوا جِياعاً وَهم أَشبالي   أَصغرهُما يُقتل في القتالِ

بِكربلا يقتلُ باِغتيالِ   لِلقاتلِ الويل مع الوبالِ

تهوي بهِ النار إلى سفالِ   مُصفّد اليدينِ بالأغلالِ

كبولةٍ زادت على الأكبال

'আমি তাকে দেবো আর এতে কোনো পরোয়া করি না। আমার পরিবারের উপর আল্লাহকে আমি প্রাধান্য দেই।

তারা রাতে ক্ষুধার্ত থেকে গেলো। তারা আমার সিংহশাবক- তাঁদের কনিষ্ঠজন যুদ্ধে নিহত হবে-

কারবালায় হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। হত্যাকারীর জন্য আছে ধ্বংস আর কঠিন শাস্তি।

জাহান্নাম খুনীকে পাতালে টেনে নেবে, তার দু'হাত থাকবে শেকলে বাঁধা।

শেকলের বেড়ি এমন- যা অন্যসব শেকল থেকে কঠিন।'

এভাবে দ্বিতীয় দিনও তাঁরা না খেয়ে কাটালেন। তৃতীয় দিন ইফতারির সময় একজন বন্দী এসে খাবার চাইলো। তখন আলী (রা.) আবারও ফাতিমা (রা.) কে খাবার দিতে বলে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ফাতিমা উত্তরে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

لم يبق مما جاء غير صاع قد ذهبت كفي مع الذراع

ابناي والله هما جياع يا رب لا تتركهما ضياع

أبوهما للخير ذو اصطناع يصطنع المعروف بابتداع

عبل الذراعين شديد الباع وما على رأسي من قناع

إلا قناعا نسجه أنساع

'তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন, এক সা' ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার হাতের তালু আর বাহু শেষ হয়ে গেছে।

আল্লাহর কসম, আমার দুই সন্তান ক্ষুধার্ত, তাদেরকে তুমি ধ্বংস করো না।

তাদের পিতা কল্যাণের জন্য উৎসাহী, তিনি নব উপায়ে ভালো কাজ করেন।

তাঁর বাহু শক্তিশালী এবং হাত দীর্ঘ; আর আমার মাথায় কোনো ঘোমটা নেই-

চামড়া দিয়ে বোনা ঘোমটাটি ছাড়া।'

এভাবে তাঁরা তিন দিনই অভুক্ত থাকলেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে দেখতে আসলেন এবং পবিত্র কুরআনের সূরা দাহরের প্রথমাংশ নাযিল হলো। একটি আয়াতে মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দীদের খাবার খাওয়ানোর প্রশংসা করে আল্লাহ বললেন,

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

'খাবারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দেয়।'[৫৫]

এই ঘটনা ইমাম কুরতুবি,[৫৬] আব্দুর রউফ মানাবি,[৫৭] ইসমাঈল হাক্কিসহ[৫৮] অনেকেই মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এটা ঠিক যে, মুহাজিরদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধবন্দীদের খাবারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন আলী (রা.)। সে হিসেবে তাঁর ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হতে পারে। ইবন আব্বাস (রা.) এর মতামতও এর সপক্ষে পাওয়া যায়। তিনি ভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আলী (রা.) এর ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৯] কিন্তু এই কবিতাগুলো তাঁরা উল্লেখ করেননি। ফাতিমা (রা.) এর নামে প্রচলিত এই কবিতাগুলো আরোপিত ও বানোয়াট।

প্রথম কবিতায় লক্ষণীয়, ফাতিমা (রা.), আলী (রা.) কে 'চাচাতো ভাই' বলছেন। অথচ আলী (রা.) ফাতিমা (রা.) এর চাচাতো ভাই নন। তিনি মহানবী (সা.) এর চাচাতো ভাই

---

৫৫. আল কুরআনুল কারিম, ৭৬: ০৮।

৫৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আনসার আল কুরতুবী, *আল জামে লিআহকামিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১৩, খ. ১০, পৃ. ৮৮।

৫৭. আব্দুর রউফ মানাভি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬২।

৫৮. ইসমাঈল হাক্কি আল বুরুসাভি, *রুহুল বায়ান*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১৮, খ. ১০, পৃ. ৬৭-৬৮।

৫৯. আবুল হাসান আহমদ ইবন আলি আল ওয়াহিদি, *আসবাবুন নুযুল*, দারুল আসলাহ, দাম্মাম ১৯৯২, পৃ. ৪৪৮।

ছিলেন। দ্বিতীয় কবিতায় দেখা যায়, কারবালায় হুসাইন (রা.) এর শহীদ হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। অথচ তখনও কারবালার ঘটনা ঘটেনি। তৃতীয় কবিতাসহ সবগুলো কবিতার ভাব ও ভাষা অত্যন্ত দুর্বল, যা ফাতিমা (রা.) এর অপর কবিতাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এছাড়া সূরা দাহর একটি মাক্কী সূরা। আর হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.) এর বিয়ে হয়েছিল বদরের যুদ্ধের পরে। স্বাভাবিকভাবেই হাসান ও হুসাইন (রা.) এর এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় জন্ম হয়নি। এজন্য হাকিম তিরমিযি, ইবনুল জাওযি, যাইনুদ্দীন ইরাকী, ইবন হাজার আসকালানী, শামসুদ্দিন আয যাহাবি প্রমুখ এই ঘটনাকে জাল বলেছেন।[৬০]

গবেষণা ফলাফল

১. এ প্রবন্ধে ফাতিমা (রা.) এর নিজের রচিত ৭টি কবিতা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বরেণ্য ওলামাদের গ্রন্থের আলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫ টি কবিতা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য শোকগাঁথা এবং ২ টি কবিতা তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে রচিত।

২. হযরত ফাতিমা (রা.) এর নামে বানোয়াট ৬ টি কবিতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কবিতা কেন তাঁর নয়, তাও প্রমাণ করা হয়েছে।

৩. কোনো কবিতার ক্ষেত্রে ভুল পাঠ প্রচলিত থাকলে সঠিক পাঠ নির্দেশ করা হয়েছে।

৪. কবিতার দুর্বোধ্য জায়গাগুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

হযরত ফাতিমা (রা.) সর্বকালের মুসলিম নর-নারীর আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য, দুনিয়াবিরাগ, অল্পেতুষ্টি, দানশীলতা, মহানুভবতা, লজ্জাশীলতা ইত্যাদির মতো মহৎ গুণাবলি তাঁর মাত্র ২৯ বছরের জীবনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। কাব্যচর্চাও তাঁর অনুরূপ একটি গুণ। একজন কবির যতগুলো কবিতা থাকা স্বাভাবিক, ফাতিমা (রা.) এর কবিতার সংখ্যা তেমন নয়। এরপরও মাত্র ৭ টি কবিতায় তিনি যেভাবে মনের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, তাই কাব্যজগতে তাঁর অমরত্বের জন্য যথেষ্ট। বহু বছর পরে এসেও তাঁর কবিতাগুলো পড়ে তাঁর মনের অনুভূতি আমরা গভীরভাবে অনুভব করতে পারি। এখানেই তাঁর কবিতার স্বার্থকতা।

গ্রন্থপঞ্জী

- আল কুরআনুল কারিম।
- উমর রিদা কাহহালা, *আলামুন নিসা*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত ২০১১;
- শামসুদ্দিন আয যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, মুয়াসসাতুর রিসালা, বৈরুত ১৯৮২;
- ইবনুল আসির, *উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা*, দারু ইবনি হাযম, বৈরুত ২০১৪;
- ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারি, *আল জামেউস সাহিহ*, দারু ইবনি কাসির, বৈরুত ২০০২।
- আল ফাকিহ আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আবদি রাব্বিহি, *আল ইকদুল ফরিদ*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৮৩।

৬০. আহমদ ইবন সিদ্দিক আল গুমারি, *আল হানিন বিওয়াদই হাদিসিল আনিন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১, পৃ. ৮৮-৮৯।

- আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন আলী হুসরী আল কায়রাওয়ানি, *যাহরুল আদাব ওয়া সামারুল আলবাব*, দারুল জিল, বৈরুত তাবি,
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, *আস সুনান*, দারুত তাসিল, কায়রো ২০১৪।
- ইবনু সায়্যিদিন নাস, *উয়ুনুল আসারি ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামাইলি ওয়াস সিয়ার*, দারু ইবনি কাসির, বৈরুত তাবি।
- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি, *আস সুগুরুল বাসিমাতি ফি মানাকিবিস সায়্যিদাতিল ফাতিমা*, দায়েরাতুশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, দুবাই ২০১১।
- আব্দুর রউফ মানাভি, *সায়্যিদাতু নিসাই আহলিল জান্নাহ ফাতিমাতুয যাহরা আও ইত্তিহাফুস সাইল বিমা লি ফাতিমাতা মিনাল মানাকিব*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০২।
- সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ, *আর রিছা ফিশ শিরিল আরাবি*, দারুর রাতিব আল জামিইয়্যাহ, বৈরুত তাবি।
- জাবি যাদাহ আলি ফাহমি, *হুসনুস সাহাবা ফি শারহি আশআরিস সাহাবা*, মাতবাআ সে, বসনিয়া-হার্জগোভিনা ১৩২৪ হি.।
- মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আস সালিহি আশ শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়া রাশাদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১২।
- আবু বকর মুহাম্মদ ইবন দাউদ আল আসবাহানি, *আয যাহরা*, মাকতাবাতুল মানার, জর্ডান ১৯৮৫।
- বাহাউদ্দিন আল মুনশি আল ইরবিলি, *আত তাযকিরাতুল ফাখরিয়্যাহ*, দারুল বাশায়ে, দামেস্ক ২০০৪।
- সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতিমা আয যাহরা আলাইহাস সালাম ফি দিওয়ানিশ শি'রিল আরাবি*, মুয়াসসাসাতুল বাসাহ, বৈরুত ১৯৯৭।
- ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ*, দারুল হাদিস, কায়রো ১৯৯৫।
- ইবন হাজার আসকালানী, *ফতহুল বারী*, দারুল মারেফাহ, বৈরুত ২০০৭।
- আল্লামা মোল্লা আলী কারী, *উমদাতুল কারী*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১।
- আবু বকর আল জাওহারি, *আস সাকিফা ওয়া ফাদাক*, উতবাতুল হুসায়নিয়্যা আল মুকাদ্দাসাহ, ইরাক ২০১১।
- আবু বকর ইবন আবি শায়বা, *আল মুসান্নাফ*, মুয়াসসাসাতু উলুমিল কুরআন, সিরিয়া ২০০৬।
- ইবন মানজুর আফ্রিকি, *লিসানুল আরব*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০৫।
- ইবন শহরাশুব, *মানাকিবু আলি আবি তালিব*, আল মাতবাআতুল হায়দারিয়্যাহ, নাজাফ ১৯৫৬।
- বাসসাম মুহাম্মদ হামামি, *নিসাউন হাওলার রাসুল*, দারু দানিয়া লিন নাশরি ওয়াত তাওবিখ, দামেস্ক ১৯৯৪।

- আবুল আতাহিয়া, *দিওয়ানু আবিল আতাহিয়া*, দারু বৈরুত, বৈরুত ১৯৮৬।
- ইবন শহরাশুব, *মানাকিবু আলি আবি তালিব*, দারুল আদওয়া, বৈরুত ১৯৯।
- মুহাম্মদ বাকির মাজলিসি, *বিহারুল আনওয়ার*, দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান তাবি।
- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আনসার আল কুরতুবী, *আল জামে লিআহকামিল কুরআন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১৩।
- ইসমাঈল হাক্কি আল বুরুসাভি, *রুহুল বায়ান*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১৮।
- আবুল হাসান আহমদ ইবন আলি আল ওয়াহিদি, *আসবাবুন নুযুল*, দারুল আসলাহ, দাম্মাম ১৯৯২।
- আহমদ ইবন সিদ্দিক আল গুমারি, *আল হানিন বিওয়াদই হাদিসিল আনিন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১।
- আত তিজানি সাঈদ মাহমুদ, *আত তামাসসুলু বিশ শিরি*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০১৩।
- ইউসুফ ইবনুয যাকি আব্দুর রহমান আবুল হাজ্জাজ আল মিযযি, *তাহযিবুল কামাল*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৮০।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

প্রবন্ধ-শিরোনাম:
ইসলামের আলোকে সামাজিক মর্যাদা: একটি পর্যালোচনা

মোঃ আব্দুর রহমান রকিব*

Abstract: *Dignity is honor, pride, respect, fame, just and decent behavior. It is a value and Principle based on philosophy, law, pragmatis, psychology, behavior and cultural factors. Dignity is a permanent quality of a human being that arises from the inherent values of humans and people naturally hold and cherish different froms of dignity from one another. Dignity is created in society through people's respect for each other. Social status is a very important aspect for socialized people. Islam has provided essential guidelines regarding the social status of the human race. This perspective has been emerged in the article. The research has been Conducted in the bengali language. Some Information and data have been used in Arabic, English and other languages where necessary. Descriptive, analytical, historical and comparative research methods have been employed in this article. As a result, the article will play a vital role in creating human beings with moral values.*

Keywords: *সমাজ, মর্যাদা, অধিকার, ইসলাম, মূল্যবোধ ইত্যাদি।*

সারসংক্ষেপ: *গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, খ্যাতি, ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বা আচরণই হলো মর্যাদা। মর্যাদা হল এক ধরনের মূল্যবোধ, একটি নীতি যার ভিত্তি দর্শন, আইন, কার্যসিদ্ধিমূলক, মনোবৈজ্ঞানিক, আচরণিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়। মর্যাদা একজন মানুষের স্থায়ী গুণ যা মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ থেকে জাগ্রত হয় এবং স্বভাবজাতভাবেই মানুষ একে অপরে ভিন্ন মর্যাদা ধারণ ও লালন করে থাকে। মর্যাদা সমাজে মানুষের একে অপরের শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে তৈরি হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। ইসলাম মানব জাতির সামাজিক মর্যাদা প্রসঙ্গে অতীব আবশ্যকীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। গবেষণাকর্মটি বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হয়েছে। প্রয়োজনে আরবি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রবন্ধে বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণধর্মী, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব তৈরিতে আলোচ্য প্রবন্ধটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।*

* পিএইচডি গবেষক, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রভাষক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ভূমিকা

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত ব্যাপার। মানবকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সার্বজনীন প্রত্যয় হলো সামাজিক মর্যাদা। কারণ সামাজিক মর্যাদার নিশ্চয়তা ছাড়া মানুষের কল্যাণ সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সম্মানিত করেছেন তার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার মাধ্যমে। শুধু পার্থিবজীবনেই নয়; বরং মৃত্যুর পরও তাকে মর্যাদার অধিকারী করেছেন। সর্বোপরি, মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত"-এর মর্যাদা দিয়েছেন। কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোত্র বা বর্ণের মানুষ এ মর্যাদার একক দাবিদার নয়; বরং সকল মানুষ সমানভাবে এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাই সমাজে সামাজিক মর্যাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো।

সামাজিক মর্যাদা

'সামাজিক মর্যাদা' শিরোনামটি দুইটি শব্দে বিভক্ত। প্রথমটি হলো- সমাজ। আর দ্বিতীয়টি হলো- মর্যাদা। এ দু'য়ের পরিচয় প্রদানপূর্বক সামাজিক মর্যাদার পরিচয় তুলে ধরা হলো।

সমাজ পরিচিতি

বুৎপত্তিগতভাবে সমাজ শব্দটি সম+অচ্+ঘঙ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ একত্রে গমন, একসঙ্গে বসবাস।[১] সমাজের আরবি প্রতি শব্দ হলো المجتمع (আল মুজতামা')[২] এবং এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Society।[৩] মূলত Society শব্দটি ইংরেজি Sociology শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ল্যাটিন শব্দ socious এবং গ্রিক logos শব্দ বা logia -এর সমন্বিত শব্দ। ল্যাটিন socious শব্দের অর্থ companions সঙ্গী,[৪] সহযোগী সমাজ। আর সমাজ হচ্ছে সহযোগিতা।[৫] যেহেতু সংঘবদ্ধ বা সঙ্গী-সাথী একত্রে মিলে জীবন নির্ভর করে সমাজ গড়ে উঠে, সেহেতু socious এর ভাবার্থ সমাজ করা হয়েছে।

ব্যাপক অর্থে সমাজ সব ধরনের সামাজিক আচরণ ও এর অর্ন্তগত সকল সম্পর্ককেই বুঝায়। এ অর্থে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠী বা জনসংঘকে না বুঝিয়ে সমাজ কথাটি সমগ্র মানবসমাজকে বুঝায়। এক্ষেত্রে মানবসমাজ মানব অস্তিত্বের সঙ্গে সমব্যাপক। সুতরাং মানবসমাজ সার্বজনীন ও সর্বকালীন। উল্লেখ্য যে, ১৮৩৯ সালে ফরাসি সমাজ বিজ্ঞানী মি. অগাস্ট কোঁৎ[৬] (১৭৯৮-১৮৫৭ খৃ.) (Augest comte) সর্বপ্রথম ল্যাটিন Socious শব্দটি প্রবর্তন করেন। তাই তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।[৭]

---

১. ড. অনাদি কুমার মহাপাত্র, *বিষয় সমাজতত্ত্ব* (কলিকাতা: ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ৩য় সংস্ক., ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৭৯।

২. ড. আব্দুল করিম যায়দান, *উসূলুদ-দা'ওয়াহ* (বৈরূত: দারুল ফিকরিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯৬।

৩. মুহাম্মদ হাসান ইমাম, *সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ৫২।

৪. আলহাজ্ব মো: আসাদুজ্জামান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচয়* (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩, ১০।

৫. ড. নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৭ম সংস্ক., ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৫।

৬. **অগাস্ট কোঁৎ :** অগাস্ট কোঁৎ উনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আধুনিক কালের প্রত্যক্ষ বাদের (positivism) তিনি প্রধান প্রবক্তা। তিনি ফরাসি দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৭৯৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেও ১৮৫৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন। 'জ্ঞান বিকাশের ইতিহাস' তাঁর মূল্যাবান গ্রন্থ। বি.দ্র. আব্দুল হাই, *পরিভাষা কোষ* (ঢাকা: আগমনী প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭৯-৮০।

৭. ড. নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; রওশন আরা, আব্দুল হাই শিকদার, *সামাজিক বিজ্ঞান* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবস্তান, ১ম সংস্ক., ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২; ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সমাজ বিজ্ঞান*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: নবারুন প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৮।

জিসবার্ট (Gisbert) সমাজকে একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা ও মানসিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, Sociality or society is essentially a mental phenomenon.[৮] তাই দেখা যায়, বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং সমাজ দার্শনিকগণ সমাজকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিকক (Leacock) বলেন, The term society has no reference to a territory occupation. It refers to man alone not to his environments. অর্থাৎ, সমাজ শব্দটিতে ভূমি দখলে কোনো সম্বন্ধ নেই, এটা শুধুমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে গঠিত। তারা পরিবেশকে কেন্দ্র করে নয়।[৯]

সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিন্সবার্গের মতে, Society is universal and pervasive and has no definite boundary or assignable limits. A society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behavior which mark them off from others. অর্থাৎ বৃহৎ অর্থে সমাজ হচ্ছে স্বতন্ত্র একটি সংজ্ঞা এবং যার কোনো সীমারেখা নেই। সমাজ ব্যক্তি ও মানুষের আচরণের সমন্বয়, যা তাকে অন্য সমাজ থেকে পৃথক করে।[১০]

মর্যাদা পরিচিতি

মর্যাদা বলতে সাধারণত সম্মানজনক অবস্থাকে বোঝা যায়। মর্যাদার বহুল প্রচলিত ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, Dignity. নিম্নে বিভিন্ন অভিধান প্রণেতাদের মতে, 'মর্যাদা বা Dignity'-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো-

মর্যাদা শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ করতে গিয়ে সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে বলা হয়েছে, "গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, খ্যাতি, ন্যায়সংগত ও শালীনতাসম্মত নিয়ম বা আচরণ।"[১১]

মর্যাদার পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত English-Bengali Dictionary-তে বলা হয়েছে, সম্মানিত বা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ও মর্যাদা।[১২]

মর্যাদার পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলা একাডেমির Bengali-English Dictionary-তে বলা হয়েছে যে, এর প্রতিশব্দগুলো হচ্ছে, Honour, dignity, prestige, respect, pay respect to, give the status of, treat cordially.[১৩]

---

৮. P. Gisbert, *Fundamentals of sociology*, (New Delhi; orient Longman), p.9.

৯. Amas leacock, *The source of politics,* (London, 1890) P. 8; প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৭।

১০. Maris Gins berg, *Sociology* (London : Oxford university press. 1959 AD) P. 40-43.

১১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (ঢাকা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫), পৃ. ৫৬৩।

১২. Zillur Rahman Siddiqui, *English-Bengali Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 2011 AD), p. 212.

১৩. Mohammad Ali et al (Eds.), *Bengali-English Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 2009 AD), p. 646.

তবে Dignity শব্দের পরিচয় দিতে গিয়ে Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে বলা হয়েছে, "A claim and serious manner that deserves respect; the fact of being given honour and request by people."[১৪]

মর্যাদার আরবি প্রতিশব্দ হলো- شرف، منزلة، وجاهة، مجد ইত্যাদি।[১৫] এর পারিভাষিক পরিচয়ে বলা হয়েছে, الشرف هو صفة تقيم مستوى الفرد في المجتمع، ومدى ثقة الناس به بناء على أفعاله وتصرفاته، وأحيانا نسبه، وفي تلك الحالة تصف مدى النبل الذي يتمتع به الفرد اجتماعيا.[১৬]

সুতরাং মর্যাদা বলতে সম্মান, মান, ইজ্জত, গৌরব বা সমাদৃত হওয়াকে বোঝায়। কোনো ব্যক্তির মান ও মর্যাদার বিষয়টি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। স্থানীয় সংস্কৃতিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মর্যাদার বিষয়ে তারতম্য সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বয়স কিংবা আর্থিক অসংগতিও মানুষের মধ্যকার মর্যাদা নির্ধারণ করে থাকে।

সামাজিক মর্যাদার পরিচিতি

সামাজিক মর্যাদা বলতে সাধারণত বুঝায়, 'সমাজে অবস্থিত মানুষের গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, খ্যাতি, ন্যায়সংগত ও শালীনতাসম্মত নিয়ম বা আচরণ।' মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই ইসলামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে। "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"[১৭] এটাই হলো মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় সনদ। এ সনদের মাধ্যমে ইসলাম মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ সার্বভৌম।[১৮] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ "সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা।"[১৯] অতএব, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মানুষের সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনে। আর তা হলো, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا "আমরা অবশ্যই সম্মানিত করেছি আদম সন্তানকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল ও জল পথে। আর তাদের রিজিক হিসেবে দিয়েছি

১৪. Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (UK: Oxford University Press, 2005 AD), P. 368.

১৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৯৮।

১৬. www.ar.m.wikipedia.org/wiki/شرف/10/12/2019.

১৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২৫৫।

১৮. **সার্বভৌমত্ব:** এটি সার্বভৌম শব্দের গুণবাচক বিশেষ্য। সার্বভৌম শব্দটি সর্ব ও ভূমি শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এর মূল আভিধানিক অর্থ হলো: সমুদয় ভূমির অধীশ্বর (প্রভু)। নরেন বিশ্বাস, *বাংলা উচ্চারণ অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ. ৪৮৬। এ বুৎপত্তিগত অর্থে বস্তুত আল্লাহ তা'আলা হলেন একমাত্র সার্বভৌম। তিনি ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীর প্রভু ও মালিক বলতে কেউ নেই, হতেও পারে না। দ্র. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২৫৫।

১৯. আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ১২৮।

সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুর উপর তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।"[২০] প্রকৃত অর্থে মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মর্মে কুরআনুল কারিমে এসেছে-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতম পরিণত করি। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।"[২১]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "তোমাদের রব ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণ করছি।"[২২] খলিফা সম্পর্কিত ধারণাই মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

মহান আল্লাহ স্বয়ং মানবজীবনের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে যাতে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফলকল্পে সমগ্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করতে পারে। এ বিশ্বলোককে মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا "একমাত্র তিনিই পৃথিবীর সকল বস্তু তোমাদের (মানব জাতির) জন্য সৃজন করেছেন।"[২৩]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বলে মানবজীবনের সামগ্রিক জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণে বিশ্বাসী। ইসলাম সমাজের অখণ্ড সত্তায় বিশ্বাসী এবং মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত। ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সমাজের সামাজিক সম্মান, অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।[২৪] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! বেশি ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহ। দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাক, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।[২৫]

২০. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ৭০।
২১. আল-কুরআন, সূরা আত্-ত্বীন, আয়াত : ০৪-০৬।
২২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ৩০।
২৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২৯।
২৪. মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০।
২৫. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, আয়াত : ১২।

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক মর্যাদা

নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক মর্যাদার কতিপয় দিক আলোচ্য প্রবন্ধানুসারে উপস্থাপন করা হলো।

ক. ধর্ম ও জীবন-বিধান গ্রহণ ও পালনের অধিকার :

ধর্ম ও জীবন-বিধান গ্রহণ ও পালনের অধিকার সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

অর্থাৎ, 'বলে দাও, হে কাফির সম্প্রদায়। আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা করো। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করো যাঁর ইবাদত আমি করি। আর না আমি তাদের ইবাদত করবো যাদের ইবাদত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করবে যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা আমার জন্য।'[২৬] আল-কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

অর্থাৎ, 'ধর্মমত গ্রহণে কোনো জবরদস্তিরই স্থান নেই। কেননা প্রকৃত হিদায়েত ও সত্য পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।'[২৭] সুতরাং ধর্ম বা জীবন বিধান গ্রহণ ও পালনের ব্যাপারে ইসলামের এই উদার নীতির কোনো তুলনা বা দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শে নেই।

খ. জীবন ও প্রাণের সংরক্ষণ:

ইসলামের দৃষ্টিতে খাদ্য-জীবনোপকরণ এবং ধর্ম পালনের নিরাপত্তা লাভের পর মানুষের জীবন ও প্রাণের নিরাপত্তা লাভ একান্ত অপরিহার্য। এ কারণে কোনোরূপ কারণ ব্যতীত এবং আইনের চূড়ান্ত বিচার ও সেই বিচারের দণ্ডস্বরূপ প্রাণ সংহার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে মানুষকে হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

অর্থাৎ, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন, সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। আর যে ব্যক্তি মাজলুম অবস্থায় নিহিত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবি করার অধিকার দান করেছি। কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়, এই অভিভাবক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে।'[২৮]

বিনা কারণে ও আইনের চূড়ান্ত বিচারের রায় ছাড়া মানুষের জীবন ও প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার হরণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। এরূপ অবস্থায় (আইনের চূড়ান্ত বিচার ব্যতিরেকে) একজন মানুষকে হত্যা করা মানব সম্প্রদায়কে হত্যা করার সমপর্যায়ের অপরাধ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

---

২৬. আল-কুরআন, সূরা আল-কাফিরূন, আয়াত : ০১-০৬।
২৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২৫৬।
২৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ৩৩।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থাৎ, 'কোনো নরহত্যার কিংবা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে বিচারের রায় ছাড়া যদি কেউ কোনো মানুষকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করেছে। আর যে এই মানুষকে (বিনা কারণে হত্যা থেকে) বাঁচিয়ে দিল, সে যেন সমস্ত মানুষকে বাঁচিয়ে দিল।'[২৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিনা কারণে মানুষ হত্যাকে কবিরা গুনাহ বলেছেন এবং মারামারি ও সশস্ত্র ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছেন। কেননা তাতে অকারণ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরহত্যা সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

অর্থাৎ, 'দু'জন মুসলমান তরবারি (মারণাস্ত্র)-সহ পরস্পরের সম্মুখবর্তী হয়ে পড়লে (একজন নিহত হলে) হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী হবে।'[৩০] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا. أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থাৎ, 'যে লোক তার বর্শা-বল্লম (মারণাস্ত্র) নিয়ে আমাদের মসজিদে কিংবা আমাদের হাটে-বাজারে যাতায়াত করবে, সে যেন তার অগ্রভাগ সামলে রাখে; অথবা বলেছেন, সে যেন তার দস্তানা ধরে থাকে, যেন তা থেকে কোনো মুসলিমের গায়ে এক বিন্দু আঘাত না লাগে।'[৩১]

মূলতঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের এসব মহামূল্য বাণী মানুষকে অকারণ হত্যা বা আঘাত করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর উম্মতকে সাবধান ও সর্তক করে জীবন ও প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

গ. নিরাপত্তামূলক বাসস্থান:

সমাজে মানুষ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে নিজ গৃহে বসবাস করতে চায়। কোনো উৎপীড়ন ও অশান্তি যেন ঘিরে না বসে এজন্য ইসলাম এক প্রতিবেশীর প্রতি অপর প্রতিবেশীর দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পর্দা প্রথা মেনে চলার আদেশ করেছে। কোনো বাড়িতে আলো-বাতাস প্রতিরোধমূলক কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে অনুমতি ও সালাম ছাড়া প্রবেশ করবে না। এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।[৩২]

---

২৯. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত : ৩২।
৩০. *সুনান আবু দাউদ* (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১০ খ্রি.), হাদিস নং- ৫২১৩, পৃ. ৫২০।
৩১. প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ২৫৮৯, পৃ. ৩৩৬।
৩২. আল-কুরআন, সূরা আন-নুর, আয়াত : ২৭।

ঘ. মত ও ধর্মের স্বাধীনতা:

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে তার মতামত ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। যে যার ধর্ম পালন করবে। ধর্মের ব্যাপারে মানুষের উপর কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ অর্থাৎ, তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য।[৩৩] কিন্তু স্বেচ্ছায় ধর্মগ্রহণ করার পর তার কোনো বিধান লঙ্ঘন করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় না। মহান আল্লাহ ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।[৩৪] অন্যায়ের পথ অবলম্বন করার কারণে শাস্তি হবে।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيرًا

নিশ্চয়ই আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

সুতরাং মানুষকে আল্লাহ সৎ ও অসৎ উভয় পথের অনুভূতি দিয়ে রেখেছেন। এখন সে স্বাধীনভাবে যেটা গ্রহণ করবে তা করার ইখতিয়ার তার রয়েছে।

ঙ. ধন-সম্পদ সংরক্ষণ ও পারস্পারিক লেনদেনের অধিকার :

আল্লাহ তা'আলার মালিকানা সম্পদ মানুষকে দেয়া হয়েছে তার নিরংকুশ মালিক বানিয়ে নয়, বরং প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে। মালিক তো আল্লাহ, মানুষ হলো এ সবের ক্ষেত্রে তাঁর খলিফা বা তাঁর বিধান অনুযায়ী ব্যয়-ব্যবহার ও বণ্টনের দায়িত্বশীল হিসেবে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।'[৩৫]

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই ধন-সম্পদ উপার্জন করার অধিকার দিয়েছে। আর যে যা উপার্জন করে তার সংরক্ষকও সেই হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ। অর্থাৎ, 'পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে তাতে, যা তারা উপার্জন করবে এবং নারীদেরও জন্য অংশ রয়েছে তাতে, যা তারা উপার্জন করবে।'[৩৬] উপার্জন ও উপার্জিত সম্পদের পর্যবেক্ষণ মানবাধিকার বিশেষ।

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ কোথায় বা কাদের জন্য ব্যয় করতে হবে তা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

৩৩. আল-কুরআন, সূরা আল-কাফিরূন, আয়াত : ০৬।
৩৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ইনসান, আয়াত : ০৩।
৩৫. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ০৭।
৩৬. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩২।

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত।'[৩৭]

ধন-সম্পদের লেনদেনের নিয়ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন পারস্পরিকভাবে যে ঋণের কারবার কর কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য, তখন তা তোমরা লিখে রাখো।'[৩৮]

চ. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা সংরক্ষণ:

ইসলাম ব্যক্তিগত বিষয়কে ব্যক্তির একান্ত গোপনীয় বলে মনে করে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন রয়েছে এবং প্রত্যেকের এমন কিছু গোপন বিষয় রয়েছে যা অন্যের জানা উচিত নয়। মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এই বাস্তবতাকে ইসলাম মূল্যায়ন করেছে। ইসলাম বিনা অনুমতিতে কারও বাসগৃহে প্রবেশ করে তার ব্যক্তিগত বিষয় জানার প্রচেষ্টা চালানোকে গর্হিত কাজ বলে মনে করে। কারো ঘরে অযাচিত প্রবেশ কিংবা ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে ইসলামের এ সতর্কবার্তা মানবতার জন্য কল্যাণকর বিধান। এ মর্মে আল-কুরআনে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ কর না। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।"[৩৯]

বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (সা.) বলেন, "তোমাদের অনুমতি ছাড়া যেন তোমাদের অপছন্দনীয় কেউ তোমাদের ঘরে প্রবেশ না করে।"[৪০] চিঠিপত্র ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কারো চিঠি তার অনুমতি ছাড়া খোলাও বৈধ নয় বলে ফিকাহবিদগণ অভিমত পেশ করেছেন।[৪১] কারো যোগাযোগের ক্ষেত্রে আড়িপাতা কিংবা গোপন তৎপরতার মাধ্যমে কারো গোপনীয় বিষয় উদ্ঘাটন করে আনা এর কোনোটাই ইসলামী শরিয়ত অনুমোদন করে না। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

---

৩৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২১৫।
৩৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ২৮২।
৩৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত : ২৭-২৮।
৪০. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *মানবাধিকার ও ইসলাম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৮।
৪১. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), *তফসীরে মা'আরেফুল*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪২৬।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ, "হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[৪২]

মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ্ জানেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের কথা গোপনই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী।"[৪৩] তাই কোনো ব্যক্তির অসম্মান হয় এমন কোনো দোষ-ত্রুটি মানুষের কাছে প্রকাশ করা যাবে না। আবার দোষ গোপন রেখে তাকে আরো বেশি দোষী হবার সুযোগ করে দেয়া যাবে না। বরং তার দোষ-ত্রুটি দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যেমন রাসুল (সা.) বলেছেন,

لا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، إِلا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের ত্রুটি গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।"[৪৪] রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্য হাদিসে বলেন,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে গোপন রাখবেন।"[৪৫]

উমাইয়া শাসনের প্রথমদিকে স্বৈরাচারী শাসনের পর হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.)-এর সময়ে মানুষ স্বাধীনভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাঠামোর আলোকে ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ এবং খলিফা ও প্রশাসনের সমালোচনা করার অধিকার প্রদান করা হয়।[৪৬] হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) বলেছেন, "আল্লাহ কখনও অল্প সংখ্যক লোকের পাপে সকলকে আজাবে নিক্ষেপ করেন না; কিন্তু যখন পাপ ও জুলম প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত না হলে সর্বসাধারণের উপর ব্যাপকভাবে আজাব নাজিল হয়।[৪৭] আল্লাহ তা'আলার বাণী এদিকে ইঙ্গিত বহন করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

৪২. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, আয়াত : ১২।
৪৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মুলক, আয়াত : ১৩।
৪৪. আবু হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিসাবুরী, *সহীহ মুসলিম* (কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০ খ্রি.), হাদীস নং-২৫৯০, পৃ. ৭৪২।
৪৫. *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ১৬৯৫৯, পৃ. ১৫৮।
৪৬. আব্দুস সালাম হাসান নদভী, *সীরাতে উমর ইবনে আবদুল আজীজ* (আজমগড়: ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ১৫০।
৪৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৬৪।

"তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"[৪৮]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের মধ্য হতে শরিয়তের পরিপন্থী কাজ বিলোপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় গোনাহগার ও পুণ্যবান নির্বিশেষে সবার উপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন।"[৪৯]

ছ. যথাযোগ্য মান-সম্মান পাওয়া:

মানুষ হিসেবে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া ইসলাম নির্দেশিত বিধান। ইসলামী রীতি হলো প্রত্যেক মানুষ সকল প্রকার বৈষম্যের ঊর্ধ্বে থেকে পরস্পরকে সম্মান করবে।[৫০] এ অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, সাদা-কালোর ব্যবধান ভুলে সবাই সবাইকে সম্মান করবে। ইসলাম প্রত্যেক মানুষের জন্য এ সম্মান বাধ্যতামূলক করেছে। এ সম্মান কোনো দিক থেকে ক্ষুণ্ন হলে সে তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে সহযোগিতা প্রাপ্য হবে।[৫১] ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর শাসনামলে সব মানুষের প্রতি সমান সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। এছাড়াও তিনি অক্ষম, আতুর ও অচলদের বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন।[৫২] হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে তিনি তাঁর শাসনামলে সকল নাগরিকদের অধিকার সমুন্নত করতেন। এমনকি তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য বায়তুলমাল থেকে খরচের ব্যবস্থা করে দিতেন। যাতে করে সকল নাগরিক তার রাজ্যে সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।[৫৩]

মহান আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছেমতো এই জগত সৃষ্টি করেছেন। শুধু সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি সৌরজগতের সকল গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তিনি প্রকাশ করেন। সে জন্য তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আবার কারো কাছে জবাবদিহি করেন না। সকল সৃষ্টিই আল্লাহর ইচ্ছামত রূপ পরিগ্রহ করে। কোনো সৃষ্টিকে অবহেলোা করা স্রষ্টাকে অবহেলোা করার নামান্তর। তাই কোনো সৃষ্টিকে অবহেলোা না করে তাদেরকে যথাযথভাবে মর্যাদা দেওয়া ইসলাম নির্দেশিত একটি আমল। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا "ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।"[৫৪]

---

৪৮. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ২৫।

৪৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, অনু. অধ্যাপক আখতার ফারুক (ঢাকা: ইফাবা, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৯৬

৫০. Dr. ABM Mafijul Islam Patwary, *Elements of Human Rights and Legal Aids* (Dhaka: Humanist and Ethical Association of Bangladesh, 1993 AD), p. 4-5.

৫১. Muhammad Salahuddin, *Basic Human Rights in Islam* (Dhaka, 1992 AD), p. 227-232.

৫২. আল্লামা শিবলী নোমানী, *আল-ফারুক*, অনু. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ০৩।

৫৩. *আল-মাজমুউ শারহুল মোহাজ্জাব* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১১।

৫৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ৩৭।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে বলেন, بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ بَغَى وعَتَا "নিকৃষ্ট বান্দা সে যে নিজেকে বড় মনে করে এবং সীমা অতিক্রম করে।"[৫৫] রাসুল (সা.) আরও বলেছেন,

احْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَاكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا

অর্থাৎ, "জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিবাদ হলো। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে ঔদ্ধত্য অহংকারী লোকেরা থাকবে। আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে ফায়সালা করলেন এইভাবে যে, তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।"[৫৬] রাসুল (সা.) অন্যত্র আরও বলেছেন, أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ "মানুষকে তাদের স্তর অনুসারে সম্মান কর।"[৫৭]

জ. বৈষম্য, নির্যাতন, ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ না করা

'মানবতা' সকল মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার পূর্বশর্ত হলো বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান থাকলে মানুষের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ইসলাম সামাজিক বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন আজ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও আধুনিক ধর্ম হলেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বর্তমান সময়ের মুসলমানরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে।[৫৮] ইসলাম আত্মম্ভরিতা পরিহার করে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয় যাতে করে মানুষ অন্যের উপর নিজের প্রাধান্য ভেবে পশুত্বের ন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকে। বৈষম্যের বীজ মূলত অহমিকা থেকে শুরু হয় যা সহনশীলতার মূলে কুঠারাঘাত করে ব্যক্তিকে কু-কর্মের দিকে তাড়িত করে। আর এ মানসিকতা সমাজকে ভারসাম্যহীন ও পরনির্ভরশীল করে তোলে। মানব মনে সৃষ্টি হয় নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, নীচতা ও হীন মানসিকতা যার দ্বারা ব্যক্তি স্বভাবকে পরিবর্তন করে পাশবিকতায় পৌঁছে দেয়। এরূপ পশুত্ব পরিহার করার জন্য আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

অর্থাৎ, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরি করে ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মতো উদর পূর্তি করে; আর জাহান্নামই তাদের আশ্রয়স্থল।"[৫৯]

---

৫৫. *আস-সুনান*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদিস, ২০১০ খ্রি.), হাদিস নং-২৪৪৮, পৃ. ৩৫২।

৫৬. *সহীহ মুসলিম* (কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০ খ্রি.), হাদিস নং-২৮৪৬, পৃ. ৮১০।

৫৭. সুনানে আবু দাউদ প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-৪৮৪৪, পৃ.৪১১।

৫৮. Mohd Abbas Abdul Razzak, "Globalization and Its Impact on Education and Culture", in the *World Journal of Islamic History and Civilization*, 1 (1), 2011, IDOSI Publications, ISSN 2225-0883, p. 59.

৫৯. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১২।

সমাজে দৃশ্যমান অনাচারের অন্যতম কারণ হলো সমাজের মানুষের মাঝে অসমতা। নিজেকে অন্যের তুলনায় সবল ভাবা, বড় জ্ঞান করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করার কুফল মারাত্মক। ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে সবল ও শ্রেষ্ঠ মনে করায় তাদের সাথে ওঠা-বসা, পানাহার ও কথা বলাকে নিজের জন্য মর্যাদার খেলাপ মনে করে। এটা সামাজিক হৃদ্যতা ও সহযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক শত্রুতা ও বৈষম্যের ভীতকে মজবুত করে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ একে অন্যের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করে। আত্মঅহংকারী মানুষেরা অন্যদের নিম্নস্তরের জীব বলে মনে করে। উঁচু-নিচু বোধ থেকেই তৈরি হয় ঘৃণা-অবজ্ঞা ও বৈষম্য করার মানসিকতা। ইসলাম পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ইসলামের শিক্ষা হলো বংশ-বর্ণ-ভাষা এবং দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান।[৬০]

একটি সমাজে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, বংশ বা জাতি কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না। অন্যের তুলনায় কারো মর্যাদা কম নয়। ইসলামে সম-অধিকারের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সে-ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।"[৬১] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ অর্থাৎ, "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।"[৬২] সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং সকল মানুষ সমান। মুসলমানগণ পরস্পর ভাইস্বরূপ।

ইসলাম ধর্ম সামাজিক সাম্য ও মানুষের মধ্যে সমমর্যাদা প্রদানে বিশ্বাসী একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম বর্ণ প্রথায় বিশ্বাস করে না বা কাউকে বৈসাদৃশ্যের চোখেও দেখে না। ইসলাম মনে করে যে মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাই সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে সমান অধিকারের দাবি রাখে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ "নিশ্চয়ই বান্দারা প্রত্যেকে ভাই ভাই।"[৬৩] বিশ্বভ্রাতৃত্বের পতাকার ছায়াতল থেকে কোনো মানুষকে বঞ্চিত করা ইসলামের সাম্য নীতিকে অস্বীকার করার নামান্তর। এছাড়া সমগ্র মানবজাতি একই আদম (আ.)-এর সন্তান হওয়ায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সামাজিকভাবে ভাই ভাই হয়ে যায়।"[৬৪]

---

৬০. Ziauddin Ahmad, "Concept of Islamic State in Modern World", Pakistan Horizon: Pakistan Institute of International Affairs, Vol. 38, Fourth Quarter 1985, p. 79.

৬১. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, আয়াত : ১৩।

৬২. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজরাত, আয়াত : ১০।

৬৩. সুনানে আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১৫০৮, পৃ. ৬৫২।

৬৪. আবদুল খালেক, "মদীনার ভ্রাতৃসংঘ ও সর্বাত্মক বিপ্লব" *বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১০৪।

ঝ. ইসলামের দৃষ্টিতে সুন্দর নাম রাখা:

নামেও মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও নামের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। সুশ্রী শিশুদেরকে সবাই আদর করতে চায়। কিন্তু যখন তার নাম জিজ্ঞেস করা হয় এবং যে কোনো অর্থহীন এবং বিশ্রী নাম বলে তখন স্বাভাবিকভাবেই মনটা দমে যায়। এ সময় মন চায় যে, আহা! তার নামও যদি তার সুশ্রীর মতো হতো। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সুন্দর নাম অনুভূতি এবং আবেগের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে কাউকে যদি বিশ্রী এবং খারাপ নামে সম্বোধন করা হয় তাহলে তার ক্রোধমূলক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। খারাপ নামে সম্বোধন করায় তার খারাপ আবেগই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে যদি কোনো কাউকে সুন্দর নামে ডাকা হয় তাহলে সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ভালোবাসার আবেগে জবাবও দিয়ে থাকে। নিজের ভালো নাম শুনে সে নিজেকে মর্যাদাবান বলে মনে করে।

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয়ের জন্য নামের উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যেক নাম বিশেষ অর্থ এবং সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। মহান আল্লাহ মানুষের নাম দিয়েছেন 'আদম ও ইনসান'-যা এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। শুধু পরিচয় ও শনাক্তকরাই নামকরণের আসল উদ্দেশ্য নয় বরং সুন্দর ও ইসলামী ভাবধারা সংবলিত নামকরণ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বলতে এমন এক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় যার দ্বারা বিশ্বের প্রতিটি জাতি তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। সেজন্য প্রত্যেক মুসলমানের কথা-বার্তা, চাল-চলন, সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন একান্ত অপরিহার্য। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সন্তানদের ইসলামী নাম রাখা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে সর্বপ্রথম প্রত্যেক জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, অতঃপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[৬৫] মানুষের নামে থাকে তার জাতির নিশানা। নামকরণের দ্বারা মানুষের আকিদা, চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার বিকাশ ঘটে। সুন্দর নামের গুরুত্ব প্রদানে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাকবে; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।"[৬৬]

এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ

৬৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ৩১।
৬৬. আল-কুরআন, সূরা আল-'আরাফ, আয়াত : ১৮০।

অর্থাৎ, "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, পিতার উপর নবজাতকের হক তার জন্য সুন্দর নাম রাখা।"[৬৭]

মানুষের জীবনে নামের বিরাট প্রভাব রয়েছে। সন্তানের জন্য একটি সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতামাতার গুরুদায়িত্ব। যাতে এ নামের প্রভাব পরবর্তী জীবনে সন্তানের স্বভাব-চরিত্রে শুচি-শুভ্রতা ফুটে উঠে। এ ব্যাপারে হাদীস শরিফে এসেছে,

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ

অর্থাৎ, হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা হাযন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করেন তোমার নাম কি? তিনি বললেন, আমার নাম হাযন (শক্ত)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, না বরং তোমার নাম হওয়া উচিত 'সাহলো' (সহজ সরল)। তিনি উত্তরে বললেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করব না। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা.) বলেন, এরপর আমাদের পরিবারে পরবর্তীকালে কঠিন অবস্থা ও পেরেশানি থাকত।"[৬৮]

ঞ. সহমর্মিতা ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবন-যাপন:

ইসলাম উদারনীতিতে বিশ্বাস করে। ইসলাম ব্যক্তিস্বার্থকে যৌথ স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত করে সমাজে অবস্থিত একে অপরের খোঁজ-খবর ও তাদের জান-মালের নিরাপত্তাদানের মাধ্যমে সাহায্য ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবন-যাপন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ, "মু'মিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে; এদেরকে আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৬৯] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

অর্থাৎ, "আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না।"[৭০] সাহায্য প্রার্থীকে সহযোগিতা কর। আর দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম।

---

৬৭. আবু বকর আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান* (ভারত: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৩ খ্রি.), হাদিস নং- ৮৩০০, পৃ. ১৩৭।

৬৮. *সহীহুল বুখারী*, ১৫তম খণ্ড (বৈরূত: দারু তুকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং- ৬১৯৩, পৃ. ৪৫১।

৬৯. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ৭১।

৭০. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ২৬।

হাদিস শরিফেও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ

অর্থাৎ, "তোমাদের ভাইয়ের দিকে হাসিমুখে তাকানো তোমার জন্য একটি সদকা বা পুণ্যের কাজ। কাউকেও কোনো ভালো কাজের আদেশ করা একটি সদকা, মন্দ কাজে নিষেধ করা সদকা। পথে প্রান্তরে পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দেওয়া সদকা; অন্ধকে পথ চলতে সাহায্য করা সদকা।"[৭১] তিনি অন্যত্র বলেন, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ "কোনো বান্দা যখন তার ভাইয়ের সাহায্যে ব্যস্ত থাকে আল্লাহ্ও তখন সে বান্দার সাহায্যে ব্যস্ত থাকেন।"[৭২] রাসুল (সা.) আরও বলেছেন, لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ "যে ব্যক্তি মানুষের ওপর দয়া করে না, তার ওপর আল্লাহও দয়া করেন না।"[৭৩]

ট. পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও আচার-আচরণ নিশ্চিতকরণ:

সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণে মানুষের প্রতি মানুষের কিংবা অন্য সৃষ্টি জগতের প্রতি সাধারণ কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে। প্রত্যেকেরই উচিত নিজ নিজ কর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করা। যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে মানুষের স্তরভেদে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ শান্তিময়, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে, দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নানা দুর্ভোগ ও খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেক মু'মিনের উচিত সদা স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকা। এজন্য মু'মিনদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا "তারা কর্তব্য পালন করে এবং এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিন বিপত্তি হবে ব্যাপক।"[৭৪] এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের নেতা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তার দায়িত্ব সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের উপর দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৭৫] রাসুল (সা.) এক মুসলিমের ওপর অন্য

৭১. মুহাম্মদ ইবন ঈসা আবু ঈসা আত-তিরমিযী আস-সালমী, *আস-সুনান*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদিস, ২০১০ খ্রি.), হাদিস নং-১৯৫৬, পৃ. ১১২।

৭২. *সহীহ মুসলিম*, (কায়রো: দারু ইবনে হাযম, ২০১০ খ্রি.), হাদিস নং-২৬৯৯, পৃ. ৭৭০।

৭৩. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, ১৮তম খণ্ড, হাদিস নং-৭৩৭৬, পৃ.৩৭৮।

৭৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ইনসান, আয়াত : ৭।

৭৫. সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড হাদিস নং- ৮৯৩, পৃ. ৩০৫।

মুসলিমের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলেন, حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ, وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ وَإِنْ دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا غَابَ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ "একজন মু'মিনের ওপর আরেক মু'মিনের ছয়টি কর্তব্য। ১. যখন সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম দিবে, হাঁচি দিলে তার উত্তর দিবে, তাকে ডাক বা আহবান করলে তার ডাকে সাড়া দিবে, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তার জানাযায় উপস্থিত হবে, ৬. আর যখন সে অনুপস্থিত থাকবে, তখন তার জন্য মঙ্গল কামনা করবে।"[৭৬]

এছাড়া পারস্পরিক আচার-আচরণের মধ্যেও মর্যাদার বিষয়টি নিহিত। যার ফলে ইসলাম এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেমন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী; কিয়ামতের দিন সে হবে আমার কাছে অধিক প্রিয় ও নিকটবর্তী।"[৭৭]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, সাধারণভাবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলেও এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী চিন্তা ও কর্মব্যবস্থা সমাজবদ্ধ জীবনের কর্তৃত্বশূন্য নয়। বরং সেখানে তার গুরুত্ব ও মর্যাদাসমূহের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর এ পর্যালোচনা যদি আরো ব্যাপক হয়, তাহলে এ বিষয়টি সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। তখন দেখা যাবে যে, এ ব্যবস্থায় সমাজবদ্ধ জীবন এমন অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করেছে, যার কোনো নজির পাওয়া যাবে না। সম্ভাব্য সকল দিক দিয়েই এ গুরুত্বের ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক কার্য পদ্ধতি কার্যকরী করার যতটুকু সুযোগ থাকতে পারে তার সবটুকুতেই ইসলাম একে কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছে।

৭৬. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, হাদিস নং-৪২৭১, পৃ.২২।
৭৭. সুনানে তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং-২০১৮, পৃ.৩৭০।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন[১]

Abstract : *Islam is an organized religion which provides complete code of life through a proper social and moral system. We see prophet Muhammad (SAW) providing practical guidelines for a stable and comprehensive society. The madani life of Muhammad (SAW) is a best and practical example of Islamic executive fairness, equality and social security.*

The paper deal with the concept of topic, significance, objectives and statements of disposing role of the prophet Muhammad (SAW) in establishing a balanced society. These teachings and concepts show that Islam is not only the religion of theories but has governance in the administration pattern and training to manage a stable and sensitive system of state which highlights the importance of highly managed system of Islam.

Human being is a social animal prepare to live with society. Everyone in the society has some rules to play his responsibility to achieve the common goals of society. In order to organize these activities there should be a stable and affective managed system.

The people of the whole world has observed that the Muslims influenced with the help of their managerial abilities while spreading peace, high-level education, most recent resilient army, practicable laws etc.

Keyword: *Stable society, Cooperation, System, Discipline, Leadership. Equality, Social security.*

---

১. পিএইচ.ডি গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ভূমিকা: শৃঙ্খলা নিয়মতান্ত্রিক ও উপলব্ধিমূলক একটি বিষয়; যা সবসময় ও সকল কাজে যথাযথ গুরুত্ব ও ধারাবাহিকতা দাবি করে। এই শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আমরা মহাবিশ্বের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেও দেখতে পাই। এতে মানবজাতির জন্য চিন্তার উপাদান রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ও সুসংহত এক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন। যাতে কোনও প্রকার অসামঞ্জস্য কিংবা বৈপরিত্য নেই। পৃথিবীর বহু বিশালকায় বস্তু থেকে নিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পর্যন্ত সবকিছুতেই শৃঙ্খলা ও সংহতি রয়েছে। প্রতিটি জিনিসই এই নিয়মের অধীনে চলে। মহাবিশ্বের এই কাঠামোও সেই শৃঙ্খলা ও সংহতি মেনেই দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর দিকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এই বিশাল পৃথিবী কী নিপুণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এক ঋতুর সাথে অন্য ঋতুর মিল নেই। দিন কখনও রাত হয় না। অথবা রাতও দিন হয় না। চন্দ্র নক্ষত্রের পথে আবর্তন করে না। কিংবা খড়কুটোর মধ্যে ফুল ফোটে না। কিন্তু আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি-মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কী করে এমনটা সম্ভব হলো যে, এই বিশাল সৌরপথ, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, উদ্ভিদ, জড়বস্তু, পানি, বাতাস সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হয়ে চলছে? এমনকি, বাতাসের তীব্রতা, নদী ও ঝরনার বহমানতা, সাগরের ঔদ্ধত্য কিংবা পাহাড়ের লাভা উদগীরণ সবকিছুতেই প্রকৃতির সুশৃঙ্খলা ও সুসংহতির উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

''যিনি স্তর-বিন্যাস করে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। তুমি রহমানের সৃষ্টিতে কোনও প্রকার অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। অতএব চোখ ফিরিয়ে দেখো, কোনও ত্রুটি কি দেখতে পাও? অনন্তর বারবার চোখ ফিরিয়ে দেখো; তোমার দৃষ্টি অবনমিত ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।''[১]

মহাবিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা অথবা মানবজাতির অস্তিত্ব সবই শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নানা রকম চিন্তা ও স্বভাবের মানবসমাজে সামঞ্জস্য ও সমতা বিধান করে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করা হয়তো উচ্চমার্গীয় চরিত্র, আদর্শ ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে সম্ভব। কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য হলো, ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির বাস্তব সমন্বয়ে এক স্থিতিশীল ও টেকসই সমাজ গঠনের প্রতি জোর দেয়। নবীজি (সা.)-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজ তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রবন্ধে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের শৃঙ্খলা ও সংহতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে।

শৃঙ্খলা তাৎপর্য এবং মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা ও সংহতির ক্ষেত্রে ইসলামের নিয়মতান্ত্রিকতা অত্যন্ত সংবেদনশীল। আরবিতে শৃঙ্খলা বোঝাতে نظم (নায্ম) শব্দ ব্যবহার হয়। প্রথমে আমরা শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করছি। আভিধানিকভাবে 'নায্ম' অর্থ এমন বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা, যাতে শৃঙ্খলা এবং সংহতি বিদ্যমান থাকে। যেমন ড. আহমাদ মুখতার আবদুল হামিদ বলেছেন:

نظَم الأشياءَ : কোনও বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মেলানো। نظَم اللآلئَ: মোতি সাজানো। ناظمُ عقود : মালা গেঁথে হার প্রস্তুতকারী। نظَم أمرَه: কোনও কাজ সম্পাদন করা বা কোনও বিষয় সংহত করা। نظَم شِعْرًا: অন্ত্যমিলপূর্ণ এবং ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করা, প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করা।[২]

কোনও বস্তু কিংবা কাজে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা থাকলে তখন বলা হয় উক্ত বস্তু কিংবা কাজে 'নিজাম' তথা শৃঙ্খলা ও সংহতি রয়েছে। অনুরূপ 'নিজাম' সেই সুতোকেও বলা হয়, যার সাথে মোতি জড়ানো হয়। যেমন মুরতাজা জোবাইদি বলেছেন: كل خيط ينظم به لؤلؤ أو نحوه

যে সুতোয় মোতি কিংবা অন্যকিছু জড়ানো হয়, তাকে নিজাম বলা হয়।[৩]

উল্লিখিত অর্থগুলোর আলোকে বলা যায়, নিজাম একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ কোনও কিছু এক জায়গায় গাঁথা বা সামঞ্জস্যসাধন করা। অর্থগত দিক থেকে শব্দটির উদ্দেশ্য হলো, কিছু শব্দ বা মানুষকে এমন একই ধাঁচে সাজানো, যাতে এসব শব্দ বা মানুষ একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং এদের মিল থেকে কোনও না কোনও ফলাফল বের হয়।

অনুরূপ বিন্যস্ত ও সুগঠিত কাজকে মহান কাজ বলা হয়। ইমাম জামাখশারি (রাহ.) বলেন:

وتقول: هذه أمور عظام، لو كان لها نظام.

তুমি বলতে পার : যদি কোনও কাজে নিজাম তথা শৃঙ্খলা থাকে, তখন বলা হয়, এগুলো মহতি কাজ।[৪]

'নায্ম'-এর পারিভাষিক অর্থ

ইবনু মানজুর তাঁর লিসানুল আরব-এ বলেন:

وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض، فقد نظمته.

''যে বস্তুকে তুমি অন্যকিছুর সাথে মেলাও অথবা যুক্ত করো, তখন বলা হবে উক্ত জিনিসটি তুমি বিন্যস্ত করেছ।''[৫]

অতএব পরিভাষায় 'নায্ম' অর্থ বিন্যাস ও মিলন। এই সংজ্ঞার আলোকে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তথা জনসাধারণের মাঝে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে তাদেরকে এক প্ল্যাটফর্ম কিংবা মতাদর্শে একতাবদ্ধ করাকে 'নায্ম' বা 'তানযিম' বলা হয়।

অনুরূপভাবে নাযম তথা শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী দলকে (Management) বলা হয়। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে (Management) লেখা হয়েছে:

A-The group of people who organize or control something.
B-The controle or management of something.
ক. মানুষের এমন দল, যারা কোনও কিছুর ব্যবস্থাপনা করে কিংবা নিয়ন্ত্রণ করে।
খ. কোনও কিছুর ব্যবস্থাপনা করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করা।[৬]

'Management'-এর জন্য ইংরেজিতে নিম্নবর্ণিত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়:

To be organized, arranged, put in order; to be well-arranged, well-ordered, well-organized, in good order, orderly, systematic.[৭]

আরবিতে ব্যবহার হয় 'إدارة' (ইদারাহ)। এটি মূলত: একটি ক্রিয়া। যেমন বলা হয়: إدارة المدرسة তথা বিদ্যালয় পরিচালনা, إدارة الشركة বা কোম্পানি পরিচালনা ও إدارة الكلية তথা ফ্যাকাল্টি পরিচালনা ইত্যাদি।[৮]

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু শৃঙ্খলায় ও সংহতিতে নিজ নিজ কাজ আঞ্জাম দিয়ে মানবজাতিকে শৃঙ্খলার পথনির্দেশ করছে। প্রজ্ঞাময় কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এ মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মনজিল, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে ভেসে চলে"।[৯]

মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহাবিশ্বের সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি উদাসীন হন না। কেননা, তাঁর তো তন্দ্রা নেই, আর না আছে ঘুম:

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনও সত্য ইলাহ নেই । তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও স্পর্শ করতে পারে না। [সুরা বাকারা: ২৫৫]

এখানে মানুষের জন্য ভাবনার বিষয় হলো তারা যেন নিজ কাজকর্মের ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পর্যবেক্ষণ করে এবং শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতি লক্ষ্য রাখে, যাতে তাদের কাজকর্ম শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়। অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে এক পূর্ণ জীবনব্যবস্থা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষের সফলতা ও কামিয়াবি নিশ্চিত করা যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন:

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে"। [সুরা তাওবা: ৩৩]

বলা বাহুল্য, নবীজি (সা.) সত্য দ্বীনকে কেবল বাস্তবায়নই করেননি, বরং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার লক্ষ্যে এক সমন্বিত সামাজিক পরামর্শ-পদ্ধতিও প্রবর্তন করেছেন।

যাতে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও সংহতির যথার্থতায় সামান্যতম ঘাটতিও না থাকে এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা এই পরামর্শ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

মানব জীবনে শৃঙ্খলা ও সংহতির গুরুত্ব

ইসলাম মানবজীবনে শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও বছরে এক মাস রোযার প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম, কিংবা হজের আধ্যাত্মিক সমাবেশ থেকে তা সহজে অনুমান করা যায় যে, সকল মানুষই একজন নেতার অধীনে শৃঙ্খলা ও সংহতির অনুসরণ করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতি যত্নশীল করার উল্লেখযোগ্য দাওয়াতি মাধ্যম।

বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনে শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রয়োজন ব্যাপক ও তীব্র। যুগচাহিদাও তাই বলে। পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীগুলো আমাদেরকে শাসন করছে কেবল তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি রয়েছে বলেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলা ও সংহতি নেই। আমরা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত। তাই শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু নয়, পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকেও শৃঙ্খলা ও সংহতির আবশ্যকীয়তা রয়েছে। উপরন্তু, শৃঙ্খলা ও সংহতিকে সকল সমস্যার সমাধান কিংবা সফলতার চাবিকাঠিও বলা যায়। যেমন আল্লামা ইকবাল এ চাবিকাঠির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন:

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

ব্যক্তি জাতির সাথে সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।
সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ আছে, সমুদ্রের বাইরে কিছুই নেই।[১০]

শৃঙ্খলা ও সংহতি মুসলিম মিল্লাতের একতা ও ঐক্যের প্রধান মাধ্যম। তাই তারা যেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হয়ে উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি করতে সতত সচেষ্ট থাকে।

শৃঙ্খলার প্রকারভেদ

শৃঙ্খলা দুই প্রকার: ১. প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও ২. শরিয়তের শৃঙ্খলা। আবার প্রশাসনিক শৃঙ্খলার দুই প্রকার রয়েছে। প্রথমত এমন প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংহতি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তা শরিয়তের সীমা বা হদ অতিক্রম করে না। এ প্রকারের শৃঙ্খলা মুবাহ তথা বৈধ। খোলাফায়ে রাশেদীন এমনতর শৃঙ্খলাই প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তা প্রয়োগ করেছেন। আর যে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা শরিয়তসিদ্ধ নয়, তার মাধ্যমে রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা যেমন কায়েম হওয়া সম্ভব নয়, এমন শৃঙ্খলার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনাও ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে বৈধ নয়। উপরন্তু, এমন শৃঙ্খলা বাস্তবায়ন করা আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন। আল্লামা শানকিতি (রাহ.) বলেছেন:

"আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর প্রণীত শাসনব্যবস্থার বিপরীত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাথে কুফরি করা...। অতএব, মানুষের জানমাল, ধনসম্পদ, মর্যাদা,

বংশ-গোত্র, বোধবুদ্ধি এবং দীনের ক্ষেত্রে শরিয়ত-বিরোধী শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ করা আসমান ও জমিনের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করার নামান্তর। যিনি তাবৎ সৃষ্টিজগতে প্রাণসঞ্চার করেছেন, তাঁর প্রবর্তিত ঐশী বিধানের সাথে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন। অথচ তিনিই তাঁর সৃষ্টিজগতের ভালোমন্দের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। তাঁর সাথে অন্য কেউ বিধান প্রণেতা হওয়া থেকে তিনি সুমহান পবিত্র।[১১]

ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে এক সুসংহত ও সুষম সমাজ গঠনের প্রতি জোর দেয়। হুজুর (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যিনি নানান চিন্তার ও মেজাজের মানুষের সমাজে সর্বোত সমতা বিধান করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আইন ও শাসনের কার্যকারিতা বাস্তবায়ন করেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতায় শৃঙ্খলা ও সংহতি

যে রাষ্ট্র কিংবা সমাজে নাগরিকদের মাঝে শৃঙ্খলা ও সংহতির পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য থাকে, তারা বাতিল ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয় না। উপরন্তু অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যায়। অপরদিকে যে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ শৃঙ্খলা-সংহতির অনুগত ও পরস্পর একতাবদ্ধ হয়, তারা বাতিল ও অশুভ শক্তির বহুমুখী ষড়যন্ত্র সত্বেও টিকে থাকে। এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

"তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"।[১২]

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য বিশাল এক অনুগ্রহ। এর ফলে তাদের মধ্যকার শত্রুতা বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। একে অপরের মাঝে আত্মার বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে জনসাধারণকে শৃঙ্খলা ও সংহতির অনুগত করতে এবং এটা স্থির রাখতে অবশ্যই কুরআন সুন্নাহর নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে। যাতে তারা শান্তি কিংবা যুদ্ধ-সকল পরিবেশেই অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সিসাঢালা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা সিসাঢালা প্রাচীর হয়ে তাঁর পথে লড়াই করে"।[১৩]

আজ আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। কেননা, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাকে পরাহত করে রেখেছে। তাই শান্তি ও নিরাপত্তাকে স্বাভাবিকীকরণের জন্য শৃঙ্খলা-সংহতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার লক্ষ্যে দেশ-প্রেম, জিহাদী-চেতনা ও দূরদর্শিতা জাগ্রত করা এবং ইসলামের সর্বব্যাপী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। এই সূক্ষ্ম বিষয়টিই নবীজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলেন:

عليكم بالجماعةِ وإيَّاكم والفُرقَةَ فإنَّ الشيطانَ معَ الواحدِ وهو منَ الاثنَينِ أبعَدُ مَن أراد بحبوحةَ الجنةِ فلْيلزَمِ الجماعةَ.

"তোমরা অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর জামায়াত আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারীর সাথে শয়তান থাকে। আর দুইজন থেকে সে দূরে থাকে। যে জান্নাতের উত্তম জায়গা আকাংখা করে, সে যেন মুসলিম সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে"।[১৪]

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শৃঙ্খলা ও সংহতির নীতিমালা

শৃঙ্খলা ও সংহতি শেখার এবং শেখানোর বিষয় হলো বিশেষ কোনও কাজের শৃঙ্খলা ও সংহতি শিখতে হলে তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রকৃত অর্থে উপকারী নাগরিক হিসেবে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। জনসাধারণকে যে সকল নীতিমালার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতি আনুগত্যশীল করা যায়, তার মধ্যে প্রধানত হল শরীয়তে তার নীতিমালা :

এক. শরিয়তের বিধিবিধানের অনুসরণ এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

মহাবিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা মানুষকে শৃঙ্খলা ও সংহতির ব্যাপারে ভাবতে শেখায়। মহাবিশ্ব যদি আল্লাহ সাজানো প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হতে পারে, মানুষ কেন শরিয়তের বিধিবিধানের অনুগত হবে না ? ফরয নামাজ আদায়ে কষ্ট সহ্য করা, আমলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও দিন দিন বৃদ্ধি করা মানব জীবনকে সৌভাগ্যবান করে তোলে। অনুরূপ প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, সংহতি ও নিয়মানুবর্তিতার ফলে তা পূর্ণতা ও যথার্থতা লাভ করে। আর তার বিপরীত করা হলে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে মাহরূম হয় এবং তার রিজিক সংকীর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

"এবং যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে ওঠাব"।[১৫]

ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যেন সহানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধানের আনুগত্য মেনে নিই। আল্লামা ইকবাল বলেছেন:

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الٰہی کا ہے پابند

''উদ্ভিদ ও জড়বস্তু সবই কুদরতের অনুগত। আর মুমিন কেবল আহকামে ইলাহির অনুগত হয়।''[১৬]

শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আইন বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। ইসলামে আইন এমন নীতিমালার নাম, যা সমাজের স্থিতিশীলতা ঠিক রাখার জন্য অপরিহার্য। ড. ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শি বলেন:

"পাশ্চাত্যে আইন হলো সমাজের এলিটশ্রেণির ইচ্ছাধীন। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে আইন আল্লাহর সন্তুষ্টির অধীন"।[১৭]

প্রভুত হিদায়াত ও শরিয়তের আনুগত্যেই মানুষ সকল ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

''অতএব যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করে, তাদের না কোনও ভয় থাকবে, আর না তারা কোনও কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।'' [সুরা বাকারা: ৩৮]

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনু কাসির (রাহ.) হজরত ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন,

فَلا يَضِلُّ فِيْ الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰى فِيْ الْآخِرَةِ.

''তারা দুনিয়াতে বিপথগামী হবে না এবং আখেরাতেও ব্যর্থ হবে না।[১৮]''

তাই শরিয়তের বিধিবিধানের অনুসরণে কেবল আখেরাতের লাভই নয়; বরং দুনিয়াবি উপকারও রয়েছে। আর তা হলো রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও সংহতি কায়েম করা, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলার সাথে নিরাপত্তা, শান্তি ও রিযিকে প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ

''যদি তারা তাওরাত এবং ইনজিল এবং তাদের রবের তরফে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করত; তবে তারা তাদের ওপর থেকেও খাবার গ্রহণ করতো এবং পায়ের নিচ থেকেও আহার্য পেত।''[১৯]

মক্কার কুরাইশরা যখন নিরাপত্তাহীনতা ও অরাজকতার শিকার ছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

''অতএব তারা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন এবং ভয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন।'' [সুরা কুরাইশ: ৩-৪]

দুই. সামাজিকতাবোধ এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

আমরা মুসলমান অথচ আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতির ঘাটতি ব্যাপক। জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, আল্লাহর ভয় ও বিবেক জাগ্রত করা। আল্লামা ইকবাল বলেছেন:

ربطِ وضبطِ ملت بیضا ہے مشرق کی نجات

ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر

প্রাচ্যের মুসলমানদের এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির একমাত্র সমাধান জাতীয় ঐক্য ও একতার মধ্যেই। কিন্তু আফসোস, এশিয়ার মুসলমানরা এই ব্যাপারে এখনও উদাসীন, বেখবর।[২০]

তাই তাদের পুনর্জাগরণ মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার অরাজকতার একমাত্র প্রতিকার এবং বর্তমান সময়ে সীমাহীন অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা নবীজি (সা.)-কে এই সৌভাগ্যের পরশমণি দিয়েই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

''এবং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। আর বিভেদ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ো না। যদি লিপ্ত হও তবে তোমরা ব্যর্থ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের পাশে আছেন।''[২১]

তিন. শরিয়তের বিধিনিষেধ বাস্তবায়ন এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তায়ালা শরিয়তের বিধিনিষেধ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। যা আল্লাহর সন্তুষ্টি পালনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিকতার জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। এই নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে সর্বপ্রকার অরাজকতা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস প্রতিকার করা যায়। এসব ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

''হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! কিসাসের (প্রাণদণ্ড) মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে; যাতে তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পার।'' [সুরা বাকারা: ১৭৯]

শৃঙ্খলা ও সংহতির বিরুদ্ধাচরণ, শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্টকরণ এবং ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ইসলামে কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

''যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে; তাদের শাস্তি হলো হয়তো তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে। কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে। অথবা দেশান্তরিত করা হবে। এ হলো তাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা। আর আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। [সুরা মায়িদা: ৩৩]

বর্তমান সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অব্যবস্থাপনা, অরাজকতা ও দুর্নীতির সবচেয়ে বড় কারণ শরিয়তের বিধিনিষেধ বাস্তবায়ন না করা। যদি শরিয়তের বিধিনিষেধ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তবে অরাজকতা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। সর্বোপরি শৃঙ্খলা ও সংহতি কায়েম হবে।

চার. ইবাদত এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

ইসলামে ইবাদত প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা রক্ষার এমন এক মাধ্যম, অন্য কোনও ধর্মে যা কল্পনাই করা যায় না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা বছরে এক মাসের রোযা কিংবা হজের নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড এবং আধ্যাত্মিক সমাবেশ ও ইত্যকার বিষয়গুলো প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং জনসাধারণকে এক প্ল্যাটফরমে একত্র করার উল্লেখযোগ্য দাওয়াতি মাধ্যম। তাই প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রে ইবাদতের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে জনসাধারণকে শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। রাসুল (সা.) শৃঙ্খলা-সংহতির প্রতি গুরুত্বারোপ করে এভাবে বলেছেন:

قال : أقِيموا صفوفَكم، ثلاثًا، واللهِ لَتُقِيمُنَّ صفوفَكم أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بينَ قلوبِكم.

''নবীজি (সা.) তিনবার বলেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক করো। আল্লাহর শপথ, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক করো; অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তর সমূহের মধ্যে বৈপরিত্য সৃষ্টি করবেন।''[২২] আমলি জীবনে এই আধ্যাত্মিক অনুশাসন মান্য না করার ফলে আমাদের জীবনেই আমরা অধ:পতন ও অবনতি দেখতে পাচ্ছি।

পাঁচ. সর্বপ্রকার কৌলিন্য বিলোপ এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

ইসলাম বর্ণ, গোত্র তথা কোনও শ্রেষ্ঠত্বেই বিশ্বাস করে না। ধনসম্পদ, টাকা-পয়সাকেও তার পথে প্রতিবন্ধক হতে দেয় না। তাই উলুল আমর বা শাসকশ্রেণিকে বিশেষভাবে এ দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, যাতে রাষ্ট্রে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব বিলোপ করা হয়। তবে শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।

বস্তুত তোমাদের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত ও সর্বদর্শী"।[২৩]

বলা বাহুল্য, টেকসই শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য এই নীতিমালা অত্যন্ত কার্যকর এবং অপরিহার্য। বর্ণ, গোত্র ও অন্যান্য বিশেষত্বের মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও সংহতি বাধাগ্রস্ত হয়। এ জন্যই ইসলাম মানুষের স্বভাবকে জাগ্রত করেছে। নবীজি (সা.) ও উম্মতকে এটিই বুঝিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেছেন:

لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأبيضَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أبيضَ - : إلَّا بالتَّقوَى.

"জেনে রাখো, অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গেরও কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদন্ড তাকওয়া ও আল্লাহভীতি"।[২৪]

ছয়. দুর্নীতি ও ইসলামী শিক্ষা

ইসলাম একটি সুসংহত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। যা সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখার শিক্ষা দেয় এবং সকল দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার নিন্দা করে। ইসলাম যে সময় পৃথিবীতে এসেছে, তখন আরবে দুর্নীতি ও অরাজকতার জয় জয়কার ছিল। রাসুল (সা.) ইসলামী শিক্ষার আলোকে সেই জাহেলি সমাজকে এমন শ্রেষ্ঠ সমাজ হিসেবে গড়ে তোলেন, পৃথিবীতে যার উদাহরণ আর নেই। এমনকি, যুদ্ধের মতো নাজুক পরিস্থিতিতেও নবীজি (সা.) ও তাঁর সাহাবিরা শৃঙ্খলা ও সংহতির সর্বোচ্চ মাত্রা প্রদর্শন করেছেন।

নবীজি (সা.) এক হাদিসে বলেন:

إن تَفَرُّقَكم في هذه الشِّعاب والأَوْدِية إنما ذلكم من الشيطان

''এভাবে তোমাদের উপত্যকা-উপত্যকায় ও ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া শয়তানের কাজ।''[২৫]

ইসলাম পূর্ব আরবে নিয়ম ছিল যে, তারা যুদ্ধের অভিযানে বের হলে পথে যা পেত তাই নষ্ট করত। যেখানেই অবস্থান করত, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। তাদের কারণে সাধারণ মানুষের পথ চলাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। এরপর নবীজি (সা.) তাদেরকে এমন শিক্ষা দেন, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত বিরল।[২৬]

আমাদের আশপাশের অনেক কিছুই চেতনে-অবচেতনে আমাদেরকে শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতি ভাবতে বাধ্য করে। যেমন ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক জ্যামের শিকার প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবেন যে, কোনও একজন মানুষ বা কিছু মানুষের ভুলের ফলেই শত শত গাড়ি এবং যাত্রীরা সময় নষ্ট হওয়ায় ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। তারা অনর্থক নিজেরাই নিজেদেরকে অভিশাপ দিচ্ছে। সাধারণত তারা এই অভিশাপ থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তির জন্য যে সমাধান খুঁজবে, তা শৃঙ্খলা-সংহতি ছাড়া আর কিছু নয়।

ট্রাফিক জ্যামের ফল যাত্রীরা শুধু ভুগছে তাই না; বরং তা আরও অনেক মন্দ পরিণতিরও কারণ হতে পারে। ভোরে ট্রাফিক জ্যাম হলে সরকারি অফিস-আদালত এবং বাজারের কার্যক্রম একদিকে ব্যাহত হয়। অপরদিকে পুরো জীবনের চাকা অচল হয়ে যায়। এতে সে সকল গাড়িও আটকে যায়, যে সব গাড়িতে চিকিৎসক রোগী দেখতে যাচ্ছে। শিক্ষক পড়াতে যাচ্ছে। একজনের ডিউটি শেষ হওয়ার পর অন্য পাহারাদার ডিউটিতে যাচ্ছে। বা রোগীর কাছে কোনও ওষুধ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি। ট্রাফিক জ্যামের ফলে হতভাগ্য মানুষ অপেক্ষার শাস্তি ভোগ করে। এভাবে যে কোনও সময় অনাকাংখিত কোনও ঘটনা ঘটতে পারে। তাই বলা হয়, 'শৃঙ্খলা ও সংহতি মানে জীবনে সফলতা। আর বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম মানে জীবনে ধ্বংস'।[২৭]

সাত. গোয়েন্দা-কার্যক্রম এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

জনসাধারণের খবরা খবর রাখা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এর অর্থ তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করা নয়। যেমন আজকাল সরকারি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানগুলো জনসাধারণকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রাখে। যার ফলে জনগণের মধ্যে উদ্বেগ, শংকা এবং হিংসাত্মক মনোভাব তৈরি হয়। এটি শৃঙ্খলা ও সংহতির স্থিতিশীলতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এ থেকে ইসলাম কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। ইরশাদ হয়েছে: وَلَا تَجَسَّسُوا তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না।[২৮]

হে ইমানদারগণ! অধিক পরিমাণে ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, কিছু ধারণা গুনাহ। [সুরা হুজুরাত: ১২]

অনুরূপ রাসুল (সা.) ও নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যদি জনগণের গুপ্তচরবৃত্তি করো, তাহলে তাদের মধ্যে ভয় ও শংকা তৈরি হতে পারে। যার ফলে রাষ্ট্রে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি বলেন:

إنك إن اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المسلمين أفْسَدْتَهُم، أو كِدْتَ أن تُفْسِدَهُم

"তুমি যদি মানুষের ভেদ কিংবা দোষত্রুটি অন্বেষণ করো, তবে তুমি যেন তাদের ক্ষতি করলে অথবা তার উপক্রম হলে"।[২৯]

আট. নেতৃত্ব নির্বাচন এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

গোটা মানবেতিহাসে এমন কোনও বিপ্লব চোখে পড়বে না, যা অস্বাভাবিকভাবে কিংবা নেতৃত্ববিহীন সংঘটিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে এমনই নিষ্ঠাবান ও সহনশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন, যিনি শৃঙ্খলা ও সংহতির মাধ্যমে সকল পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করবেন, জনসাধারণকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হবেন এবং দেশ ও জাতিকে সর্বপ্রকার অসুবিধা থেকে মুক্ত করবেন। এমন নেতার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলি থাকা অপরিহার্য:

১. স্বনির্ভরতা
২. নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুকে স্বীয় স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা

৩. নেতার প্রতি জনগণের আস্থা
৪. জনগণের প্রতি নেতার আস্থা[৩০]

লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের পাশাপাশি স্বনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস এবং অন্যান্য গুণের সাথে শাসক ও জনগণের একে-অপরের প্রতি আস্থাশীল থাকলে তবেই শৃঙ্খলা ও সংহতি কায়েম থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের মধ্যে বিশেষভাবে যে সকল গুণ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য, আল্লামা ইকবাল তা এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

''অত:পর সত্যবাদিতা, ন্যায় ও বীরত্বের সবক গ্রহণ করো। তবেই পৃথিবীর নেতৃত্ব তোমার হাতে পরিচালিত হবে।''[৩১]

এক কবির অনুবাদে : শিক্ষা লও ন্যায় বিচার ধৈর্যের আর সততার; তোমাকেই নিতে হবে দুনিয়ার নেতৃত্বের ভার।

নয়. নেতৃত্ব ও গণযোগাযোগ

জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি জাগ্রত করার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব ও গণযোগাযোগ পরস্পর মজবুত হওয়া। যেন রাষ্ট্রের প্রতি জনগণ এমন সন্তুষ্ট থাকে যে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তারা সর্বোত সহযোগিতার পরিচয় দেয়। অপরদিকে রাষ্ট্রও জনসাধারণকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। শাসনক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকে। কাউকে নীচ জ্ঞান না করা হয়। যেমনটা ফিরাউন করেছে। কিংবা তাদেরকে শোষণ বা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুও না করা হয়। অন্যথায় একসময় তাদের মধ্যে ভালো মন্দ ও সত্যাসত্য পার্থক্য করার ক্ষমতাও বাকি থাকবে না। সকল গোত্র পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ফলে এক সময় তাদেরকে হীন, শোষিত ও পাপী জাতি হিসেবে স্মরণ করা হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

''অত:পর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।''[৩২]

ইসলামী বিধানাবলির সীমায় থেকে 'উলুল আমর' বা শাসকশ্রেণির আনুগত্য করতে কোনও অসুবিধা নেই। আর এভাবেই রাষ্ট্র তার জনসাধারণকে আইন শৃঙ্খলা অনুগত করার অসামান্য দায়িত্ব সহজে সম্পাদন করতে পারে। দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা থেকে একটি সমাজ তখনই মুক্তি পাবে, যখন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সমাজকে অধ:পতন ও মূর্খতার কবল থেকে মুক্ত করার এবং শৃঙ্খলা-সংহতি মান্য করার উদ্দীপনা জাগরুক থাকবে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের এই একতার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও সংহতিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় করা হলে একটি রাষ্ট্র

সফলতা ও সমৃদ্ধির শেখরে পৌঁছুতে পারে। পুরো সমাজ তখন এই হাদিসের মূর্ত প্রতিফলন ও জীবন্ত নমুনা হয়ে উঠবে :

مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ. مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى

''পারস্পরিক হৃদ্যতা, অনুগ্রহ ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে সকল মুমিনের উদাহরণ একটি দেহের মতো। যখন সেই দেহের একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন জ্বর ও অনিদ্রায় পুরো দেহ যন্ত্রণায় ভোগে।''[৩৩]

দশ. নেতার আনুগত্য এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) নবীজি (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে কী করব এবং কীভাবে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকব? উত্তরে নবী করীম (সা.) বলেন,

تلزم جماعة المسلمين وإمامه.

''মুসলমানদের জামায়াত এবং তাদের ইমামের তথা সাথে থাকবে।''[৩৪]

শৃঙ্খলা ও সংহতির মাধ্যমে সমাজে স্থিতিশীলতা তৈরি হয়। এর সবচেয়ে সহজ মাধ্যম রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য। শাসকের আনুগত্যের জন্য ইসলামী শিক্ষার নির্দেশ বেশ কৌশলপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

''আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় বা প্রশাসনিক নির্দেশদাতা তাদের আনুগত্য করো।'' [সুরা নিসা: ৫৯]

নবীজি (সা.) এ ক্ষেত্রে এই শিক্ষা দিয়েছেন:

مَن أطاعَنِي فقَدْ أطاعَ اللّهَ، ومَن عَصانِي فقَدْ عَصى اللّهَ، ومَن أطاعَ أمِيرِي فقَدْ أطاعَنِي، ومَن عَصى أمِيرِي فقَدْ عَصانِي.

''যে আমার অনুসরণ করে, সে যেন আল্লাহর অনুসরণ করে। আর যে আমার অবাধ্যতা করে, সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতা করে। এবং যে আমার আমিরের অনুসরণ করে, সে যেন আমার অনুসরণ করে। আর যে আমার আমিরের অবাধ্যতা করে, সে আমার অবাধ্যতা করে।''[৩৫]

অনুরূপ শৃঙ্খলা ও সংহতির বোধ জাগ্রত করার জন্য রাসুল (সা.) সাধারণ মানুষদেরকে তাদের ইমামের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

ولو استُعْمِلَ عليكم عبدٌ يقودُكم بكتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فاسمعوا له وأطيعوا.

''যদিও তোমাদের জন্য কোনও হাবশি দাসকে আমির নির্ধারণ করা হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে; তবে তার কথা শোনো এবং আনুগত্য করো।''[৩৬]

শৃঙ্খলা, সংহতি ও নিয়মতান্ত্রিকতা এই সকল বিষয় জনসাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এখতিয়ার করা হয়। রাসুল (সা.) এর শিক্ষা হলো দায়িত্ব এমন কাউকে না দেওয়া, যে দায়িত্ব কামনা করে। এমনটা হলে সে এই পদ তার ব্যক্তিস্বার্থে অথবা সাধারণ মানুষকে শোষণের জন্য ব্যবহার করতে পারে। কেননা, স্বার্থপরতার মতো বিষয়গুলোর কারণেই শৃঙ্খলা ও সংহতি বাধাগ্রস্ত হয়।

বর্তমান সময়ে আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ববিচারে সুসংহত হওয়া অতি আবশ্যক। কিন্তু এ সবকিছুর বাস্তবায়ন একজন ক্ষমতাবান নেতার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। আমাদের আশপাশে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। অধ্যক্ষবিহীন বা শৃঙ্খলা-সংহতিবিহীন কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল বা কলেজ একটি অকার্যর প্লাটফর্ম। অনুরূপ কমান্ডারবিহীন কিংবা অসংহত সেনাবাহিনীর লড়াই সফলতার মুখ দেখে না।

এগারো. ধর্মীয় শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব ও উপকার অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে সভ্য করার পাশাপাশি তার চরিত্র ও কর্মকাণ্ডকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। এমনকি, জীবনের বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ পথে চলার শৃঙ্খলা ও সংহতিবোধও তার মধ্যে জাগ্রত করে। অপরদিকে যে দ্বীন-ধর্ম শেখার ও বোঝার ধার ধারে না, সে কী করেই বা দ্বীনের ওপর দৃঢ়ভাবে থাকবে? সে তো তার দ্বীনই চেনে না। কুরআন কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

''বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনও এক হতে পারে? নিশ্চয়ই উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান।'' [সুরা জুমার: ৯]

মানুষ যে ধরনের শিক্ষা অর্জন করে, তার মন-মগজে তা গেঁথে যায়। ফলে তার কাজকর্মে ও চলাফেরায় তাই ফুটে ওঠে। এ জন্যই রাসুল (সা.) সাহাবিদের মাঝে দীনের ইলম এবং বুঝ সৃষ্টি করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষার ফলেই সাহাবিদের জীবনে উজ্জ্বল শৃঙ্খলা ও সংহতি ফুটে উঠেছে।

বারো. রাষ্ট্রীয় আইন ও অধ্যাদেশ এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

ইসলামে ল' অ্যান্ড অর্ডার রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। ল' অ্যান্ড অর্ডারের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সাধন হয়। এর জন্য কখনও কঠোরতারও প্রয়োজন হতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রেও ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

''আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে"। [সুরা মায়িদা: ৩৮]

আইন ও হুকুম বাস্তবায়ন করার জন্য ক্ষমতা ও শক্তি থাকা প্রয়োজন, যাতে বিধানাবলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়। এ কারণেই ইউসুফ (আ.) বলেছেন:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

''শাসক ইউসুফ বলল, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব আমাকে দিন। নিশ্চয়ই আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞাত।'' [সুরা ইউসুফ: ৫৫]

আমিরুল মুমিনিন উসমান ইবনু আফফান (রা.) বলেন:

إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن، أي إن كثيرا من الناس لا تؤثر فيه القوارع والزواجر بالقرآن ولا تحرك به لهم ساكنا، ولكنه الخوف من العصا والسوط والأدب، والعصا لمن عصا كما يقولون.

''আল্লাহ তায়ালা রাষ্ট্রের মাধ্যমে এমন অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, যা কুরআনের মাধ্যমে করেন না। অর্থাৎ অনেক মানুষের জন্য কুরআন কারিমের ওয়াজ-নসিহত ফলপ্রসূ হয় না। এসব তাদের মধ্যে কোনও পরিবর্তন আনতে পারে না। বরং তাদের জন্য লাঠি ও চাবুকের ভয় এবং তিরস্কার ফলপ্রসূ হয়। যেমন বলা হয়-যে অবাধ্য হয়, তার জন্য লাঠি।''[৩৭]

তেরো. রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ এবং শৃঙ্খলা ও সংহতি

ইতিহাস সাক্ষী, এই দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা সহস্র বছর অবধি সকল ধর্ম ও মতের ওপর বিজয়ী রেখেছেন এবং মুসলমানরা তাবৎ পৃথিবীর সকল ধর্ম ও মতের অনুসারীদের ওপর বহু শতাব্দীকাল অসামান্য গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। কিয়ামতের পূর্বে আবারও পুরো পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামের শাসন চলবে। আর সকল বাতিল গোষ্ঠী লজ্জিত ও পরাজিত হবে। আজ মুসলমানরা যেসব জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা তাদের নিজেদের আমল এবং উশৃঙ্খলার ফল। নবীজি (সা.) একবার আরবের প্রসিদ্ধ গোত্রসমূহকে এই বলে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন:

يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة.

''হে লোকসকল! তোমরা বলো-আল্লাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নেই; তাহলে কামিয়াব হবে, আরবের শাসনক্ষমতা লাভ করবে এবং অনারবও তোমাদের অনুগত হবে। আর তোমরা যখন ঈমান আনবে, জান্নাতেও বাদশাহ হবে।''[৩৮]

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, বিকাশ ও সমৃদ্ধি কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সা.)-এর আনুগত্যের ভেতরেই সম্ভব। যে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা-সংহতি এতই অতুলনীয় ছিল যে, তার ফলে আরবদের মতো সভ্যতাহীন ও অজ্ঞ একটি জাতি অনারববিশ্বকে নিজেদের অনুগত করে নেয়। নবীজি (সা.)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী একটি মুজিজা প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু, তারা কেবলমাত্র পার্থিব সফলতাই লাভ করে না; পরকালীন মুক্তি এবং বাদশাহিরও অধিকারী হয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রাখার এই দায়িত্ব রাসুল সা. তাঁর উম্মতের ওপর ন্যস্ত করেছেন,

যেভাবে পূর্বেকার উম্মতদেরকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যাতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৃথিবীতে তারা শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে বিচরণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিম এবং নবীজি (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। তাই মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য হলো, তাঁরা যেন এই আদর্শ পালন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়। ডা. ইসরার আহমেদ বিষয়টি এভাবে বলেছেন:

"খতমে নবুওয়াত এবং রিসালাতের অপরিহার্য ফলাফল হলো, যে কাজ হুজুর (সা.)-এর পূর্ববর্তী নবী ও রাসুলগণ করেছেন, সে সকল দায়িত্ব নবীজি (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর উম্মতের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। চাই তা দাওয়াত ও তাবলিগ, সতর্ককরণ ও সুসংবাদদান, তালিম ও তারবিয়াত, আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন বা শাহাদাতের সত্যায়ন হোক, যা সকল নবী ও রাসুল প্রেরণের প্রধান ও মৌল উদ্দেশ্য; অথবা ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ, ইকামতে দ্বীন সংক্রান্ত হোক, যা মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। সমগ্র পৃথিবীবাসী ও বিশ্বপরিমণ্ডলে হিসেবে এই দায়িত্বগুলো সে সকল মানুষের ওপর বর্তায়, যারা হুজুর (সা.)-এর নাম নেয়, তাঁর নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে গর্ব করে এবং তাঁর উম্মত হওয়াকে সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করে"।[৩৯]

ফলাফল : ইসলামী শিক্ষার আলোকে জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

- ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়েছে। তা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক বা পার্থিব কাজকর্মের ক্ষেত্রে।
- জনসাধারণকে শৃঙ্খলা ও সংহতির আনুগত্যশীল করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং তাদের চিন্তা সমৃদ্ধ করা অপরিহার্য।
- রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও সংহতি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কোনও কাজে সফলতা কিংবা শান্তি অথবা রিজিকের প্রশস্ততা-সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর নির্দেশাবলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- বর্ণ, গোত্র বা ধনসম্পদ যেন শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ রেখে সবার মাঝে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখার জন্য নীতি-নৈতিকতার প্রতি জোর দিতে হবে। সেই সাথে কল্যাণ ও সুকুমার্যবোধের উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও সংহতির জন্য উপযুক্ত, বিশ্বস্ত ও নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে।
- জনসাধারণের মধ্যে সময়ের প্রতি সচেতনতা তৈরির জন্য নামাজের ব্যাপারে জোর দিতে হবে।

- ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপকরণ, পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহেও সে সবের আলোচনা এসেছে। নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্য যথাযথভাবে আদায়ের লক্ষ্যে এর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।
- রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অযথা গোয়েন্দা-কার্যক্রম জনসাধারণের মাঝে উদ্বেগ তৈরি করার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও সংহতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যার ফলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য, স্বনির্ভরতা, শাসক ও জনগণের পারস্পরিক আস্থা এবং নেতৃত্বের জরুরি গুণাবলি কাজে লাগাতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সুরা মুলক, : ৩-৪।

২. আহমাদ মুখতার আবদুল হামিদ, *মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল-মুআসিরাহ*, (মিসর: আলাম আল-কুতুব, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২২৩৫।

৩. মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মুরতাজা জাবিদি, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, (কুয়েত: দারুল হিদায়াহ, ১৪২১ হি.), খ. ৩৩, পৃ. ৪৯৭।

৪. মাহমুদ ইবনু আমর আজ-জামাখশারি, *আসাসুল-বালাগাহ*, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তা. বি), খ. ২, পৃ. ২৮৪।

৫. *লিসান আল-আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮।

৬. হ্যালেন ওয়ারেন, *অক্সফোর্ড ডিকশনারি*, (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, তা. বি.), পৃ. ১১।

৭. *কামুসুল-মুহদিস* (আরবি-ইংরেজি অভিধান, খ. ১, পৃ. ৩৮৮৩।

৮. ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি, *আল-কামুসুল-ওয়াহিদ*, (লাহোর: ইদারা-ই ইসলামিয়াত, তা.বি.), পৃ. ৫০৩।

৯. সুরা ইয়াসিন: ৩৮-৪০

১০. মুহাম্মাদ ইকবাল, *বাংগ-ই দারা*, (লাহোর: রাবেয়া বুক হাউজ, তা. বি.), পৃ. ১৭১।

১১. আবুল মুনজির মাহমুদ ইবনু মুহাম্মদ মিনইয়াবি, *আল-মাজমুআতুল বাহিয়্যাহ লিল আকিদাতিস সালাফিয়্যাহ*, (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনি আব্বাস, ২০০৫ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৯২।

১২. সুরা আলি ইমরান: ১০৩

১৩. সুরা আস-সাফ্: ৪

১৪. ইবনু আবি আসেম আশ-শায়বানি, *কিতাবুস সুন্নাহ*, (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০০ হি.), খ. ১, পৃ. ৪২।

১৫. সুরা তাহা: ১২৪।

১৬. মুহাম্মাদ ইকবাল, *কুল্লিয়াত-ই ইকবাল*, (ইসলামাবাদ : আল-হামরা পাবলিশিং, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭০২।

১৭. ড. ইশতিয়াক হুসাইন কুরায়শি, *ইসলামি মুআশারাহ কি তা'সিস ও তাশকিল*, (ইসলামাবাদ : আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, তাহকিকাত-ই ইসলামি বিভাগ, তা.বি.), পৃ. ১৬১।

১৮. ইবনু কাসির আদ-দিমাশকি, *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম*, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১৪৭।

১৯. সুরা মায়িদা: ৬৬।

২০. *বাংগ-ই দারা*, প্রাগুক্ত , পৃ. ২৩৫।

২১. সুরা আনফাল: ৪৬।

২২. আবু বকর আল-বায়হাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ), ২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৪৩। হা. নং : ৫১৮৩।

২৩. সুরা হুজুরাত: ১৩।

২৪. আহমাদ ইবনু হাম্বল আশ-শায়বানি, *মুসনাদু আহমাদ*, (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.), হা. নং: ২৩৪৮৯।

২৫. আবু দাউদ সুলায়মান সিজিস্তানি, *সুনানু আবি দাউদ*, বাবু মা ইউমারু মিন ইনজিমামিল আসকারি ওয়া সাআতিহি, (বৈরুত : আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ৭, পৃ. ২১৪। ।

২৬. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদি, *আল-জিহাদ ফিল ইসলাম*, (লাহোর: তারজুমানুল কুরআন প্রা. লি., তা. বি.), পৃ. ২৩৩।

২৭. তাজ মুহাম্মাদ প্রমুখ, *উর্দু সপ্তম শ্রেণি*, (ইসলামাবাদ: ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশন, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

২৮. সুরা হুজুরাত: ১২।

২৯. *আস-সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৭৮। হা. নং : ৭৬২৩।

৩০. ড. খালিদ আলাবি, *ইনসান-ই কামিল*, (লাহোর: আল-ফয়সাল পাবলিশার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২৩৪।

৩১. *বাংগ-ই দারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

৩২. সুরা জুখরুফ: ৫৪।

৩৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন নিশাপুরি, *আদাবুস সুহবাহ*, (কায়রো: দারুস সাহাবাহ লিত্ তুরাস, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯।

৩৪. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, (কায়রো: দারুত-তা'সিল, ১৪৩৩ হি.), খ. ৪, পৃ. ৫২৫ হা. নং: ৩৬০২।

৩৫. প্রাগুক্ত, হা. নং: ৭১৩৬।

৩৬. *মুসনাদু আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ২০৬। হা. নং : ১৬৬৪৬।

৩৭. আবদুল মুহসিন আব্বাদ, *শারহু সুনানি আবি দাউদ*, (ইসলামওয়েব ডটনেট: http://www.islamweb.net), খ. ১, পৃ. ২।

৩৮. মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ আজ-জুহরি, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, (মদিনা মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল ইলম ওয়াল হিকাম), তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২১৬।

৩৯. ডা. ইসরার আহমেদ, *নবিয়ে আকরাম সা. কি মাকসাদ-ই বি'সাল*, (লাহোর: আঞ্জুমান-ই খুদ্দামুল কুরআন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪৮।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে ইসলামের নীতিমালা : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ জিয়াউল হক*

Abstract: Like other countries in the world, there is employer-employee conflict in Bangladesh. However to maintain sustainable development, economic stability, peace and order in society, good relations are necessary between the two. The International Labour Organization (ILO) was Formed to resolve employer-employee conflicts and eliminate the discrimination.

Laws and various policies have been established in each country. In continuation of that, a comprehensive labor law containing 21 chapters, 354 sections was enacted in Bangladesh in 2006, called Labour Law. Later the rules were enacted in 2015 and revised in 2018. Still, labour movements and conflicts between owners and workers arise due to dissatisfaction or rights issues. Therefore, to build a peaceful and stable society, it is essential to eliminate all forms of discontent, agitation and conflict. Ending all kinds of agitation and struggles and building a stable society is only possible through the eternal laws of Islam. Because Islam advocates a high-minded labor policy for both owners and workers, ensuring the self-respect and dignity of both parties.

Keywords: Employer, Employee, ILO, discrimination, conflict

সার-সংক্ষেপ : পৃথিবির অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান। অথচ টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক দরকার। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসণ এবং বৈষম্য দূর করতে গঠিত হয়েছে International Labour Organization. (ILO). দেশে দেশে প্রণীত হয়েছে অইন ও বিভিন্ন নীতিমালা। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০০৬ সালে শ্রম আইন নামে ২১টি অধ্যায়, ৩৫৪ ধারা সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রম আইন প্রণীত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে বিধিমালা প্রণীত হয় এবং ২০১৮ সালে সংশোধীত হয়। তারপরও মালিক-শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ বা অধিকার আদায়ের নামে শ্রম আন্দোলন, সংঘাত লেগেই রয়েছে। তাই শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সকল প্রকার অসন্তোষ, আন্দোলন ও সংঘাতের অবসান অপরিহার্য। সকল প্রকার আন্দোলন, সংগ্রামের

* প্রভাষক ও প্রবন্ধিক নাটোর সিটি কলেজ, নাটোর।

অবসান ঘটিয়ে স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণ একমাত্র ইসলামের শাশ্বত বিধানের মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা ইসলাম মালিক ও শ্রমিক উভয়ের জন্য একটি উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন শ্রমনীতির কথা বলেছে। যেখানে মালিক ও শ্রমিকের স্ব-স্ব সম্মান এবং মর্যাদা নিশ্চিত হয়।)

ভূমিকা

সমাজে অবস্থানগত দিক থেকে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। এক মালিক শ্রেণি, যারা ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী; অন্য শ্রেণি হলো শ্রমিক তারা ধনীদের অধীন হয়ে শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। সামাজিকভাবে উভয় শ্রেণি একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখে। এ দু'শ্রেণির মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় না থাকলে সমাজে নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এই দু'শ্রেণির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অপরিহার্য। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই এই দু'শ্রেণির মাঝে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। ফলে সকল ক্ষেত্রেই অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। তাই তাদের পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত করে বৈষম্য দূর করতে না পারলে দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। সমাজের এই দুশ্রেণির ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগে যুগে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে বহু বিধি ও নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত আইনে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে বিভিন্ন নীতিমালা বিধিবদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন নামে ২১টি অধ্যায়, ৩৫৪ ধারা সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রম আইন প্রণীত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে বিধিমালা প্রণীত হয় এবং ২০১৮ সালে সংশোধিত হয়। তারপরও মালিক-শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ বা অধিকার আদায়ের নামে শ্রম আন্দোলন, সংঘাত লেগেই রয়েছে। তাই শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সকল প্রকার অসন্তোষ, আন্দোলন ও সংঘাতের অবসান অপরিহার্য। সকল প্রকার আন্দোলন, সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে স্থিতিশীল সমাজ বিনির্মাণ করতে হলে একমাত্র ইসলামের শাশ্বত বিধানের মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের জন্য অভিন্ন খাবার ও বস্ত্রের নির্দেশ দিয়েছে। এটি ইসলামী শ্রমনীতির শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলাম একটি উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন শ্রমনীতির কথা বলেছে, যেখানে শ্রমিকের মানসম্মত জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামী বিধানের আলোকে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য নিরসণে স্থায়ী নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মালিক ও শ্রমিকের পরিচয়

মালিক শব্দটি মূলত আরবি (مالك) মালিকুন; এর অর্থ প্রভু, কর্তা, অধিপতি, শাসনকর্তা ও অধিকারী ইত্যাদি।[১]

শ্রমিক বাংলা শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, মজুর; শ্রমজীবী; মেহনতী মানুষ ইত্যাদি। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে "Labour"। যার অর্থ ১. শারীরিক বা মানসিক শ্রম, কর্ম, দায়িত্ব, শ্রমিক ইত্যাদি। আরবি ভাষায় শ্রমিক বুঝাতে (عامل) 'আমিল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন হচ্ছে, عمال 'উম্মাল। যেমন বলা হয়, (عمل -يعمل عملا) 'আমিলা, ইয়া'মালু, 'আমালান অর্থাৎ কোন কিছু করা, কাজ করা, আচরণ করা, তৈরি করা, আমল করা, ইত্যাদি।

---

১. আল-মুজামুল ওসিত, (দারুল দাওয়াহ, ১৯৮৯, ২য়. খন্ড),পৃ. ৮৮৬; আল-মু'জামুল ওয়াফী, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী-২০০৯) পৃ, ৮৬২; মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত), (বাংলা একাডেমী-২০১১,) পৃ. ৯৮১।

العامل من يشارك بجزء من الإنتاج أو الربح .

অর্থ: শ্রমিক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে উৎপাদন বা লাভের কোন অংশের সাথে শরীক থাকে।[২]

বাংলাদেশের শ্রম আইনে শ্রমিক

শ্রমিক অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তার চাকুরীর শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরি বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন।[৩] কিন্তু প্রধান, প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না। সর্বোপরি কোন কারখানায় যিনি বা যারা কায়িক শ্রম দিয়ে উৎপাদন অথবা কেরানি সংক্রান্ত কাজ করেন সাধারণত তিনি বা তারা সকলেই শ্রমিক।

শ্রমের প্রকারভেদ

বাংলাদেশের শ্রম আইনে শ্রমকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

ক. কায়িক শ্রম

খ. শৈল্পিক শ্রম

গ. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম

ক. **কায়িক শ্রম:** কায়িক বা দৈহিক শ্রম বলতে বুঝায়, শরীর বা দেহকে খাটিয়ে যে কাজ করা হয়। ইহা হলো মানুষের পুঁজিবিহীন জীবিকার মাধ্যম। যেমন দিন মজুরি, শিল্প ও কল-কারখানায় কাজ ইত্যাদি।

খ. শৈল্পিক শ্রম: শৈল্পিক শ্রম বলতে বুঝায়, যে কাজে শিল্প ও কৌশল বিদ্যাকে বেশি পরিমাণে খাটানো হয়। যেমন অঙ্কনশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি।

গ. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম: বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ সব পুঁজিহীন শ্রমকে বুঝায়, যেগুলোয় দেহের চেয়ে মস্তিষ্ক কে বেশি খাটানো হয়। যেমন পরিচালক, ম্যানেজার, শিক্ষক, ডাক্তার ও আইনজীবী ইত্যাদি।

মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক

মালিক মূলধন বিনিয়োগ করেন আর শ্রমিক তার মেধা, শক্তি ও শ্রম বিনিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন করেন। তাই শ্রম হলো উৎপাদনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মালিক-শ্রমিক একে অন্যের পরিপূরক। মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। কেননা মালিক যেমন শ্রমিক ব্যতীত তার মূলধন বিনিয়োগ করতে পারে না, ঠিক তেমনি শ্রমিক মালিকের মূলধন ব্যতীত পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। ফলে মালিক ও শ্রমিকের কাঙ্খিত সম্পর্ক হবে পরস্পর ভাই ভাই ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

অতএব, যার ভাই তার অধীনে থাকবে, তাকে তা-ই খাওয়াবে যা সে নিজে খায় এবং তাকে তা-ই পরিধান করাবে যা সে নিজে পরিধান করে। আর তাদের সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দিবেনা। একান্ত যদি তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দিতেই হয়, তাহলে তা সম্পাদনে তাদেরকে সাহায্য করবে।

---

২. কারহু মুনতাহাল ইরাদাহ, (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি ২য়. খন্ড,) পৃ. ৩৪৬।

৩. The Bangladesh Labour Code 2006, sec. 2/65; Ministry of Laws Bangladesh. 2006. *The Bangladesh LabourCode.*

শ্রম বিরোধের প্রকৃত অবস্থা

আদিকাল থেকেই মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব বিরাজমান। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ কখনো হয়ে উঠেনি। শ্রমিকরা প্রায় সব সময় শোষিত আর মালিকরা শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। শ্রমিকগণ মালিকদের শোষণ নির্যাতনে বিক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে বাধ্য হন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৬ সালের ১মে শ্রমিকরা আমেরিকার শিকাগো শহরের 'হে মার্কেটে' দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করার দাবিতে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশের গুলিতে কিছুসংখ্যক শ্রমিক নিহত হন। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসেবে প্রতি বছর ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হয়।[৪] তারপরও তারা স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং পদে পদে নিগৃহীত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে।

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পৃথিবিব্যাপী শ্রমিকশ্রেণি সংগঠিত হতে থাকে এবং স্বীয় কর্মস্থলে সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে অধিকার আদায়ের নামে শিল্পকারখানার মালিকদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে মালিকশ্রেণিও বিভিন্ন নামে সংগঠিত হয়ে শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণি স্বীয় দাবি আদায়ের জন্য যখন কর্মবিরতি বা হরতাল পালন করে, ঠিক তখনই মালিকশ্রেণি তাদেরকে দমনের নিমিত্তে শ্রমিক ছাঁটাই করে অথবা মিল-কারখানায় তালা ঝুলিয় দেয়। ফলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্যদিকে বাজারমূল্য উর্ধ্বগতি হওয়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে গেলে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মালিক-শ্রমিকের এ দ্বন্দ্বের একটা স্থায়ী সমাধানের জন্য গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (International Labour Organization. ILO) এবং দেশে দেশে প্রণিত হয়েছে অসংখ্য আইন, বিধি-প্রবিধি। কিন্ত মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বের অবসান তো হয়ইনি বরং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক

বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিকের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক হলো অনেকাংশে মনিব-ভৃত্যের। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সব উপায়-উপকরণ মালিকশ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত। মালিকশ্রেণি শ্রমিকদের অসহায়ত্বের সুযোগে তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নিজেদের আজ্ঞাবহ মনে করে। ফলে আধুনিক সভ্যতার যুগেও শ্রমিকরা মধ্যযুগের ন্যায় অত্যাচারিত হয়। পূর্বযুগে তারা শোষিত হতো বর্বর কায়দায় আর এখন শোষিত হচ্ছে আধুনিক কায়দায়। বাংলাদেশের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ শ্রমিক তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে নিয়োজিত আর বাকি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শ্রমিক ঔষধ, চামড়া, লৌহ, সিরামিক ও নির্মাণ শিল্প, কৃষি ও মৎস খামার, চা বাগান, চিংড়ি ঘের, ইটভাটা প্রভৃতি শিল্প কারখানায় কর্মরত রয়েছে। তারা পদে পদে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা বঞ্চিত হচ্ছে ন্যায্য অধিকার থেকে এবং কখনো কখনো যৌন হয়রানিসহ নিগৃহীত হচ্ছে নারী শ্রমিকরা। তারা অধিকার আদায়ের জন্য শ্রম ধর্মঘট, কর্মবিরতি ও হরতালসহ নানাবিধ আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক কৃষি শ্রমিক ও গৃহকর্মী রয়েছে যারা অধিকার তো দূরের কথা শ্রমিকের স্বীকৃতিটুকু এখনো পায়নি। সর্বোপরি বাংলাদেশে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাটুকু প্রাপ্তির নিশ্চিত পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। অদ্যাবধি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির জন্য নিয়মিত আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকারগুলো

৪. https://en.wikipedia.org/wiki/International_workars%27-Day, Last moditied on 28 Fed 2017, retrieved on 5th March, 2017.

প্রাপ্তির তো কোন প্রশ্নই আসে না। তাদের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের মুনাফায় মালিকশ্রেণি বিলাসী জীবন যাপন করে। শ্রমিক নেতারা কিছু সুবিধা লাভ করলেও শ্রমিকশ্রেণি প্রায় সবদিক থেকে আজ উপেক্ষিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতেছে।

ইসলামে মালিক ও শ্রমিকের মর্যাদা

মানবিক মূল্যবোধ ও মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক সবাই সাধারণভাবে সমান বলে ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম। শ্রমিকের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা এবং মালিকের প্রাপ্য সেবা লাভের এমন ভারসাম্যপূর্ণ শ্রমনীতি একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। হাদিসে শ্রমিক ও মালিক পরস্পরকে ভাই সম্বোধন করে মূলত ইসলাম শ্রেণিবৈষম্যের বিলোপ সাধন করেছে। তবে শ্রেণিবৈষম্য বিলোপের নামে মালিক ও উদ্যোক্তার মেধা-শ্রম ও সামাজিক মর্যাদা কেড়ে নেয়নি। নিপীড়নমূলক কোন ব্যবস্থাও চাপিয়ে দেয়নি। বরং তাদের অন্তরে মানবিক মূল্যবোধ ও শ্রমিকের প্রতি মমতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের জন্য অভিন্ন খাবার ও বস্ত্রের নির্দেশ দিয়েছে। এটি ইসলামী শ্রমনীতির শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই নির্দেশনার আলোকে বোঝা যায়, ইসলাম একটি উচ্চ মানসিকতাসম্পন্ন শ্রমনীতির কথা বলেছে, যেখানে শ্রমিকের মানসম্মত জীবন-জীবিকা নিশ্চিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রমিককে ভাই হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন-

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ [5]

অর্থ: তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের দাস-দাসী, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনে থাকবে, তাকে তা-ই খাওয়াবে যা সে নিজে খায় এবং তাকে তা-ই পরিধান করাবে যা সে নিজে পরিধান করে। আর তাদের সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। একান্ত যদি তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দিতেই হয়, তাহলে তা সম্পাদনে তাদেরকে সাহায্য করো।

মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণসমূহ

১. **ন্যায্য মজুরি না দেওয়া:** মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ হলো ন্যায্য মজুরি থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা। তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অর্জিত মুনাফা মালিকরা এককভাবে ভোগ করে থাকে। শ্রমিকরা মুনাফার অংশিদার হওয়া বা ন্যায্য অধিকার তো দূরের কথা; ন্যূনতম মজুরিটাই আদায় করতে হয় আন্দোলন-সংগ্রাম করে।

২. **চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকা:** অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে এখনো শ্রমিকদের চাকুরীর নিশ্চয়তা (Job Security) ও এ সংক্রান্ত কোন নীতিমালাই নেই। কতিপয় প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিধি-বিধান থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে মানা হয় না। মালিকরা নিজেদের ইচ্ছেমত প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ ও কারণ দর্শানো ছাড়াই ছাঁটাই করে। ফলে শ্রমিকদেরকে সবসময় আতংক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়।

৩. **মালিকদের রূঢ় আচরণ:** মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো মালিকদের রূঢ় আচরণ। মালিকরা শ্রমিকদের সামান্য বিষয় নিয়ে হরহামেশা বকাঝকা ও

৫. সহীহ আল বুখারী, ২৫৪৫।

দুর্ব্যবহার করে থাকে। এমনকি ভৃত্যের ন্যায় আচরণ করে এবং গায়ে হাত তুলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। ফলে ভালো বেতন পাওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকেরা এক ধরনের মনোকষ্টে ভুগে। এক পর্যায়ে তা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের রূপ ধারণ করে।

৪. **নিম্নমানের কর্ম পরিবেশ:** বাংলাদেশের অধিকাংশ কল-কারখানার পরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের। ঝুঁকিপূর্ণ পুরনো ভবনে গিজগিজে সংকীর্ণ পরিসরে অনেক কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শ্রমিকরা পেটের দায়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয়। দেখা যায় যে, অনেক কারখানায় দুর্ঘটনা রোধের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থাও নেই। তাই মাঝে মধ্যে কল-কারখানাগুলোতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শত শত শ্রমিক আহত ও নিহত হতে দেখা যায়।

৫. **অতিরিক্ত কাজের চাপ:** অধিক মুনাফালোভী কারখানা মালিকরা সরকার ঘোষিত কর্মঘণ্টা যথাযথ অনুসরণ করেন না। এছাড়া অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য সামান্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকলেও তা দিতে অনেক সময় গড়িমসি করে। ফলে শ্রমিকরা অনেকাংশে চাকুরী হারানোর ভয়ে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। একপর্যয়ে শ্রমিকদের মাঝে চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

৬. **অন্যায়ভাবে শ্রমিক ছাঁটাই:** কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষ করে গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে সামান্য অজুহাতে পূর্ব নোটিশ ছাড়াই কর্মী ছাঁটাই করা হয়। ছাঁটাই বা বরখাস্তের পর শ্রম আইনানুযায়ী তাদেরকে কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করা হয় না। যার ফলে তারা স্বীয় অধিকার আদায়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়।

৭. **ঝুট ব্যবসা:** গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে ঝুট ব্যবসাকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে উঠে। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যবসার নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব বাহিনীকে ব্যবহার করে থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ লাভে ব্যর্থ হয়ে বা ব্যবসার প্রভাব বিস্তার, ব্যবসার সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টায় এরা কারখানার শ্রমিকদের নানা কায়দায় উসকে দেয়। শ্রমিকরা এদের ইন্ধনে বিভিন্ন ইস্যুতে মালিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনে নামে।

৮. **রাজনৈতিক কারণ:** বাংলাদেশের শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তির কারণে রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে শ্রমিকরা অনেক সময় রাজনৈতিক ইস্যুতে জড়িয়ে নিজেদের শক্তি জানান দিতে বা ভিন্ন মতের শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে হামলা করে। ফলে মালিক শ্রমিকের মাঝে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৯. **ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান না থাকা :** সবচেয়ে বড় বিষয়টি হচ্ছে অধিকাংশ মালিক ও শ্রমিকের ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় তারা নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন। ফলে মালিক শ্রমিককে ঠকিয়ে থাকে আর শ্রমিক মালিকের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মালিকের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়।

মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে ইসলামের স্থায়ী নীতিমালা

মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে ইসলাম ইনসাফপূর্ণ চমৎকার স্থায়ী নীতিমালা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ইসলাম পূর্বযুগের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সে যুগে শ্রমজীবী মানুষ পণ্যের ন্যায় হাট-বাজারে বেচা-কেনার মাধ্যমে পায়ে পরিয়ে দেওয়া হতো দাসত্বের শিকল। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) মালিক-শ্রমিকের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বন্ধন স্থাপন করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য অনুসরনীয় আদর্শ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। নবী করীম (সা.) মালিক-শ্রমিককে পরস্পর ভাই ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়

হলো যে, ইসলামের মহান শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের গোলাম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা শ্রমিকশ্রেণিকে ব্যক্তির গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে সরকারি গোলামীর শৃংখলাবদ্ধ করেছে। যার ফলে শ্রমিকরা আরো বেশি নিষ্পেষিত হয়ে থাকে। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী (সা.) শ্রমিক শ্রেণিকে মানবিকভাবে সমতার কাতারে শামিল করে নজিরবিহীন এক উজ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইসলাম মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অনুপম নীতিমালা উপহার দিয়েছে, তা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে মালিক-শ্রমিকের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা তাদের মাঝে সৌহার্দ্যের পিরামিড স্থাপিত হবে। আলোচনার সুবিধার্থে ইসলাম মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষায় প্রদত্ত নীতিমালাকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করেছে।

১. শ্রমিকের প্রতি মালিকের করণীয়।
২. মালিকের প্রতি শ্রমিকের করণীয়।
৩. মালিক-শ্রমিক উভয়ে যৌথ করণীয়।
৪. সরকারের করণীয়।

শ্রমিকের প্রতি মালিকের করণীয়

মালিক মূলধন, মেধা ও যোগ্যতা বিনিয়োগ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিক স্বীয় শ্রম ও মেধা দিয়ে উৎপাদনের যোগান দেয়। তাই মালিকের উচিত, শ্রমিকের অধিকারগুলো ইনসাফপূর্ণভাবে প্রদান করা। নিম্নে শ্রমিকের প্রতি মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো উপস্থাপন করা হলো-

১. **সময়মতো মজুরি পরিশোধ করা:** মালিকের প্রধান দায়িত্ব হলো শ্রমিকের বেতন সময় মতো পরিশোধ করা। বর্তমানে মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হলো নির্ধারিত সময়ে মজুরি পরিশোধ না করা। অথচ মহানবী (সা.) যথা সময়ে শ্রমের মজুরি পরিশোধ করার প্রতি তাগিদ প্রদান করেছেন। যেমন-

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ[৬]

অর্থ: তোমরা শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ করে দাও।

যদি কোন কারণে শ্রমিক তার মজুরি গ্রহণ করতে না পারে এবং তার এ অর্থ যদি মালিক কোন ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে, পরবর্তীতে মজদুরের চাহিবামাত্র তার অর্থ লভ্যাংশসহ তাকে দিয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.) তাঁর জামি' গ্রন্থে কিতাবুল ইজারা নামে নির্দিষ্ট একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে, যার বিষয় বস্তু হলো: কোন লোক শ্রমিক নিয়োগ করার পর সে শ্রমিক পারিশ্রমিক না নিলে নিয়োগকর্তা সে ব্যক্তির পারিশ্রমিকের টাকা কাজে খাটালো, ফলে তা বৃদ্ধি পেল। কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের উপর কাজে নিয়োগ দেয়, অতঃপর যদি মজদুর তার পারিশ্রমিক কোন কারণে ছেড়ে যায়, এরপর মালিক যদি মজদুরের অর্থ কোন ব্যবসায়িক কাজে বিনিয়োগ করে এবং তা বৃদ্ধি পায়, তবে বৃদ্ধি পাওয়া অর্থসহ সমুদয় ফিরিয়ে দিতে হবে।[৭]

২. **ন্যায্য বেতন নির্ধারণ করা:** শ্রমিকের ন্যায্য বেতন কত হবে তা কাজে যোগদানের পূর্বেই নির্ধারণ করে নেওয়া মালিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন-

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৩৪৩।
৭. সহীহ আল-বুখারী, ২২৭২।

«فَأَعْلِمْهُ أَجِيرًا اسْتَأْجَرْتَ إِذَا أَجْرَهُ»[৪]

অর্থ: তুমি যখন পারিশ্রমিকের উপর কোন ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করো, তবে তার পারিশ্রমিক কাজের আগেই জানিয়ে দিবে।

৩. **বেতন কম না দেওয়া:** শ্রমিককে কখনো তার নির্ধারিত বেতনের কম না দেয়া। শ্রমিকের সাথে কথা না বলে মালিকের ইচ্ছা মতো বেতন নির্ধারণ করা যাবে না। বরং প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে ইনসাফপূর্ণ মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরি দিতে হবে, যা দিয়ে সে ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে পারে। ফকীহগণ ইনসাফপূর্ণ বেতন বলতে বুঝিয়েছেন যে, বেতনের পরিমাণ এমন হবে, যাতে করে মালিক ও শ্রমিকেরর জীবন যাপনে মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় থাকে। আধুনিক যুগে মালিকপক্ষ বেতন কম দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে থাকে। এ ব্যাপারে মহানবী (সা.) হাদীছে কুদসীতে বলেছেন-

قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ[৯]

অর্থ: মহান আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি বাদী হব (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোন চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে (২) সেই ব্যক্তি, যে কোন মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি করিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি।

৪. **কর্মঘন্টা নির্ধারণ:** মালিক পক্ষ কাজের সময় নির্ধারণ করে নেওয়া মৌলিক দায়িত্ব। ইসলাম কাজের মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কাজের কোন নির্ধারিত সময় নির্ধারণ করে দেয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিকের কাছ থেকে ততক্ষণই কাজ নেওয়া যেতে পারে, যতক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে তা সম্পাদন করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে নবী (সা.) বলেছেন:

وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ[10]

অর্থ: আর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। একান্ত যদি কোন কাজ চাপিয়ে দিতে হয় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করো।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন,

اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

অর্থ: কাজ করার সময় এতটা পরিশ্রম কর, যতটা তোমার সাধ্যে কুলায়।[১১]

সুতরাং শ্রমিকের উপর তার সাধ্যাতীত কোন কাজ চাপিয়ে দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমনিভাবে মালিক-শ্রমিকের সম্মতিক্রমে সময় সীমা নির্ধারিত হওয়ার পর তার থেকে অধিক সময় কাজ করিয়ে নেওয়াটাও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যুলুম। তবে শ্রমিক যদি স্বেচ্ছায় বেশি কাজ করে দেয়, তাতে কোন সমস্যা নেই। হযরত ইবন হাযম (রা.) বলেন, "মালিকের জন্য

৮. সুনান আন-নাসায়ী,৩৮৫৭।
৯. সহীহ আল-বুখারী, ২৭৭০।
১০. সহীহ আল-বুখারী,২৫৪৫।
১১. সুনানু ইবনু মাজাহ, ৪২৪০।

উচিত শ্রমিকের কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেওয়া, যতটুকু সে অনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, তার সামর্থ্যে কুলায়। এমন কিছু তার দ্বারা করাতে পারবে না; যা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৫. **কাজের ধরণ ঠিক করা:** শ্রমিক নিয়োগের পূর্বেই কাজের প্রকৃতি বা ধরণ নির্ধারণ করতে হবে। শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কাজে নিয়োজিত করা ইসলাম সমর্থন করে না। নবী হযরত মূসা (আ.) কে স্বীয় কাজের প্রকৃতি বুঝিয়ে দিতে হযরত শু'য়াইব (আ.) যা বলে ছিলেন তা আল্লাহ তায়ালার ভাষায়,

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ[12]

অর্থ: আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে। এ সম্পর্কে 'হিদায়া' প্রণেতা বলেছেন, মালিক শ্রমিক থেকে কী ধরনের কাজ করিয়ে নিতে চায় তা আলোচনা পূর্বক নির্ধারণ করে নেওয়া মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া অন্য কাজে নিয়োজিত করা যুলুমের শামিল[১৩]

৬. **শ্রমিককে ব্যবসার লভ্যাংশের অংশীদার করা:** বর্তমান বিশ্বে শ্রমিকেরা সম্মিলিতভাবে কঠোর আন্দোলন করে রাষ্ট্রসমূহকে ব্যবসায় লভ্যাংশের অংশীদার করতে বাধ্য করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর প্রথম দিন থেকেই এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মজদুর শ্রেণি ব্যবসার লভ্যাংশে শরীক হবে। এ জন্যেই ইসলাম মুদারাবা (অংশীদারী ব্যবসা) এবং মুযারাআহ (বর্গাচাষ)-এর মত অংশীদারিত্বমূলক বিধান দিয়েছে। শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতেও অংশ দিতে হবে।

أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ[14]

অর্থ: শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতে অংশ দিয়ে দাও। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।

৭. **শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মালিকেরই। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মালিকানাধীন (অধীন) ব্যক্তির জন্য খাবার ও কাপড়ের অধিকার রয়েছে।[১৫]

শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম মালিকের উপর শ্রমিকের প্রতি যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে, তেমনি শ্রমিকের উপর মালিকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করেছে। ইসলাম উভয়কেই স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে পালন করতে নির্দেশ দিয়েছে। নিম্নে শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপস্থাপন করা হলো,

১. **পেশায় দক্ষতা অর্জন করা:** শ্রমিকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নিজেকে সুদক্ষ ও যোগ্য কারিগর হিসেবে গড়ে তোলা এবং মালিকের কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা। যখন সে কোন কাজ করে তা যেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পাদন করে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

---

১২. সূরা আল-কাসাস, ২৭।
১৩. আল হিদায়াহ, (মিশর: আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা. বি), ৩য় খ. পৃ.২৯৩।
১৪. মুসনাদ আহমদ, ৮৬৫০।
১৫. সহীহ মুসলিম, ১৬৬২।

إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه[16]

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ কোন কাজ করে, তখন সে যেন উক্ত কাজ খুব দক্ষতার সাথে করে।

২. **আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কার্য সম্পাদন করা:** যখন কোন কাজে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয় তখন সে যেন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তা সম্পাদন করে। আর সে যেন কাজে ফাঁকি বা গাফিলতি না করে। কেননা কাজে ফাঁকি দেয়া অপরাধ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إذا عمل أحدكم عملا أن يحسن[17] .العامل من إن الله وتعالى يحب

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শ্রমিকের জন্যে পছন্দ করেন, যখন সে কোন কাজ করে তা যেন উত্তমরূপে সম্পাদন করে।

৩. **সততা ও আমানতদারীতা রক্ষা করা:** শ্রমিকের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে, মালিকের কাজে সততা ও আমানতদারীতা রক্ষা করা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে হযরত শোয়াইব (আ:) এর এক কন্যা তাঁর পিতাকে বলেছিলেন,

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ[18]

অর্থ : আপনার কর্মচারি হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

শ্রমিকেরা যেন কোন অবস্থায় সততা ও আমানতদারীর কথা ভুলে না যায় সেটা তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। তারা যেন মালিকের মালের কোন প্রকার খিয়ানত ও আত্মসাৎ না করে এবং ঘুষ গ্রহণের কোন পন্থা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)বলেছেন,

مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

অর্থ: যদি কোন ব্যক্তি আমাদের নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত গ্রহণ করে, তবে সেটা আত্মসাৎ হবে।[১৯]

৪. **মালিকের মালের হিফাজত করা:** শ্রমিক যে প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় কাজ করবে সেখানকার যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ করা তার নৈতিক দায়িত্ব। মালিকের এ সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিজের মনে করতে হবে। কেননা এগুলো দিয়েই সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। এগুলোতে কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করলে আমানতের খিয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। কারণ মালিক কারখানার যাবতীয় জিনিসপত্র তার দায়িত্বে অর্পণ করেছে। তাই মালিকের যাবতীয় সম্পদ তার কাছে আমানত স্বরূপ। এই আমানত রক্ষা করা তার ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের আমানতের খেয়ানত করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

---

১৬. শুয়াবুল ঈমান, মু'জামুল আওসাত লিত-তবরানী, ৯০৯।
১৭. কানজুল উম্মাল, (বৈরুত: মুয়াস সাসাহ আল রিসালাহ-১৯৮৯) নং ৯১২৯।
১৮. সূরা আল কাসাস, ২৮।
১৯. সুনানু আবু দাউদ, ২৫৫৪; আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন লিল-হাকেম, ১৪২৪।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ[20]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না, আর তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্য সম্পর্কেও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

মালিকের সম্পদ শ্রমিকের নিকট ঋণস্বরূপ। সুতরাং শ্রমিক কোন প্রকার ক্ষতি করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে শ্রমিকের উপর দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৫. **আইন মেনে চলা:** মালিকের সকল বৈধ নিয়ম-কানুন মেনে চলা শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যথায় মালিক ও শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তবে মালিকের যেকোন ধরণে অন্যায় বা শরীয়ত বিবর্জিত নিয়ম-নীতি বা কোন নির্দেশনা মানতে বাধ্য নয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ[21]

অর্থ: যখন গোনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দেয়া হয়, তখন শোনা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৬. **গোপনীয়তা রক্ষা করা:** শ্রমিকের অন্যতম কর্তব্য হলো মালিকের গোপনীয়তা রক্ষা করা। কৌশলগত কারণে মালিক অনেক বিষয় গোপন রাখতে চায়। শ্রমিককে জনস্বার্থে সে সকল বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা নৈতিক দায়িত্ব। কেননা এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা প্রকাশিত হলে মালিকের উৎপাদন বা বিপণন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে। অন্যদিকে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা এক ধরণের খিয়ানত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ। হযরত কাযী আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী [৩৬৪-৪৫০ হি.] রহ. বলেন,

اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح و أدوم لأحوال الصلاح

অর্থ: জেনে রাখ! নিশ্চয় গোপনীয়তা রক্ষা করা সফলতার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থার স্থায়ী মাধ্যম।[২২] আবার অন্যের গোপনীয়তা প্রকাশ করা প্রতারণার শামিল। আর প্রতারককে ইসলাম মুমিন হিসেবে সাব্যস্ত করে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: যে প্রতারণা করে সে আমাদের দল ভুক্ত নয়।[২৩]

মালিক-শ্রমিক উভয়ের সম্মিলিত দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইতোপূর্বে মালিক ও শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে মালিক-শ্রমিক উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করব। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের পিরামিড গড়ে তুলতে উভয়কেই সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথার্থভাবে পালন করতে হবে। নিম্নে বিষয়গুলোর আলোচনা উপস্থাপিত হলো,

১. **উত্তম আচরণ:** পরস্পর সদাচরণ করা মালিক-শ্রমিক উভয়ের নৈতিক দায়িত্ব। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, উত্তম আচরণ, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা না থাকলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

২০. সূরা আল ইসরা, ২৭।
২১. সহীহ আল-বুখারী, ২৭৩৫।
২২. আদাবুদ দুনিয়া ওয়া আদ-দ্বীন, (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ- ১৯৭৮), পৃ.২৯৫।
২৩. আত তিরমিজি, ১২৩৬,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[24]

অর্থ: এবং তোমরা স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আর সৌজন্যমূলক আচরণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সৌজন্যমূলক আচরণকারীকে ভালোবাসেন। উপর্যুক্ত আয়াতে সাধারণভাবে সদাচরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাই সকলের প্রতি বিশেষ করে মালিক-শ্রমিকদের এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করতে হবে। কারণ মালিকরা নিজেদেরকে প্রভূ আর শ্রমিকদেরকে ভৃত্য মনে করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিসংবাদ সৃষ্টি হয়।

২. **ওয়াদা পূরণ:** মালিক-শ্রমিক উভয়েই পারস্পরিক চুক্তিপত্রে উল্লেখিত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূরণ করা আবশ্যক। বাস্তবে তাদের কৃত অঙ্গীকার পালনের মাধ্যমেই পারস্পরিক সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে। তাই এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিষেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[25]

অর্থ: তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করবে। অবশ্যই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩. **ক্ষয়-ক্ষতির বিধান:** মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের দ্বারা যে কোন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হলে ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণের বিধান ক্ষতিসাধনকারীর উপর বর্তাবে। অর্থাৎ মালিক শ্রমিকের ক্ষতি করলে তা যুলুম আর শ্রমিক মালিকের ক্ষতি করলে তা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ[26]

অর্থ: হাত দিয়ে যা গ্রহণ করেছে তা তাকেই নিতে হবে, যতক্ষণ সে তা ফেরত না দেয়।

ফকীহদের পরিভাষায় বলা হয় গছব বা আত্মসাৎ। সুতরাং মালিক-শ্রমিক উভয়কে পরস্পর একে অন্যের জীবন ও সম্পদের সংরক্ষণকারী হতে হবে। যদি এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের খিয়ানত পরিলক্ষিত হয়, তাহলে উক্ত বিধানের আলোকে খিয়ানতকারীকে এর দায়- দায়িত্ব বহন করতে হবে।

৫. **ইতিবাচক মনোভাব তৈরী:** ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক-শ্রমিক সবাই ভাই ভাই। কারণ, মূলত সম্পদের সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা আল্লাহর। আর মানুষ তার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। সুতরাং শ্রদ্ধা-স্নেহ, সৌহার্দ্য ও বিশ্বস্ততায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিপূর্ণ হওয়াই আবশ্যক।

রাষ্ট্র বা সরকারের দায়িত্ব

সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনে মালিক ও শ্রমিকের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে ইসলাম সরকারেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সরকার যখন স্বীয় ভূমিকা পালন করবে, তখন মালিক-শ্রমিক পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করবে। নিম্নে সরকারের দায়িত্বগুলো উপস্থাপন করা হলো,

১. **কাজের সুষ্ঠূ পরিবেশ নিশ্চিত করা:** কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে কোন প্রকার চাপ বা

২৪. সূরা আল বাকারাহ, ১৯৫।
২৫. সূরা আল-ইসরা, ৩৪।
২৬. সুনানু আত-তিরমিজী, ১১৮৭।

আন্দোলন ব্যতীতই সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করে, তাহলে সরকার সে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। এমনটিই ইসলামের মূলনীতি। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ[27]

অর্থ: তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, যিনি দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

২. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা:** শ্রমিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রণীত শ্রমনীতি প্রশাসনিকভাবে মনিটরিং ও প্রয়োগ করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তা না হলে উভয় পক্ষ বা যে কোন এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ[28]

অর্থ: নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না।

৩. **শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** বৃদ্ধ ও কর্মক্ষম শ্রমিকের ভাতা ব্যবস্থা করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। শ্রমিক তার জীবনের সকল শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে যেরূপ মালিকের কাজে সহযোগিতা করেছে তদ্রূপ মালিকও শ্রমিকের জীবন সায়াহ্নে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে তার নিরাপত্তা বিধান করবে। সরকার নিজে বা মালিক পক্ষের মাধ্যমে শ্রমিকের প্রয়োজনানুপাতে তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم زاد نصر فمن مات وعليه دين لم يترك وفاء ، فلنا قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته[29]

অর্থ: আমি মুমিনদের প্রতি তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি দায়িত্ববান। অতএব, তাদের কেউ যদি এমন ঋণ রেখে মারা যায়, যা শোধ করার সামর্থ্য তার ছিল না, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার (তথা মুসলিম সরকারের)। অপরদিকে যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায়, সে সম্পদ তার ওয়ারিশদের।

৫. **সামাজিক নিরাপত্তা বিধান :** সরকারের মৌলিক দায়িত্ব হলো শ্রমিকদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই ৫টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা। কেননা, শ্রমিকদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো সম্পূর্ণ থাকলে তারা কাজে অধিক মনোযোগী হবে। তাতে মালিকের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৬. **শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা:** শ্রমিকের এমনকি তার স্ত্রী ও সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারে উপর বর্তায়। উমর (রা.) অসুস্থ কর্মচারীদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হচ্ছে কিনা এর খোঁজ-খবর নিতেন। কেউ এ দায়িত্বে পালনে অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন।

---

২৭. সহীহ আল-বুখারী, ৫২০০।
২৮. সুনানু ইবনু মাজাহ, ২৩৩২।
২৯. আবু আওয়ানা, মুসতাখরাজ, ৪৫৫০।

বাংলাদেশে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে কতিপয় সুপারিশ

১. **পারস্পরিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি:** মালিক-শ্রমিকদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক করা আবশ্যক। মালিকদের শ্রমিকদের প্রতি দাস-দাসীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রমিকদেরকেও মালিকদেরকে প্রতিপক্ষ না ভেবে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে। পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারলে উভয়ের মধ্যকার অনেক বিরোধ আপনা আপিনভাবেই নিস্পত্তি হয়ে যাবে।

২. **ন্যায্য বেতন নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা:** বাংলাদেশে যতগুলো শ্রমিক আন্দোলন, সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দু হলো ন্যায্য মজুরির দাবিকে কেন্দ্র করে। তাই সরকারকে গুরুত্বের সাথে এ লক্ষ্যে একটি ওয়েজ বোর্ড গঠন করে ন্যায্য মজুরি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি সরকারকে মনিটরিং সেল গঠন করে এই নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. **কঠোর হস্তে আইন বাস্তবায়ন করা:** মালিক-শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রত্যেক মালিক ও শ্রমিককে এই আইন সঠিকভাবে পালনে বাধ্য করতে হবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ বিষয়ে সততার সাথে অরো তৎপর হতে হবে এবং আইন লঙ্ঘনকারীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করা:** কারণে অকারণে শ্রমিক ছাঁটাই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যায় একটি বিধিমালার মাধ্যমে শ্রমিকদেরকেও চাকুরিতে স্থায়ীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. **ওভারটাইম, উৎসব ভাতা ও বোনাস নিশ্চিত করা:** উৎসবকালীন ভাতা, বোনাস এবং ওভারটাইম ভাতা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে। ওভারটাইম ভাতাও ঈদের সময় বেতন-বোনাস নিয়ে অধিকাংশ কারখানার মালিক টালবাহানা করে থাকেন। একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে শ্রমিকদের এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা:** নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। নিরাপত্তাহীন পরিবেশে কাজ করে শ্রমিকরা নানাবিদ শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় নিপতিত হয়। তাই শ্রমিকদের জন্য মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **হেল্‌থ কার্ড চালুকরা:** শ্রমিকদের ও তার পরিবারপরিজনদের সুচিকিৎসার জন্য হেলথ কার্ড চালু করা অতীব জরুরী।

৮. **চাকুরীর বয়স সীমা নির্ধারণ করা:** শ্রমিকদের চাকুরীর বয়সসীমা নির্ধারণ করে তাদের এ সম্পর্কীয় সকল প্রকার সুয়োগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৯. **ট্রেড ইউনিয়ন করার ব্যবস্থা করা:** শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের একমাত্র মাধ্যম হলো ট্রেড ইউনিয়ন। সকল পেশা ও কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করার পক্রিয়া সহজ ও নিশ্চিত করা। শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা সরকারি ফি এর চাইতে ট্রেড ইউনিয়নভেদে কয়েশতগুণ বেশি টাকা ঘুষ নেয়। এটি বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও বার্ষিক রিটার্ন জমা দিতে কয়েক হাজার করে টাকা ঘুষ দিতে হয়। এগুলোও বন্ধ করতে হবে।

১০. **শ্রম আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিতি। তাই শ্রম আইন বিষয়ে সকল শ্রেণির শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করতে হবে।

১১. **সংসদে সংরক্ষিত আসন রাখা:** শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপন, তাদের অধিকার আদায় ও আইন প্রণয়নে আনুপাতিক হারে অথবা সংরক্ষিত নারী আসনের ন্যায় শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত সংসদীয় নির্ধারণ করা।

১২. **নিয়োগ, যোগদান পত্র ও পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করা:** শ্রমিকদের চাররীর নিশ্চয়তা বিধান কল্পে এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সকল শ্রেণির শ্রমিকদের নিয়োগ ও যোগদানপত্র এবং আইডি কার্ডের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. **ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা:** বর্তমানে পাপ পঙ্কিলতার অতল গহবরে নিমজ্জিত এই পৃথিবিতে মানবতা ও নৈতকিতা যতটুকু অবশিষ্ট্য রয়েছে তার অবদান হলো ইসলামের। তাই মালিক ও শ্রমিকের মাঝে বৈষম্য নিরসণে তাদেরকে ইসলাম ধর্মের যথার্থ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে তা কোনভাবেই কার্যকর হচ্ছে না। উপরন্ত দ্বন্দ্ব-বিবাদ, বিসংবাদ ও বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এমতাবস্থায় ইসলামী বিধানের আলোকেই কেবল মাত্র মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের স্থায়ী সমাধান সম্ভব। শ্রমিক ও মালিক উভয়ের নিজ নিজ অধিকার বুঝে পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই ইসলামী শরিয়াহ উভয়কেই নিজ নিজ কর্তব্য পালনে দায়িত্বশীল হতে বলেছে। শুধু মালিক বা শুধু শ্রমিক নয়; বরং উভয়কে সুসংহত ও পরিমিত আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান কৌশল : একটি হাদীসভিত্তিক পর্যালোচনা

মোঃ ইয়াকুব আলী*

[***Abstract***: *The main objective of this study is to highlight the unique teaching methods of the holy Prophet Muhammad (pbuh). His teachings came from Allah the Almighty and closely related to human success in the world and hereafter. He taught his students all necessary themes including personal, family, social, international, political, and economic matters. His teaching methods were so effective that the students' attention was always on their teacher, and they tried their best to implement the lessons in their lives. The teaching method of the Prophet (pbuh) remains equally relevant Today. If teachers adopt his ideals in their own lives and teach in the way he demonstrated, the learning outcomes will still be effective. There is no real alternative to following his teaching methods to build the country, nation, and ideal society. This is the demand of time to analyze his teaching methods. This article has been prepared using descriptive and analytical methods.*]

শব্দ সংকেত: শিক্ষা, জ্ঞান, কৌশল, পরিবেশ, প্রশ্ন, ইসলাম।

ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। আধুনিক যুগে শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য নানান পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে যার অনেকাংশই সফলতার মুখ দেখতে পারছে না। শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মাধ্যমে জ্ঞানের যে বিকাশ ঘটার কথা তা হচ্ছে না। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। যেমন: জ্ঞান আহরণে অনীহা, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া, জ্ঞান দানের ক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষকের অনুপস্থিতি ইত্যাদি। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যিনি আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন একজন সফল ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে। নিজের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا" নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[১] তিনি এমন এক কালজয়ী আদর্শ শিক্ষক যিনি তাঁর ছাত্রদের মন ও মননে এমন এক জ্ঞানের দ্যুতি ছড়িয়েছিলেন যে, তারা আমূল বদলে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রেই তারা

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

১. *সুনানু ইবনু মাজাহ*, (দামেশক ও বৈরুত: দারুর রিসালাহ আল 'আলামিয়্যাহ ১৪৩০ হি. ২০০৯ খ্রি.) بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ হাদীস নং ২২৯

অভাবনীয় সফলতা লাভ করতে পেরেছিলেন। নানা অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত এক অবাধ্য সমাজের মাঝে নবীজি (সা.) এমনভাবে শিক্ষার আলো জ্বালালেন যার আলোয় তাঁর শিক্ষার্থীগণ এমন খাঁটি মানুষে পরিণত হলেন যে, তাদের মতো ভালো মানুষ কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আর আসবে না।[২] তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আদর্শ সমাজ ও জ্ঞানমুখী প্রজন্ম গড়ে তুলতে আদর্শ শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ গ্রহণ জরুরি। সে মহান শিক্ষকের শিক্ষাদান কৌশল এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হলো।

সাহিত্য পর্যালোচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান কৌশল নিয়ে বেশকিছু গ্রন্থ ও গবেষণা-প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদের রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি, শায়খ আবুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর الرسول المعلم وأساليبه في التعليم, ড. এস দাউদ শাহের Prophet Muhammad (pbuh) as a Teacher, তাওফিক মুহাম্মাদ সামি ও অন্যান্যদের গবেষণা প্রবন্ধ The Teaching Methods and Techniques of The Prophet (pbuh): An Exploratory Study. অন্যতম। তাদের সকলের লিখনীতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা থাকলেও পুরোপুরি হাদীসভিত্তিক আলোচনা করা হয়নি কিংবা যা করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে পুরোপুরি হাদীসনির্ভর গবেষণার উদ্দেশ্যেই সময়ের চাহিদায় আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে গবেষণার ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশী-বিদেশী বইপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ, জার্নাল ও ইন্টারনেট ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং যথাস্থানে সেগুলোর রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু প্রবন্ধটি হাদীসভিত্তিক তাই সকল কৌশল বর্ণনার ক্ষেত্রেই হাদীসের এবং ক্ষেত্রবিশেষে কুরআনের আয়াতের আশ্রয়গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary Source) ব্যবহার করে বর্ণনামূলক (Descriptive) ও বিশ্লেষণাত্মক (Analytical Method) পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ভাষার তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

---

২. خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ". قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا " ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার (সাহাবীগণের) যুগ। এরপর তৎ-সংলগ্ন যুগ (তাবেয়ীদের যুগ)। এরপর তৎ-সংলগ্ন যুগ (তাবে-তাবেয়ীদের যুগ)। ইমরান (রা.) বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু'যুগ অথবা তিন যুগ বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। তারপর (তোমাদের যুগের পর) এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু পূরণ করবে না। পার্থিব ভোগ-বিলাসের কারণে তাদের মাঝে চর্বিযুক্ত স্থূলদেহ প্রকাশ পাবে।

সহীহুল বুখারী, (দামেশক: দারু ইবনি কাসীর, ১৪১৪ হি. ১৯৯৩ খ্রি.) بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ হাদীস নং ৩৪৫০

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান কৌশল

নবীজি (সা.) এর সময়ে শিক্ষাদান পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিকরূপে ছিল না। মক্কী জীবনে দারুল আরকামে সীমিত সংখ্যক সাহাবি সময়-সুযোগ বুঝে একত্রিত হতেন যাদেরকে তিনি তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও কুরআন বিষয়ে কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিকরূপের মতো শিক্ষা দিতেন। সেখানে কারো কারো খাবারের ব্যবস্থা ছিল স্বচ্ছল সাহাবিদের বাড়িতে। নবীজি (সা.) হজের সময় মক্কার বাইরে থেকে আসা লোকদের কাছে গিয়ে ইসলামের সুমহান বার্তা পৌঁছে দিতেন। আবার কতক সাহাবিকে কুরআনের কিছু জ্ঞান শিখিয়ে অন্যদের শেখানোর জন্য পাঠাতেন, যাদেরকে 'মুকরী' ও 'মুয়াল্লিম' বলা হতো। মদিনার জীবনে মসজিদে নববীতে একদল সাহাবি তাঁর শিক্ষার্থী হিসেবে সবসময় থাকতেন এবং সেখানে আনসার সাহাবি ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ঘরে কিছু পানাহারের ব্যবস্থা করা হতো। আবার কিছু সংখ্যক সাহাবি সময়-সুযোগ করে মাঝে মাঝে এসে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগ্রহণ করতেন, কেউবা একবার এসে ইসলামের মৌলিক বিষয় শিখে তার গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রচার করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কৌশল অবলম্বন করতেন। এতে তাঁর শিক্ষাদান হতো আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য, মনে রাখতে সহায়ক। এককথায় যাকে একটি ফলপ্রসূ শিক্ষাদান বলা যায়। আমরা তাঁর শিক্ষাদান কৌশলকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করে সেগুলোকে হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করছি-

১. প্রস্তুতিমূলক কৌশল
২. উপস্থাপনাগত কৌশল
৩. পদ্ধতিমূলক কৌশল
৪. প্রয়োগগত কৌশল

১. প্রস্তুতিমূলক কৌশল

১. ১. শিক্ষাদানে উপযুক্ত পরিবেশ নির্বাচন

শিক্ষাদান কিংবা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকা অপরিহার্য। কোলাহলপূর্ণ, বিশৃঙ্খল পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাই প্রথমে শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। বিদায় হজে লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে ভাষণ দানের আগে তিনি তাদেরকে চুপ থাকার ব্যাপারে নির্দেশ দেন। এরপর বক্তব্য তুলে ধরেন। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন-

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, লোকদেরকে নীরব হতে বল। তারপর তিনি বললেন, আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেওনা যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।[৩]

৩. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ*, *হাদীস নং ৬৬৬৯*

এছাড়াও অনেক মানুষের উপস্থিতির মজলিশে তিনি একাধিকবার সালাম দিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। ফলে সবাই তাঁর আগমনের বিষয়টি বুঝতে পারত। এতে পাঠদানের জন্য একটি কোলাহলমুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠতো আর সেখানে নবীজি (সা.) বক্তব্য দিতেন।

১. ২. আকর্ষণ সৃষ্টি বা মেধাশক্তি বিকাশে ছাত্রদের প্রশ্ন করা

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ অথবা তাদেরকে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুপ্ত মেধার বিকাশ ঘটাতে বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করা উচিত। শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করলে তারা উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হয়। কেননা নিত্যনতুন প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে নিত্যনতুন জ্ঞান অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে। তাছাড়া একজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষক বা প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তাই আগে থেকেই তাকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। নবীজি (সা.) কখনো কখনো তাঁর সাহাবীদেরকে এভাবে প্রশ্ন করতেন। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন

يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ". قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ " لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا

হে মুয়ায, তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সা.) ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যে ইবাদাতে কাউকে শরীক করেনি আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।[৪]

এভাবে নানা প্রশ্ন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বক্তব্যের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তাদের জ্ঞান যাচাই করেছেন। পাঠদানকালে এভাবে শিক্ষকগণ যদি ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করেন তবে ক্লাসে ছাত্রদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং উত্তর দেবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন এবং কৌশল শিখতে তারা আগ্রহী হবে।

১. ৩. গল্প বলা

শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য অনেক সময় গল্প বলার প্রয়োজন পড়ে। গল্প বলার মাধ্যমে যে কোনো পাঠ সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও আনন্দঘন হয়ে উঠে। এইজন্যই শিক্ষাদানের সময় যে শিক্ষক নানান শিক্ষণীয় গল্প বলে থাকেন তার প্রতি ছাত্রদের আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়, শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষকের পাঠে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে। তাছাড়া কোন কঠিন বিষয় পড়ানোর মাঝে গল্প বললে সেটা ছাত্রদের মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়ক হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় ইতিহাসের পাঠ থেকে নানান গল্প বলতেন। এ গল্পের প্রতিটির পরতে পরতে ছিল শিক্ষা। গল্প বলার ক্ষেত্রেও তিনি কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না। গল্পে রং চড়িয়ে অতিরঞ্জন করতেন না। মূলত তিনি ছিলেন এমন এক বাগ্মী শিক্ষক, যার বর্ণনায় যে কোনো বিষয় মানুষের কাছে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতো। হাদীসে এসেছে

৪. *সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ হাদীস নং ২৭০১*

كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِي. قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِينٍ

বনী ইসরাঈলের এক ব্যাক্তি যাকে 'জুরাইজ' বলে ডাকা হতো। একদা ইবাদাতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল, আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। (জবাব না পেয়ে) তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ, কোন ব্যভিচারিণীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদাত খানায় থাকত। একবার তার কাছে একজন মহিলা আসল। সে (অসৎ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ অস্বীকৃতি জানাল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের কাছে গিয়ে তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ করে। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এটি কার থেকে? মহিলা বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা জুরাইজের কাছে আসল এবং তার ইবাদাতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে এনে গালি-গালাজ করল। তখন জুরাইজ ওজু সেরে সালাত আদায় করলেন। এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে শিশু, তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল ওই রাখাল। তারা (বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঘটনার সত্যতা জেনে জুরাইজকে) বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে (করতে পারো)।[৫]

এ গল্পটি বলার মাধ্যমে নবীজি (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে এ শিক্ষাই দিলেন যে-

* নফল ইবাদতে মগ্ন থাকার চেয়ে বাবা-মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
* বাবা-মায়ের বদদু'আ সন্তানের জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। সুতরাং বাবা-মায়ের হকের প্রতি সন্তানের খেয়াল রাখা জরুরি।
* একান্ত বাধ্য না হলে কারো জন্য বদদু'আ করা উচিত নয়।
* সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত যদিও তা দেরিতে ঘটে।
* এভাবে নানান ঘটনা বলে নবীজি (সা.) মানুষকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দিয়েছেন।

একইভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং তা থেকে মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন। যেমন: হযরত ইবরাহীম, হযরত মুসা, হযরত নূহ, হযরত সালিহ আলাইহিমুস সালামের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনের শুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ৪. দেহ-মনের সমন্বয় সাধন

শিক্ষাদানের জন্য মুখের বক্তব্য যেমনিভাবে গুরুত্বপূর্ণ, পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গি অথবা দেহাবয়বের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর প্রকাশও গুরুত্বপূর্ণ। দেহ-মনের সমন্বিত পাঠদান শ্রোতার কাছে পাঠকে জীবন্ত করে তোলে। এতে বিষয়টির গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য শিক্ষার্থীদের অন্তরে গেঁথে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমন ছিলো, যা তাঁর সাহাবীদের অন্তরে

৫. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *بَابُ: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا} نَبَذْنَاهُ أَلْقَيْنَاهُ* হাদীস নং ২৩৫০

গেঁথে যেত। তাইতো তাঁর কথাগুলো সাহাবায়ে কেরাম যথাযথভাবে মুখস্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং অন্যের কাছে হুবহু বর্ণনা করতে পেরেছিলেন। নবীজি (সা.) যখন জান্নাতের বর্ণনা দিতেন তখন তাঁর মুখে আনন্দ প্রকাশ পেতো এবং জাহান্নামের বর্ণনা দেবার সময় চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যেত। তেমনিভাবে কোন অন্যায়ের ব্যাপারে কেউ সুপারিশ করলে ক্রোধে তাঁর চেহারা লাল হয়ে যেত। কোন বিষয়ে সতর্ককালে তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হতো। হাদীসে এসেছে

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ " صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ " . وَيَقُولُ " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ " . وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " . ثُمَّ يَقُولُ " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ وَعَلَىَّ

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন খুতবা দিতেন তখন তার চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ হত, স্বর উঁচু হত এবং কঠোর রাগ প্রকাশ পেত। মনে হত তিনি যেন আক্রমণকারী বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন, বলছেন, তারা তোমাদের সকালে আক্রমণ করবে এবং বিকেলে আক্রমণ করবে। তিনি বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দুটির ন্যায় এবং তিনি (স.) মধ্যম অঙ্গুলী ও শাহাদাত অঙ্গুলী মিলিয়ে দেখাতেন। বলতেন, উত্তম বাণী হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ (সা.) এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদআত (দ্বীনে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ।) সকল বিদআতই হলো পথভ্রষ্টতা। এরপর বলতেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার প্রাণ হতে অধিক প্রিয়তর। যে মৃত ব্যক্তি মাল সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবার পরিজনদের জন্য। আর যে মৃত ব্যক্তি ঋণ অথবা ছোট ছেলেমেয়ে রেখে যায়, তাদের দায়িত্ব আমার উপর।[৬]

বক্তব্যদানের ক্ষেত্রে সবসময়ই যে এমন হতো বিষয়টি তা নয়। বরং পরিস্থিতি এবং বিষয়বস্তু বিবেচনার আলোকে তার প্রকাশভঙ্গি দেখা যেত। কখনোবা বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। যেমন আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) বলেছেন

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

এক মুমিন আর এক মুমিনের জন্য ইমারততুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে। আর তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।[৭]

২. উপস্থাপনাগত কৌশল

২. ১. মধ্যমগতি অবলম্বন করা

পাঠদানের সময় শিক্ষক যদি কোন প্রকারের বিরতি ছাড়া একাধারে বলতেই থাকেন অথবা এত ধীরে ধীরে একটির পর আরেকটি শব্দ বা বাক্য বলেন যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায় তবে

---

৬. *সহীহ মুসলিম (কায়রো: মাতবা'আতু ঈসা আলবাবী আলহালাবী, ১৩৭৪ হি. ১৯৫৫ খ্রি.) بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ وَالْخُطْبَةِ হাদীস নং ৮৬৭*

৭. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ* হাদীস নং ৫৬৮০

সেটা শিক্ষার্থীদের নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়। সুতরাং পাঠদান খুব দ্রুতগতি ও অতি ধীরগতি না হয়ে মধ্যমগতিতে হওয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শিক্ষার্থীদের পড়ানোর ক্ষেত্রে থেমে থেমে কথা বলতেন। দুর্বোধ্য হয়ে যায় এমন দ্রুতগতি অথবা ছন্দ হারিয়ে যায় এমন ধীরগতিতে বক্তব্য না দিয়ে বরং তিনি সহজবোধ্য, মধ্যমগতিতে সাবলীল ভাষায় বক্তব্য দিতেন। হাদীসে এসেছে

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ مِثْلَ سَرْدِكُمْ

একদিন আয়েশা (রা.) (উরওয়াকে) বলেন, আবূ হুরায়রার আচরণে তুমি কি আশ্চর্য হবে না? সে আমার হুজরার নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস আমাকে শোনাতে চেয়েছিল, আর এ সময় আমি সালাতরত ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার আগেই সে চলে গেল। আমি তাকে পেলে বলতাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমার মতো দ্রুত কথা বলতেন না; (বরং ধীরে বলতেন, যেন সকলে তা বুঝতে পারে।)[৮]

অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ بَيِّنَهُ فَصْلٌ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের মতো দ্রুত গতিতে কথা বলতেন না, বরং তিনি ধীরে-সুস্থে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন, ফলে তার কাছে বসা লোক খুব সহজেই তা আয়ত্ব করে নিতে পারত।[৯]

অর্থাৎ নবীজি (সা.) মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করতেন। কথা বলার সময় এত দ্রুত বলতেন না যে তা অস্পষ্ট রয়ে যায় কিংবা এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্য জড়িয়ে যায়, ফলে তা দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। আবার এত ধীরেও বলতেন না যে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়, ফলে শুনতে অনাগ্রহ তৈরি হয়। বরং মধ্যবর্তী অবস্থায় এমনভাবে কথা বলতেন যেন সবাই তার বক্তব্য বুঝে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারে।

২. ২. উপমা ব্যবহার

শিক্ষাদান ও শিখনের ক্ষেত্রে উপমার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উদাহরণ দিলে যে কোন বিষয় খুব সহজেই বোঝা যায়। তাইতো যে কোন বিষয় আলোচনার পরে সেটাকে বোধগম্য এবং স্মৃতিপটে ধরে রাখতে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়। বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর

---

৮. *সুনানু আবি দাউদ* (দামেশক ও বৈরুত: দারুর রিসালাহ আল 'আলামিয়্যাহ ১৪৩০ হি. ২০০৯ খ্রি.) بَابٌ فِي سَرْدِ الْحَدِيثِ হাদীস নং ৩৬৫৫

৯. *সুনানুত তিরমিজি*, (দামেশক ও বৈরুত: দারুর রিসালাহ আল 'আলামিয়্যাহ ১৪৩০ হি. ২০০৯ খ্রি.), *بَابُ فِي كَلاَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* হাদীস নং ৩৯৬৮

ছাত্রদেরকে শেখানোর সময় বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে সহজ করে তুলতেন। তাঁর দেয়া উপমাগুলো এতটাই সহজ এবং সাবলীল ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম খুব সহজেই বিষয়টিকে বুঝে নিতে পারতেন। নবী (সা.) বলেছেন-

مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ ".

আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনকারী এবং তা লঙ্ঘনকারীর উপমা হলো সে যাত্রীদল, যারা লটারির মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নেয়। ফলে কারো স্থান হলো নীচতলায় আর কারো উপর তলায়। যারা নীচতলায় ছিল তারা পানি নিয়ে উপর তলার লোকদের নিকট দিয়ে তাদের স্পর্শ করে আসত। এতে তারা বিরক্তি প্রকাশ করত। তখন এক লোক কুড়াল নিয়ে নৌযানের নীচের অংশ ফুটো করতে লেগে গেল। এ দেখে উপর তলার লোকজন তাকে এসে জিজ্ঞেস করল তোমার হয়েছে কী? সে বলল, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পেয়েছ। অথচ আমাদের পানির প্রয়োজন আছে। এ মুহূর্তে তারা যদি এর দু'হাত চেপে ধরে তাহলে তাকে যেমন রক্ষা করা হলো তেমনি নিজেদেরও রক্ষা হলো। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করা হলো এবং নিজেদেরও ধ্বংস করা হলো।[১০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বক্তব্যকে মানুষের নিকট আরো বেশি বোধগম্য ও প্রাণবন্ত করার জন্য এত বেশি উপমার ব্যবহার করেছেন যে তাঁর দেয়া উপমাগুলোর উপরে আলাদা রচিত গ্রন্থ রয়েছে। যেমন হুসাইন সুলাইমান মুহাম্মদ সংকলিত الأمثال في كلام النبي যা ২০১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় এবং আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন জাফর বিন হাইয়ান আল-আনসারী (মৃত্যু ৩৬৯ হিজরি) কর্তৃক সংকলিত كتاب الأمثال في الحديث النبوي যা দারুস সালাফিয়া, মুম্বাই, ভারত থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২. ৩. হাস্যরসের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন। সাহাবী (রা.) গণ বলেছেন, তাঁর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকেই দেখা যায়নি। তবে উচ্চস্বরে হাসা উচিত নয়। আল কুরআনে বেশি হাসাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

সুতরাং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তারা অল্প হাসুক এবং বেশি কাঁদুক।[১১]

হাস্যরস মানুষের জীবনে আনন্দ বয়ে আনে। শিক্ষার মাধ্যম যদি আনন্দদায়ক হয়, তবে সেটি যেমন উপভোগ্য হয় তেমনি স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়। কৌতুকের মাধ্যমে কখনোবা মানুষকে চমকে দেয়া হয়। এ চমকের পর যে কোনো সুসংবাদ মানুষকে আন্দোলিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কখনো হাস্যরসের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। হাদীসে এসেছে

---

১০. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *...بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلاَتِ وَقَوْلِهِ: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}* হাদীস নং ২৫৪০

১১. আল কুরআন, ০৯: ৮২

أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْنِي . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ " . قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوقُ "

একদা এক লোক নবী (সা.)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। নবী (সা.) বললেন, আমি তোমাকে আরোহণের জন্য একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিবো। লোকটি বললো, উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো? নবী (সা.) বললেন, উটকে তো উষ্ট্রীই জন্ম দেয়।[১২]

অন্য হাদীসে আছে

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : أَتَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : " يَا أُمَّ فُلانٍ ، إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ " ، قَالَ : فَوَلَّتْ تَبْكِي , فَقَالَ : " أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى , يَقُولُ : إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا

হযরত হাসান (রা.) হতে বর্ণিত। একবার এক বৃদ্ধা মহিলা নবী (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমি-জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, ওহে, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, (তা শুনে) সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। নবী (সা.) বললেন, তাকে এ মর্মে খবর দাও যে, তুমি বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। আর তাদেরকে করেছি কুমারী।"[১৩] [১৪] প্রেময়ী, সমবয়স্কা।

উপর্যুক্ত দুটি হাদীস থেকে দেখা যায় নবীজি (সা.) দুজন মানুষের সাথে হাস্যরস করেছেন। এগুলো সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর মেশার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হাস্যরসের পর নবীজি (সা.) একজন মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকটা বড় উটই অন্য উটনীর বাচ্চা। আবার একজন মহিলাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, জান্নাতে একজন নারী বৃদ্ধা অবস্থায় থাকবে না বরং সেও চিরকুমারী, চিরযৌবনা হবেন।

২. ৪. গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি করা

শিক্ষাদানের সকল বিষয় সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাইতো যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে একাধিকবার বলার মাধ্যমে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্ববহ এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনবার পর্যন্ত উল্লেখ করতেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতেন। হযরত আনাস ইবন মালেক (রা.) বলেন

---

১২. *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, بَابٌ فِي الْمِزَاحِ হাদীস নং ৪৯৯৮

১৩. জামে-আত তিরমিজি, *আশশামায়েলে মাহমুদিয়া ওয়াল খাসাইসুল মুস্তাফাবিয়্যাহ*, (মক্কাতুল মুকাররামা: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ ১৪১৩ হি. ১৯৯৩ খ্রি.), باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ﷺ হাদীস নং ২৪১

১৪. আল কুরআন, ৫৬: ৩৬-৩৭

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

রাসূল (সা.) তাঁর কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেনো তা ভালোভাবে বোঝা যায়।[১৫]

হযরত আবূ হাতিম মুযানী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ ".

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ" . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তার কাছে বিয়ে দিয়ে দিবে। তা যদি না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যদি তার মাঝে (কুফুর দিক থেকে) কিছু ত্রুটি থাকে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তার কাছে বিয়ে দিয়ে দিবে। এই কথা তিনি তিনবার বললেন।[১৬]

মূলত নবীজি (সা.) কোন বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানোর জন্য একাধিকবার বলতেন যেন সেটাকে তারা গুরুত্বের সাথে নেয় এবং স্মরণে রাখে। একইভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যও অনেক মানুষের উপস্থিতির জায়গায় নবীজি (সা.) তিনবার পর্যন্ত সালাম দিতেন।

২. ৫. চিত্রাঙ্কনের সহায়তা নেওয়া

পাঠকে বোধগম্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রেখা, সারণি বা চিত্রাঙ্কন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তারা দ্রুত বুঝতে পারে এবং সেটি তাদের স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের রেখা বা চিত্র অঙ্কন করতেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সহজেই বুঝিয়ে দিতেন। হাদীসে এসেছে

خَطَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا.

একদিন নবী (সা.) একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মধ্যখানে একটি রেখা টানলেন, যা তা থেকে বের হয়ে গেল। তারপর দু'পাশ দিয়ে মধ্যের রেখার সঙ্গে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ মাঝের রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা বেষ্টন করে আছে। আর বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বন্ধন। যদি সে এর একটি এড়িয়ে যায়, তবে আরেকটি তাকে দংশন করে। আর আরেকটি যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে।[১৭]

---

১৫. *সুনানুত তিরমিজি*, প্রাগুক্ত, *بَاب فِي كَلاَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* হাদীস নং ৩৯২৯

১৬. *সুনানুত তিরমিজি*, প্রাগুক্ত, *بَاب مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ* হাদীস নং ১০৮৫

১৭. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *بَابُ فِي الأَمَلِ وَطُولِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}* ... হাদীস নং ৬০৫৪

এভাবে একটি চতুর্ভুজ একে তার ভেতরে বিভিন্ন রেখা টেনে মানুষের আয়ু ও প্রত্যাশা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মানুষের করণীয় বিষয়ে নবীজি (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন। তবে কোনো প্রাণির চিত্রাংকন বা ছবি সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞার যে বিষয়টি অন্য সব হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ।

৩. পদ্ধতিমূলক কৌশল

৩. ১. সফলতার স্বীকৃতি দান

শিক্ষার্থীকে কোন প্রশ্ন করা হলে সে যদি সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে সেটাকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রশংসা করা হলে জ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধিপায় এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা এতে অনুপ্রাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ছাত্রদের থেকে প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে কখনো কখনো তাদের প্রশংসা করতেন। বুকে হাত চাপড়ে 'সাবাস' বলতেন এবং তার জন্য দু'আ করতেন। একবার তিনি বললেন

يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَىُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ . قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ " وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ

রাসূল (সা.) আবুল মুনযিরকে[১৮] জিজ্ঞেস করেন, আল কুরআনে কোন আয়াতটি সবচেয়ে ফযিলতপূর্ণ? প্রথমে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (সা.) পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন 'আয়াতুল কুরসি'। তখন রাসূল (সা.) তার বুকে হাত রেখে বলেন, 'সাবাস!'। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য ইলম অর্জন সহজ করুন।'[১৯]

উক্ত হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট যে, কোন প্রশ্নের উত্তর ছাত্রদের দেবার সম্ভাবনা থাকলে তাদেরকে উত্তর দিতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে অভিনন্দন জানানো, উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলা এবং তার জন্য দু'আ করা উচিত।

৩. ২. অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন করা

কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমেই সজাগ করে তুললে অথবা বিষয়টির গুরুত্ব আগেই তুলে ধরলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি মনোযোগী হয়। তারা একাগ্রচিত্তে শিক্ষকের কথা শুনতে আগ্রহবোধ করে। ফলে একজন আদর্শ শিক্ষকের শিখনফল অত্যন্ত কার্যকরী হয়। শিক্ষক তাতে যেমন সন্তুষ্ট হতে পারেন তেমনিভাবে শিক্ষার্থীরাও বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) পাঠদানের সময় তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন করতেন। হযরত আবূ সাঈদ ইবন মুয়াল্লা (রা.) বলেন

مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ " . فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي. فَقَالَ " أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

---

১৮. আবুল মুনজির বিখ্যাত সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কাব রা এর কুনিয়াত। নবীজি (সা.) তাঁকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের আনসার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামগ্রহণের আগে তিনি ছিলেন ইহুদী পণ্ডিত। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি ওহী লেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বিতীয় আকাবার শপথ, বদর, ওহুদ, খন্দকসহ নানা যুদ্ধ-সংগ্রামে নবীজি (সা.)-এর সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, *بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ* হাদীস নং ২৫৮

وَلِلرَّسُولِ) ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ " فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ "(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ

রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিলেন, আমি সালাত শেষ না করে আসিনি। এরপর আমি আসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাঁধা দিয়েছিল? আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি একথা বলেননি, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দাও"? তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দিব না? অত:পর যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদ থেকে বের হতে লাগলেন, আমি তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে সূরাটি হলো 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন'। এটি হলো পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে।[২০]

এখানে লক্ষণীর বিষয় হলো নবীজি (সা.) তাঁর সাহাবীকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাটি জানানোর জন্য ডেকেছেন এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই সেটি জানিয়ে দেবেন কিনা বলে জিজ্ঞাসা করে তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে ঐ সাহাবী (রা.) তাঁকে স্মরণ করানোর পর তিনি উক্ত সূরাটি তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

৩. ৩. আশা ও ভীতি জাগানোর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি

আশা ও ভীতি মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের মাঝে যদি আশা না থাকে তবে সে হতাশ হয়ে কর্মোদ্যম হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার তার ভেতরে যদি কোনো প্রকারের ভীতি না থাকে তবে সে উদ্ধত-অহংকারী হতে পারে, সমাজ বিধ্বংসী কাজ করতে পারে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, আশা ও ভীতি- দুটিই মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলে আকরাম (সা.) বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাহাবীদেরকে অনাগত জীবন সম্পর্কে আশার বাণী শোনাতেন, কখনোবা ভীতি প্রদর্শন করতেন এবং করণীয় জানিয়ে দিতেন। সাধারণত তাঁর আশা এবং ভীতির বক্তব্য ছিল আখিরাতের বিষয়কে কেন্দ্র করে। তবে দুনিয়ার বিষয়েও মাঝে মাঝে তিনি বক্তব্য দিতেন। তিনি যেমনিভাবে জাহান্নামের বর্ণনাদানের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করতেন, তেমনিভাবে জান্নাতের নেয়ামতরাজির বর্ণনার মাধ্যমে উৎসাহিত করতেন। আল্লাহর রহমাত এবং করুণার বর্ণনা দিয়ে যেমনিভাবে আশার সঞ্চার করতেন, তেমনিভাবে আল্লাহর ক্রোধ এবং শাস্তির বর্ণনা দিয়ে ভীতির সঞ্চার করতেন এবং তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশনা দিতেন।

একদিন সকালে নবীজি (সা.) সাহাবীদের কাছে দাজ্জাল[২১] সম্পর্কে এমনভাবে আলোচনা করলেন যে, তারা মনে করতে শুরু করলেন, হয়তো দাজ্জাল পাশের বাগানে

---

২০. *সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, بَابُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ হাদীস নং ৪৪২৬*

২১. দাজ্জাল, আদম (আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফিতনা। কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ.)-এর আগমনের আগে ইরানের ইস্পাহান নগরী থেকে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সে মূলত ইহুদিদের নেতা হবে। ফলে তার আত্মপ্রকাশের পর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সত্তর হাজার ইহুদি তার সঙ্গী হয়ে পুরো বিশ্বে হত্যাযজ্ঞ চালাবে। দুনিয়াতে সে মোট ৪০ দিন অবস্থান করবে যার প্রথম দিন হবে ১ বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন ১ মাসের সমান, তৃতীয় দিন ১ সপ্তাহের সমান এবং বাকি দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই

লুকিয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলায় সাহাবী (রা.) গণ পুনরায় তাঁর কাছে এলে তাদের চেহারায় তিনি ভীতির স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন-

مَا شَأْنُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَقَالَ " غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

তোমাদের কী হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এতে আপনি কখনো তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন, আবার কখনো বড় করে তুলে ধরেছেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, দাজ্জাল বুঝি এ খেজুরের বাগানের মধ্যেই আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, দাজ্জাল নয়, বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে অন্যকিছুর অধিক ভয় করছি। তবে শোন, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয়, তবে আমি নিজেই তাকে প্রতিহত করব। তোমাদের প্রয়োজন হবে না। আর যদি আমি তোমাদের মধ্যে না থাকাবস্থায় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয়, তবে প্রত্যেক মুমিন লোক নিজের পক্ষ হতে তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তা'আলাই হলেন আমার পক্ষ হতে তত্ত্বাবধানকারী।[২২]

এখানে নবীজি (সা.) মানুষকে দাজ্জালের ফিতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য দাজ্জালের ব্যক্তিত্বকে নানানভাবে উপস্থাপন করেছেন, একইসাথে মুমিনরা যেন হতাশ হয়ে না পড়ে তাই তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানের আশার বাণী শুনিয়েছেন।

৩. ৪. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান

পবিত্র কুরআনুল কারীমের একটি নির্দেশ হলো যদি কেউ কোনো বিষয়ে না জানে তবে ঐ বিষয়ে যিনি পারদর্শী তাকে জিজ্ঞাসা করে বিষয়টি ভালো করে জেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশ্ন করাকে অজ্ঞতার প্রতিষেধক বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) বলেছেন

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

নিশ্চয়ই অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো প্রশ্ন করা।[২৪]

শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতে গেলে নানান ধরনের প্রশ্ন তাদের মনে জাগতে পারে, যেগুলোর উত্তর জানতে তারা আগ্রহী থাকে। অনেক সময় যথার্থ উত্তর না পেলে আলোচ্য

হবে। ঈসা (আ.) দুনিয়াতে এসে দাজ্জালকে ধাওয়া করে ফিলিস্তিনের 'বাবে লুদ' নামক জায়গায় হত্যা করবেন।

২২. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, *بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّالِ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ* হাদীস নং ২৯৩৭

২৩. **আল কুরআন: ১৬: ৪৩**

২৪. *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, باب فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ হাদীস নং ৩৩৭

বিষয়টিও অস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন বিষয়ে শিক্ষা দিলে এবং তখন সাহাবীদের মনে কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হলে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। হযরত আবূ যার (রা.) বলেন

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ " . قَالَ قُلْتُ أَىُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا " . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ " تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ " تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন, সে গোলাম আযাদ করা উত্তম, যে মুনীবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান। আমি আরয-করলাম আমি যদি তা করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কোন কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা ভাঙ্গা-টুটা কিছু মেরামত করে দেবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি আমি এমন কোন কাজ করতে অক্ষম হই? তিনি বললেন, তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে। এ হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সাদাকাহ।[২৫]

৩. ৫. বারংবার পাঠের মাধ্যমে কঠিন বিষয় আয়ত্ত করার পরামর্শদান

বারংবার পাঠের মাধ্যমে যে কোনো বিষয়কে আয়ত্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে যেমন দ্রুত মুখস্ত হয় তেমনি স্মৃতিতে স্থায়ী হয়। রাসূলে আকরাম (সা.) বারংবার পাঠের মাধ্যমে যে বিষয়টি আয়ত্ত করার পরামর্শ দিতেন। তাঁর শিক্ষার্থীরা বারংবার পাঠের মাধ্যমে তা আয়ত্ত করে নিতেন। নবী (সা.) বলেন

بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَوْ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ

কতই না মন্দ তোমাদের জন্য এ কথা বলা- অমুক আয়াতটি আমি ভুলে গিয়েছি বরং ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআন স্মরণ রাখতে নিয়মিত প্রয়াস চালিয়ে যাও। কসম সে সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ। পশু যেমন বন্ধন থেকে পালায়, মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন কারীম তদপেক্ষা অধিক হারিয়ে যায়।[২৬]

৪. প্রয়োগগত কৌশল

৪. ১. হাতে-কলমে শিক্ষাদান

শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো হাতে-কলমে শিক্ষা। বাস্তবিক জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেগুলো যদি শিক্ষক ব্যবহারিকরূপে দেখিয়ে দেন, তবে তা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্যই কুরআনের উপর আমলের

২৫. *সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ হাদীস নং ৮৪*

২৬. *সুনানুত তিরমিজি, প্রাগুক্ত, وَمِنْ سُورَةِ الْحَجِّ بَابٌ: হাদীস নং ৩১৭১*

বাস্তবিক রূপ হলেন মহানবী (সা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শিক্ষার্থী তথা সাহাবীদেরকে বিভিন্ন বিষয় প্রায়োগিকভাবে শিখিয়েছেন। যেমন: সালাত-সাওম, হজ-যাকাত, বিচার-ফয়সালা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে তারা নবীজি (সা.) কে হুবহু অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিছু সংখ্যক সাহাবি মদিনার বাইরে থেকে এসে নবীজি (সা.)-এর সান্নিধ্যলাভ করেন। নবীজি (সা.)-এর পেছনে তারা সালাত আদায় করতেন। ফলে সালাত আদায়ের পদ্ধতি তারা হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করেন। ২০ দিন থাকার পর তাদের বাড়িতে ফেরার আগ্রহ দেখে নবীজি (সা.) কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে বলেন। তাঁর নির্দেশের ভেতরে একটি হল-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

তোমরা সালাত আদায় কর, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখেছো।[২৭]

৪. ২. পিতৃস্নেহে শিক্ষাদান

পিতা-মাতা মানুষের সবচেয়ে আপনজন। তারাই একজন সন্তানের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্খী। সন্তানকে লালন-পালন করতে তারা সহনশীল আচরণ করেন। তাদেরকে উত্তমভাবে সবকিছু শেখাতে তারা তৎপর থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতের জন্য পিতৃত্বের আসনে ছিলেন। তাই আদর-স্নেহ-ভালোবাসা সবকিছু দিয়েই তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে শেখাতেন। এ জন্যই তিনি বর্ণনা করেন

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ

আমি তোমাদের পিতার মতো, আমি তোমাদেরকে শিক্ষাদান করি।[২৮]

পিতৃস্নেহে শিক্ষাদানের মাধ্যমে নবীজি (সা.) তাঁর ছাত্রদের হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান লাভ করেছিলেন। ফলে তারা প্রিয় শিক্ষককে নিজেদের প্রিয়জন, আপনজন ভাবতেন। শিক্ষা গ্রহণে অনীহার পরিবর্তে তাদের মনে আগ্রহ কাজ করত। শিখনফল অত্যন্ত কার্যকরী হতো। বাবা-মা সন্তানকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে নানাভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যেমন:

ক. হাতে-কলমে শেখানো
খ. আবেগ-ভালোবাসা দেখিয়ে বোঝানোর মাধ্যমে
গ. শাসনের মাধ্যমে। সেটা সতর্কতা কিংবা সামান্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে হতে পারে
ঘ. সন্তানের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে

হাদীসে এসেছে, হযরত উমর ইবন আবূ সালামা (রা.) বলেন

كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ". فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ

---

২৭. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *بَابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ* হাদীস নং ৬০৫

২৮. *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ হাদীস নং ০৮

আমি ছোট ছেলে হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, হে বৎস, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছে থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।[২৯]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন

يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

হে বৎস, যখন পরিবার-পরিজনের নিকট প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে; এতে তোমার এবং তোমার গৃহবাসীর জন্য বরকত হবে।[৩০]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায় যে নবীজি (সা.) তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত মমতার সাথে শিক্ষা দিতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার পেছনের কারণগুলো জানিয়ে দিতেন। ফলে তার শিক্ষা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতো।

৪. ৩. শাসনের মাধ্যমে শিক্ষাদান

একজন আদর্শ শিক্ষক সর্বদাই ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণকামী হবেন। তিনি তাদেরকে যেমনিভাবে স্নেহ করবেন প্রয়োজনে রাগ করবেন, শাসন করবেন। বিশেষত যদি কোন অনর্থক কাজে জড়িত হয় অথবা আল্লাহর বিধি-বিধানের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তবে তিনি সে ব্যাপারে কঠোর হবেন। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে কখনো কখনো রাগ করেছেন, তাদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, সঠিক পন্থা এবং করণীয় বাতলে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করে যে

لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

আমি সালাতে (জামাতে) শামিল হতে পারি না। কারণ অমুক ব্যাক্তি আমাদের নিয়ে খুব লম্বা করে সালাত আদায় করেন। (বর্ণনাকারী আবূ মাসউদ (রা.) বলেন) আমি মহানবী (সা.)-কে কোন ওয়াযের মজলিসে সেদিনের তুলনায় বেশি রাগান্বিত হতে দেখিনি। (রাগতস্বরে) তিনি বললেন, 'হে লোক সকল, তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি কর! অতএব যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।'[৩১]

যারা সারাদিন পরিশ্রম করে কিংবা অসুস্থতা বা বার্ধক্য জনিত কারণে দুর্বল তাদের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় যথেষ্ট কষ্টের কারণ। সালাত আদায়ের নিয়ম হলো বিনয় ও মনোযোগের সাথে আগ্রহ নিয়ে আদায় করা। সুতরাং তাদের আগ্রহের ঘাটতি দেখা দিতে পারে এমন কোন কাজ করতে নবীজি (সা.) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

---

২৯. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *كتاب الأطعمة* হাদীস নং ৫০৬১

৩০. সুনানুত তিরমিজি, প্রাগুক্ত, بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ হাদীস নং ২৮৯৪

৩১. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ* হাদীস নং ৯০

৪. শাস্তিদানের মাধ্যমে সংশোধন

একজন শিক্ষক আদর-সোহাগ, স্নেহ-ভালোবাসা, উপদেশ দান কিংবা রাগ করার মাধ্যমে ছাত্রদের সংশোধন করে থাকেন। কিন্তু তার অপরাধের মাত্রা যদি গুরুতর হয় তবে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে সংশোধন করা প্রয়োজন। নতুবা ঐ শিক্ষার্থী বিগড়ে যেতে পারে কিংবা তার অপরাধকে চলমান রাখতে পারে যা ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। মানবতার আদর্শ, মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর সাহাবীদের কাউকে কাউকে তাদের অপরাধের মাত্রাভেদে শাস্তি দিয়েছেন। সে শাস্তি কখনো তিরস্কার, কখনো মানসিক অথবা শারিরীক ছিল। হাদীসে এসেছে হযরত উরওয়াহ ইবন যুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত

أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوْنَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيْهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتُكَلِّمُنِيْ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ خَطِيْبًا فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যামানায় মক্কা বিজয় অভিযানের সময়ে এক স্ত্রীলোক চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উসামাহ ইবন যায়দ (রা.)-এর কাছে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ জানালো। উরওয়াহ (রা.) বলেন, উসামাহ (রা.) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কথা বলা মাত্র তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামাহ (রা.)-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিগুলোর একটি শাস্তির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামাহ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হামদ-ছানা পাঠ করে বললেন, 'আম্মা বা'দ' তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার উচ্চ শ্রেণির কোন লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর হদ প্রয়োগ করত। তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই মহিলাটির ব্যাপারে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেয়া হলো।[৩২]

উল্লেখ্য, এটি ছিল চুরি অপরাধের শাস্তি, শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে শাস্তি প্রদান নয়। যে কারণে এ হাদীসটি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহানবী (সা.) কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনে প্রহার বা মারপিট করেছেন এমনটি প্রমাণিত নয়। তাছাড়া এ যুগের সর্বশেষ গবেষণা মতে, শিক্ষার্থীদেরকে মারপিটের মাধ্যমে শাসন সমীচীন নয়। বরং শাসনের

৩২. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, *باب من شهد الفتح* হাদীস নং ৪০৫৩

অন্যান্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করা চাই। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ফাতাওয়া ও গবেষণা সমগ্র-(২), মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ; পৃ. ১৪৬-১৫৩, নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনা, বাংলাবাজার, ঢাকা।)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ। তিনি চুরির অপরাধে হাত কাটা কিংবা বিবাহিতদের ব্যভিচারের অপরাধে রজমের বিধান কার্যকর করেছেন এবং প্রায়োগিকভাবেই তাঁর উম্মতকে সেটির পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তাছাড়া কোন অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করে সুপারিশ করা নিষেধ সেটিও বুঝিয়ে দিয়েছেন।

উপসংহার

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। ফলে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের জন্য আদর্শ। হোক তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। জাতি গঠনে একজন সফল নেতা ও শিক্ষক হিসেবেও তাঁর রয়েছে সুমহান আদর্শ। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ কিংবা শিক্ষাদানের কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়ার কারণে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে একটি সফল ক্লাস উপহার দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অথচ আধুনিক নানা উপাদান এখন তাদের কাছে আছে। আমরা যদি ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রসারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাদান কৌশলকে বাস্তবায়ন করতে পারি তবে নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষাদান অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। সুতরাং ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় সুন্দর পদ্ধতিতে উপস্থাপনের কোন বিকল্প নেই। পিতৃস্নেহে, হাতে-কলমে, উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে, কখনোবা শাসন কিংবা সতর্ক করার মাধ্যমে, মধ্যমগতিতে, স্পষ্ট ভাষায়, চিত্রাঙ্কন কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিক উপাদান ব্যবহার করে আমরা আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আরও সুন্দর ও সফল করতে পারি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

Glorious contribution of Muslim women in various branches of science

Dr. Muhammad Jamal Uddin*

[Abstract : Along with men, Muslim women have also made unforgettable contributions in various branches of knowledge. Moreover, their immense bravery in other important areas of Islam has taken their honor and status to a unique height. It is well known that Khadijah (ra) was the first woman to accept Islam. A woman Sumayya (ra) also became the first martyr for Islam. The authentic original manuscript of the Holy Qur'an was preserved by Ummul-Mu'minin Hafsa bint Umar Ibnil Khattab (ra). Likewise, the most authentic copy of Sahih al-Bukhari, the purest book after the Holy Qur'an, was also preserved by a woman. Her name is Karima bint Ahmad al-Marwaziyyah (ra) (d. 463/1070). In this way, for ages, women have passed the standard of deposit and reliability. The oldest university in the world was founded by a woman. The name of that noble Muslim woman was Fatima bint Muhammad al-Fihriya al-Qurayshiyyah. She is the founder of the first university in human history. In this way, the contribution of Muslim women in many social services and public welfare activities including Quran, Hadith, Tafseer, Fiqh and Fatwa, spread of institutional education, literature, art and calligraphy, have been forever lost in the pages of history. Empress Jubaida's construction of the aqueduct in Makkah-Madinah for the service of hajis still bears the indelible glory of history. And in all these matters, Ummul Mu'minin Aisha (ra) is considered a pioneer. Because her walk in all these branches of knowledge was incomparable. She opened the door of knowledge to the next generation. The main purpose of this article is to high light these contributions of Muslim women and present the lost golden history to the Modern generation. So that they are able to contribute to various branches of knowledge and science by following their predecessors. Because in Islam, acquiring knowledge is obligatory for all men and women. Therefore, realizing the importance of the matter, the article is written to encourage Muslim women to acquire Islamic knowledge. At the end of the books History of Islam, Rizal Shastra and At-Tabaqat, biographies and

* Essayist, writer and researcher.

chronicles of these Muslim women have been inserted very briefly under the title 'Kitabun Nisa'. All these flowers scattered from different gardens have been collected and a pearl garland has been tied in the bosom article. I hope it will continue to spread its fragrance from era to era. Qualitative research method has been followed in this article.]
key words : Knowledge, Muslim, Contribution, Women, Generation.

Introduction : Muslim women have also made indelible contributions in various branches of knowledge as well as men. Moreover, their immense bravery in other important areas of Islam has taken their honour and dignity to a unique height. It is well known that Khadijah (May Allah be pleased with her) was the first woman to accept Islam. A woman Sumayya (May Allah be pleased with her) also became the first martyr for Islam. The authentic original manuscript of the Holy Quran was preserved by Umm al-Mu'minin Hafsa bint Umar Ibnil Khattab (may Allah be pleased with her) Likewise, the most authentic copy of Sahih al-Bukhari, the purest book after the Qur'an, was also preserved by a woman. Her name is Karima bint Ahmad al-Marwaziyyah (R.) (d. 463/1070). Apart from this, they have been able to make a unique contribution by participating in various jihads of Islam. In this way, for ages, women have passed the standard of deposit and reliability. The oldest university in the world was founded by a woman. The name of that noble Muslim woman was Fatima bint Muhammad al-Fihriya al-Qurayshiyyah. She is the founder of the first university in human history.[1] In this way, the contribution of Muslim women in many social services and public welfare activities including Quran, Hadith, Tafseer, Fiqh and Fatwa, spread of institutional education, literature, art and calligraphy, has been forever lost in the pages of history. In the service of Hajjis, the construction of the aqueduct of the empress Jubayda in Makkah-Madinah still bears the indelible glory of history. And in all these matters Ummul Mu'minin Aisha (may Allah be pleased with her)

[1] Al-Qarawiyyin University, founded by this noble Arab Muslim woman, is located in the northern city of Fez, Morocco. According to UNESCO and Guinness Book of World Records, this university is the oldest in the world to provide higher education. Various scholars also refer to Al-Qarawiyyin as the oldest university. It was founded by Fatima al-Fihriya in 245/859. In the beginning it was a mosque. Adjacent to it was a madrasa. Later in Muslim history this institution took the lead as one of the centers of spirituality and learning. In 1963, the Moroccan government incorporated 'Al Qarawiyyin University' as part of its modern university system. Today it is known as 'Karawein University' (جامعة القرويين). This is the first university in the world.

is considered a pioneer. Because her walk in all these branches of knowledge was incomparable.[2] She opened the door of knowledge to future generations. The main purpose of this article is to highlight these contributions of Muslim women and present the lost golden history to the modern generation. So that they are able to contribute to various branches of knowledge and science by following their predecessors. Because in Islam, acquiring knowledge is obligatory for all men and women. Therefore, realizing the importance of the matter, the article is written to encourage Muslim women to acquire Islamic knowledge. At the end of the books History of Islam, Asmaur Rijal and At-Tabaqat, biographies and chronicles of these Muslim women have been inserted very briefly under the title 'Kitabun Nisa'. All these flowers scattered from different gardens have been collected and a pearl garland has been tied in the bosom article. I hope it will continue to spread its fragrance from era to era. Qualitative research method has been followed in this article.

1. Contribution of women in the scriptures of Hifzul Quran, Tajweed and Tafseer

Among the female ulama were numerous hafizas, qariyas and mufassira. Those who have made a great contribution to the service of the Quran as well as the hadith. Below is a brief introduction of some such women :

Sahabiyyah era

Muslims in all ages have attached great importance to the practice of the Holy Qur'an. Because Allah Ta'al Himself said about the importance of reciting the Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

"Those who recite the Book of Allah, establish prayer, and spend out of My provision secretly and publicly, those are they. Businesses that can expect to never suffer."[3] In the hadith, the Holy Prophet, (May Allah bless him and grant him peace), declared recitation of the Qur'an as the best nafl act of worship. اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ "Recite the

[2] Aisha (may Allah be pleased with her) is considered one of the greatest hadith narrators. According to Imam Az-Zahabi (r), she was the best female jurist of all times. During the caliphate of Abu Bakr, Umar and Uthman (ra), she used to give fatwas. Her extraordinary talent can also be seen in the world of poetry including Quran, Hadith, Tafseer, Miras, Fiqh and Fatwa.

[3] Al-Qur'an, Surah Fatir, 35:29.

Qur’an, because the Qur’an will intercede for the reciter on the Day of Resurrection”.[4] In another hadith, the Holy Prophet, (May Allah bless him and grant him peace,) said: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "The best of you is the one who learns the Qur'an himself and teaches it to others."[5] For each letter of the Qur'an, 10 good deeds are given. For example, the Prophet, (peace and blessings be upon him), said, "Whoever recites one letter of the Qur'an, he gets one good deed, and each good deed is equal to 10 good deeds."[6] According to Allama Az-Zurqani (ra), the author of the book 'Manahilul Irfan', during the lifetime of the Messenger of Allah, May the blessings and peace of Allah be upon him, many companions[7] and companions memorized this blessed Qur'an with great importance. In this context, the names of Aisha (May Allah be pleased with her) Hafsa (ra) and Umme Salama (ra) are particularly noteworthy among the Ummahatul Mu'minin. Apart from this, the names of Umme Waraka bint Abdillah Ibnil Harith Al-Ansariyyah (ra), Umm-Darda Al-Kubra (ra) and her mother Khaira Bint Abi Hadrad (ra) are also particularly noteworthy. All of them embraced the Holy Qur'an with meaning, and interpretation. In this context, the name of Ummul Mu'minin Aisha (ra) can be specially mentioned. Because she used to explain and interpret the Holy Quran on the basis of Shane Nuzul in the light of the Sunnah of the Messenger of Allah, (May Allah bless him and grant him peace.) For a long period of about 10 years, the Quran was revealed in the holy company of Rasulullah (sm), the context of the revelation and the underlying meaning of the verses, and he taught them in his later life. For this reason, she is also considered as a famous mufassira. Portions of Tafseer are recorded by Aisha Radiyallahu 'Anha at the end of Sahih Muslim. Apart from this, female companions such as Hind Bint Ubayd, Umme Imam Bint Harisa, Rabita Bint Hayyan, Umme Sa'd Ibn Rabi' Radiyallahu 'Anha etc. were the Hafizah of most of the verses of the Holy Quran. Some of them used to teach the Holy Quran.

---

[4] Narrated in Sahih Muslim on the authority of Abu Umama al-Bahili (ra). Hadith No. 1910.

[5] The hadith was narrated on the authority of Uthman Ibn Affan (ra) in Sahih al-Bukhari. Hadith No. 5027

[6] Jami' At-Tirmizee, Hadith No. 2910.

[7] During the lifetime of the Prophet (PBUH), 70 Hafiz Companions were martyred in Bir Mauna. Apart from this, about 70 Hafiz Companions were martyred in the Battle of Uhud and the Battle of Yamama. From this, it can be estimated that there was a large number of Hafiz-e-Qur'an among the Companions.

Hafsa Bint Seereen (ra)

Her name is Hafsa, father's name is Sereen and mother's name is Safiya (ra). Her nickname is Ummul Huzayal. Full name Ummul Huzayal Hafsa Bint Seereen Al-Faqiha Al-Ansariyyah Al-Mufassira Al-Basariyya (ra). She was born in Basra, Iraq in 31/651 during the reign of Caliph Uthman (ra). According to the famous historian Ibn Saad (ra), she is the eldest among 6 brothers and sisters. Others are - Muhammad, Ma'bad, Anas, Yahya and Karimah (ra) etc. All of them were reliable hadith narrators.[8]

The history of parents' sensational fortune

Both her parents were prisoners of war. During the distribution of booty or war booty, it was given to his father Seereen (ra) in the ownership of the famous Sahabi Khadem Rasulullah ﷺ, Hazrat Anas Ibn Malik (ra). He freed him for the pleasure of Almighty Allah. And it was given to Ma Safiyyah (ra) in the ownership of Khalifatul Muslimin Abu Bakr As-Siddiq (ra). He freed him for the pleasure of Almighty Allah.[9] Then the couple was married under the management of 3 Ummul Mu'minin and in the presence of numerous companions. Out of which 18 Badri companions were also present. Ubai Ibn Ka'b (ra) is one of them. He prayed for their welfare.

Acquiring knowledge in Qur'an Hifz and various Qira'ats

In the era of the third Caliph Hazrat Usman (ra) 31 AH. Hazrat Hafsa (ra) was born in the arms of this couple in Basra. She grew up under the supervision of the companions of the Messenger of Allah, (Peace and blessings be upon her). As a child, she memorized the entire Qur'an at the age of twelve. Not only that, she also acquired knowledge in various qira'ats. Her brother was the famous Tabi'i Muhaddith Muhammad bin Seereen (ra). If any part of the Qur'an seemed difficult to him, he would say, "Go and ask Hafsa, see how she reads?" Writing - reading in the presence of Sahabah Kiram

Then she started learning Ilm from the Companions. She had a deep interest in acquiring knowledge. She did not get the opportunity to sleep properly to acquire knowledge. She gave herself up for Ilm. Gradually in this way she reached the highest level of Tafseer, Fiqh and Hadith and became one of the most reliable Rabbis to the Muhaddis. Ibn Hibban (r.) (b. 270/884-d. 354/965) counted her among the Siqah Rabiyyah. Yahya Ibn Ma'een (r.)

---

[8] Al-Mizzee, Jamal Uddin, Tahjibul Kamal fi Asmair Rizal, V..3, (Beirut: Muassasatur Risalah, 1980), p.348.

[9] Muhammad Ibn Sa'd, At-Tabaqat al-Kubra, Tahqiq: Muhammad Abdul Qadir Atta, V.7, (Beirut: Darul Qutubil Ilmiyyah, 1st edition, 1410/1990), p.119.

(b.158/774 -d.233/847) said about her, "She is Siqah and Hujjah. That is, he is reliable and the hadith narrated by her is acceptable as evidence.

Marriage

Her husband's name was Abdur Rahman Ibn Uwayna Ibn Salamah Al-Kufi. He was the judge of Basra. His son's name was Huzayl Ibn Abdir Rahman.[10] That is why he was nicknamed Ummul Huzayal.

Juhad and Taqwa

She was a very Allah-fearing woman of worship. She spent her youth in worship and piety. She used to say, O youth community! Act in youth. Because I think, youth is the time to act. Ibn al-Jawzi (ra) said in his book 'Al-Muntazam Fi Tarikhil Muluk Wal Umam' that she finished the Qur'an once every two days. She used to fast the whole year except the two Eids and the days of Tashreek. She used to pray all night and wept so much that her poor maid thought that her mistress had committed some great sin and so wept and prayed. Hisham Ibn Hassan (ra) said, "She used to enter the prayer room at the time of Zuhr and did not come out". She was engrossed in worship. Asr, Maghrib, Isha and Fajr prayer were offered there and when the sun rose well, they would go out after praying. At this time she used to take ablution and take a bath. Then when it was time for prayer, she would go back to the place of prayer. Mahdi bin Maymoon (ra) said, she spent 30 years at her place of prayer. She used to go out there only for natural needs or rest. Asim al-Ahwal (ra) said about her, "Once we came to her. Then she covered her head". "We said to her, May Allah have mercy on you. He did not say?

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

"And the marriage of old women there is no hope for them, there is no sin in them, that they take off their (excessive) clothes (outside, in front of noble men), Without desire to display beauty."[11] She said, what next? We said: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "And if they take heed, that is better for them. Allah hears everything and knows everything.[12] Then she said, "This is the proof of the curtain". Thus she always followed the Shariah strictly and did not make concessions. She remembered death more and more. She was waiting for death every moment. It is even stated that she

---

[10] Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, Al-Asqalani, Tahjibut Tahjib, V. 6, (Beirut: Daru Ihyait Turasil Arabic, u. d.), p.13.

[11] Al-Qur'an, Surah An-Nur, 24:60.

[12] Al-Qur'an, Surah An-Nur, 24:60.

kept a cloth reserved for the shroud. She used to wear it when he put on Ihram for Hajj. During the last ten days of Ramadan, she used to wake up at night wearing it. Hafsa (ra) had a special family relationship with Anas bin Malik (ra). On the authority of Asim al-Ahwal (ra), Hafsa (ra) said, Anas Ibn Malik (ra) asked me, how do you like to die? I said, Death in the epidemic. He said, Surely martyrdom for every Muslim who died in the epidemic. Yas bin Mu'awiya (ra) said about Hafsa (ra), "I have not found anyone better than her." When Yas (ra) was mentioned about Hasan (ra) and Muhammad bin Seereen (ra), he said, I do not prefer anyone over them.

Sayyidaut Tabi'iyyah

Ibn Abi Dawud (ra) said, "The leaders of Tabiyyad are Hafsa Bint Sirin (ra) and Amrah Bint Abdir Rahman (ra)". After that was Ummul Darda As Sugra (ra). Hisham Ibn Hassan (ra) said, "I saw Hasan and Ibn Seereen (ra)". I have never seen anyone who seemed wiser than Hafsa (ra)." Imam Az-Zahabi (ra) said, she is an unparalleled scholar, jurist, truthful and of great dignity. She died in Basra in 101/719 at the age of 70.[13] Her funeral was attended by the great scholars of Basra. Two of them are Hasan al-Basri (ra) and Muhammad bin Sirin (ra).

Fatima Nishapuria (ra)

Fatima Nishapuria (ra) (d. 223 AH) was a famous Mufassir. She used to discuss and review the understanding of the Quran. Abu Yazid al-Bustami (ra) said, 'I have not seen a more pious woman than her.' . Junun Al-Misri (ra) said about her, "She is one of the women of Allah's saints and one of my teachers."[14]

Amatul Waheed Bint Mahamili (ra): She was an alim, fazilah, faqih and mufti as well as a hafiz of the Holy Quran.

Sister of Ziauddin al-Maqdisi

Ziyauddin al-Maqdisi's sister Asiya was an exemplary worshiper of her era, and memorizer of the Holy Quran. Similarly, Asiya bint Muhammad Ibn Khalif al-Maqdisiyyah was an accepted ulama of the Holy Qur'an. She became famous mainly because of her special skill in exegesis. She also had a special relationship with Tajweed and Qir'aat scriptures.[15]

---

[13] Ibn Hajar (At-Tahjeeb), Ibid, V.12, p. 410.

[14] As-Sulami, Abu Abdir Rahman, Tabaqatus-Sufiya, (Beirut: Darul Qutb al-Ilmiya, 2003), p.400-402.

[15] Qazi Athar, Maulana, Mubarakpuri, Muslim narider Ilmi obodan,-Translated by Ahmadullah, 1st edition, (Dhaka: Azan Publications, 1443/20210), p.66.

Maymunah Bint Abi Jafar (ra)

Maymunah bint Abi Jafar al-Madaniyyah (ra) was a renowned scholar of Qira'at and Tajweed. She acquired proficiency in these scriptures from her father. And others study it from her.

Salama Bint Al-Imam Ibn Jazaari (r)

Imam Ibn al-Jaari (ra) said about his daughter Salama (rah) that she recited the Qur'an by heart in seven ways. Besides, she had a lot of knowledge about ten methods of recitation and its principles. She was so advanced in tajveed literature that no practitioner, of that era tajveedist could surpass to his.

Mother of Imam Zainuddin (r)

Imam Zainuddin Abul Hasan Ali Ibn Ibrahim (r) (d. 599 AH) of Dimashka and Egypt was a famous jurist, orator and commentator of the Holy Quran. And all this knowledge and excellence she got with the blessings of her mother. Her mother was pious, hafiza and mufassir of the Holy Quran. Allama Nasiruddin (r) said: زين الدين سعد بدعاء والدته ، كانت صالحة حافظة تعرف التفسير"Zainuddin received the blessings of his mother. She was a virtuous woman and a hafiz of the Quran. She was also proficient in the interpretation of the Holy Quran."[16]

Imam Zainuddin (r) said, When I used to study Tafseer from my uncle Imam Sharaful Islam Abdul Wahhab and came to my mother, she used to ask me, "What did my brother teach you today?" When I used to say that so-and-so recited tafseer of such-and-such a surah, she used to say to me, "Did you read such-and-such's sayings to you and did you have any discussion on such-and-such?" When I said 'no', she would listen to their sayings and say, "Your uncle has left all these Imam's sayings"! And his mother's condition was like this, "She memorized 30 volumes of Kitabul Jawahir written by her father Shaykh Al-Faraj. She worshiped sitting in her prayer room for 40 years."[17]

Jebut Tafseer

Jebunnesa (d. 1113/1702), daughter of the Mughal Emperor Alamgir of India, was fluent in Arabic, Urdu and Persian. She acquired considerable knowledge in the Holy Qur'an and Hadith. Apart from this, she has left the signature of her talent in various literature and poetry. She produced a commentary on the Qur'an. This Tafseer book is divided into two parts and named 'Jebut Tafseer'. It is said that this is the first book of

---

[16] Ibn Hajar (At-Tahjeb), Ibid, V.12, p. 555.

[17] Muhammad Ibn Abi Ya'la, Abul Husayn, al-Hambali, Tabaqat al-Hanabila, V.1, (Cairo: Matba'atus Sunnah al-Muhammadiyya, 1371/1952), p.440.

commentary written by a woman in human history. Her full name is Jebunnisa Bint Shah Muhyiddin Muhammad Aurangzeb.[18]

Copy of the Holy Quran

Muslim women also performed the service of the Holy Quran by copying it. Ibn Fayyaz (r) wrote in the book "Akhbaru Qurtaba", "170 women used to copy the Holy Qur'an in the Kufi style of writing in an area located east of the city of Cordova. From this it can be assumed that the copying of the Qur'an was a matter of interest among women throughout the city of Córdoba. Shadkhanam, the grand daughter of King Shah Jahan in India, recorded the Holy Quran in the 'Rayhan' style of writing. At the end she wrote her name and surname in 'Rika' style of writing.[19]

2. Contribution of women in the field of Jihad

Aisha (ra) and Umme Salma (ra) participated in the Battle of Uhud. Safiya Bint Abdil Muttalib (ra) maternal uncle of the Prophet (sm.) participated in the Battle of Khaybar. Umm Khair, Az-Zurqa bint Adi, Ikrima bint Atrash and Umm Sinan (ra) assisted in the defensive work in numerous battles. Asma Bint Yazid (ra) participated in Baiate Ridwan, Conquest of Makkah and Khaibar Campaign etc. Historians mention that Asma (ra) participated in the Battle of Yarmouk in 15 AH and single-handedly killed nine Roman soldiers by beating them with tent poles.[20] Azra bint Harith bin Qalada led the army and fought against Ahle Bisan. Ammara (ra) formed a defensive ring to protect the life of the Prophet (sm.) in the Battle of Uhud. The Holy Prophet (sm) gave her the title of 'Khatune Uhud'. Umme Haram bint Milhan (ra) was martyred in the first sea expedition in the history of Islam. She was the first female sailor in Islam.[21]

3. Contribution of women in Hadith

From the beginning of Islam to several centuries later, women have been preserving hadiths, practicing hadiths, researching, teaching, etc. Muslim history always features some famous female narrators. Many such Muslim women can be found in the texts of Rizal Shastra. During and after the time of the Prophet (sm), many female Companions, especially Ummul

---

[18] Al-Uthmani, Sayyid Ibn Husayn Al-Afanee, Dr., Salah al-Ummah fi Uluwail Himmah, (Beirut: Muas Satur Risalah, 2020), p. 180-181.

[19] Athar Mubarakpuri, Ibid, p.68.

[20] Az-Zahabi, Muhammad Ibn Ahmad, Shamsuddin, Siyaru A'lamin Nubala, V. 2, (Cairo: Darul Ma'arif, u.d.), p. 297.

[21] Ibn Sa'd (At-Tabaqat), Ibid, V.8, 415.

Mu'minin, played a major role in narrating, explaining and disseminating hadiths. Aisha (ra),[22] Hafsa (ra),[23] Umme Habiba, Maymunah and Umme Salama (ra) among the wives of the Prophet ﷺ, may Allah bless them and grant them peace, are each known to students of hadith as narrators with unique characteristics.

Number of Sahabiyyah who narrated hadith

Baki Ibn Makhlad (ra) mentioned the names of 216 Sahabi who narrated hadith in his Musnad. His hadiths are narrated in Sihah Sittah and other Musnad books. Imam al-Bukhari (r) narrated hadiths from 31 Sahabiyyah in his Sahih. Imam Muslim (r) narrated from 36. Narrated by Imam Abu Dawud (r) from 75. Imam Tirmidhi (r) narrated from 46. Imam An-Nasa'i (rah) narrated from 65 and Ibn Majah (r) narrated the Hadith from 60 Sahabiyyah.

The names of the famous companions who narrated hadiths and the number of narrated hadiths

---

[22] Aisha (may Allah be pleased with her) was the wife of Prophet Muhammad (sm). She narrated 2210 hadiths from the Messenger of Allah ﷺ. 299 Companions and Tabi'i narrated hadiths from her. 67 of whom were women. She used to speak in correct Arabic, elegant, and, ornate. In short, Aisha Radiyallahu Anha was the center of Islamic knowledge and science. She was the noblest among all women of the world. Both religious and worldly knowledge was gathered in her. She also had vast knowledge of literature, poetry, medicine, history and genealogical traditions. She recited the long poems of Jahili era poets. Among the religious subjects, She had an unequaled possession in all branches of Quran, Hadith, Tafseer, Fiqh, Fatawa and Islamic knowledge. All these are the burning testimony of her knowledge, talent, excellence and dignity. Because of all these reasons, Aisha (ra) prevailed over the other Companions in many matters. Allama Badruddin Az-Zarkashi (r) wrote a book on this subject called 'Al-Izabah li Iradi Mastadarakathu Aisha Alas Sahabah'.- Kahhala, Umar Rida, A'lamun Nisa Fee Alimil Arab Wal Islam, V.3, (Beirut: Muas Sasah Ar-Risalah, 2008), p. 9.

[23] Hafsa Bint Umar Ibnul Khattab Radiyallahu Anha had extraordinary erudition in various branches of knowledge.She had a sharp mind and a keen intellect. Although not formally educated, she learned about religious matters from her father and husband. She had a keen interest in education. Her speech on various subjects was very organized and concise. Impressed by her manner of speaking and eagerness to learn, the Prophet (sm) arranged for her to study. and ignited interest in his in learning different things. That is why the Prophet asked Hafsa to teach education to Sahabi Shifa bint Abdullah Radiyallahu Anha, an educated woman of that time. She taught Hafsa to write.

2210 hadiths have been narrated from Ummul Mu'minin Aisha (ra). 378 hadiths were narrated from Umm Salama (ra).[24] 76 from Maymunah (ra), 65 from Umm Habiba (ra), 60 from Hafsa (ra), 60 from Asma Bint Umays (ra), 58 from Asma Bint Abi Bakr (ra), Umm Hani (ra)), 46 from Umm Atiyah al-Ansariyyah (ra), 40 from Fatima Bint Qays (ra), 30 from Umm Fazl (Lubaba) Al-Kubra (ra), 12 from Shifa Bint Abdullah (ra). And 11 hadiths were narrated from Busra bint Safwan (ra). These hadiths covering various topics including Aqaid, Ahkam, Family - Family and Children - Nurturing Peace are narrated in Sihah Sittah and other Musnad books.

Number of hadiths narrated from female muhaddis in Sihah Sittah

According to Hafiz Ibn Hajar (r), about 2764 hadiths have been narrated from female muhaddiths in the book Sihah Sittah. Among them, the number of hadiths narrated from Sahabiyyah is 2539. And the number of hadiths narrated from Ummul Mu'minin Aisha (ra) is 2081. And 225 hadiths were narrated from women who were not Sahabiyyah.

In the continuation of the path of women in the practice of hadith from the Sahaba era, the names of the Sahabi whose names are found in the Tabi'i era, their female students walked along the path of this continuity. The journey of this caravan continued in the next era as well. Some of the names that come up prominently in the hadiths are Hafsa, daughter of Ibn Sirin, Umm Abu Darda and 'Umrah bint Abdir Rahman etc. ``Umrah (ra) is one of the experts in the hadith narrated from Aisha Radiyallahu 'Anha. One of her students was Abu Bakr Ibn Hazm who was a famous judge of Madinah. He was ordered by the then Umayyad Caliph Umar ibn Abd al-Aziz (r) to write down all the hadiths narrated by 'Umrah (ra).

After them, 'Abidah and Abda Ibn Bishar, Umm 'Umar, Zaynab, Nafisa, Khadija, Abda bint 'Abdir Rahman and many other women acquired special knowledge of Hadith and taught Hadith. These women come from different backgrounds. For example, Abidah was a maid servant and from this condition she studied hadith with the teachers of Madinah. It is said that she related ten thousand hadiths to her teachers.

Women participated with men in the practice of the hadith of the Prophet, (May Allah bless him and grant him peace). A review in this regard shows

[24] Umm Salama Radiyallahu Anha was also possessed of immense knowledge. Her place is after Ayesha Radiyallahu Anha in the Hadith narrations among the female Sahabi. Hadith narrated by her can be found in all matters such as worship, social, political, economic, family, fiqh, medicine. About 101 Companions and Tabi'i narrated hadiths from her, of whom 23 were women.- Az-zahbi(Siyaru Alamin Nubala),Ibid V. 4, p.507.

that all important hadith collectors have collected hadith from many women. Every major collection contains many women's names.

In the fourth hijri century we have Fatima bint Abdir Rahman, Fatima (grand daughter of Abu Dawud), Amat al-Wahid (daughter of the famous jurist al-Muhamili), Umm al-Fath Amat as-Salam (daughter of the judge Abu Bakr Ahmad), Jumu'a bint Ahmad and many other clowns are known whose classes always had a considerable audience.

This continued till 5th and 6th hijri years. Fatimah ibn al-Hasan was known not only for her piety but also for her keenness of knowledge in judging the merits of hadith and its isnads. More famous than her was Karima al Marwaziyyah (ra). She was a world famous hadith scholar of that time. Ibnul Ahtal (r) called her hafizah of hadith. She narrated the hadith from Abul Haysam (r).

The scholars of Herat used to specifically instruct students to learn Sahih al-Bukhari from her. Many scholars, including Khatib Al-Baghdadi and Al-Humaidi (r), accepted the authority of hadith from her.[25]

Shuhada was a famous calligrapher, a highly respected and reliable hadith scholar. Biographers introduce her thus — She was a calligrapher and narrator of famous hadiths and a pride of women. Her father Abu Nasr gave his daughter a deeply institutionalized education and arranged for her to study under many eminent hadith scholars. From Sahih al-Bukhari and other collections of hadith, many people who thirsted for knowledge would gather to listen to her lectures; Some even falsely claimed to be her students despite not being her students. Sittul Ozara not only excelled in Islamic law, she was known as the 'Musnidah of her time'. Umm al-Khair Amat al-Khaliq, the greatest scholar of hadith in Hijaz, used to conduct various classes like this.

On the other hand, Umm al-Khair used to give lectures on Fatimah and Fatimah al-Shahrajuriya Sahih Muslim. Fatima al-Jawzaniya taught her students from Tabrani. Zaynab used to teach from the Musnad of Imam Ahmad Ibn Hambal (r). Many students were attracted there and listened to his lectures. Juwayriyyah bint Umar and Zaynab bint Ahmad ibn Umar used to narrate from the hadith collections of Ad-Darimi and Abd ibn Humayd.

Surprisingly, the traveler Ibn Battuta learned the hadith from Zaynab bint Ahmad and other teachers during his stay in Dimashq. Ibn Asakir(r), the famous historian of Dimashq said that he received education from 120 men and 80 women. Imam As-Suyuti (r) studied Imam Ash-Shafi'i's Risalah with Hazar bint Muhammad.

---

[25] Kahhala,(A'lamun Nisa), Ibid, V.4,p.240.

In addition, Zaynab bint Al Sha'ri studied hadith from several famous hadith narrators and later taught these to students, some of whom later became famous. For example, Ibn Khallikan (r), the author of the well-known biographical dictionary 'Wafyat al-'Aiyan', was her student. Another is Karima who is considered to be the best Syrian narrator of her time. Ibn Hajar (r) in his book 'Ad-Durar al-Kamina' has mentioned the brief biographies of 170 famous women of the 8th century. Most of whom were hadith scholars and many of whom he himself studied under. Some of these noble women were known as the most knowledgeable hadith scholars of the time. For example may be mentioned the name of Zuwairiya bint Ahmad, who studied hadith from both male and female scholars and herself taught in the major madrasas of the time.

Ibn Hajar (r) said in this context, "Some of my own teachers and many contemporaries used to listen to her lectures." Aisha bint Abd Al-Hadi was Ibn Hajar's (r) teacher for a long time. She was regarded as one of the hadith scholars of the highest order of her time and many students would travel long distances to come to him to gain the correct knowledge of the religion.

In the nineth century, all the information about women experts in hadith can be found in the book 'Ad-Daw ul-Lami' written by Muhammad Ibn Abdur Rahman As-Sakhabi (r). In addition, Abd Al-Aziz Ibn Umar mentioned the names of 130 women scholars and more than 1100 Shaykhs in his book Mu'jam Ash-Shuyukh. Some of these women were well-known in Hadith studies and were famous at that time. Umm Hani and Maryam are notable among them. who memorized the Holy Qur'an in her childhood and acquired detailed knowledge of Islamic theology, law, history and grammar. Later, she went to Cairo and Makkah in the hope of gaining depth in Hadiths and learned from the best hadith writers of that time. She was so religious that she performed Hajj at least 13 times. She conducted extensive programs at the famous College of Cairo. She gave 'Ijazat' (permission on her behalf to disseminate hadith) to many scholars.

Her contemporary Syrian Bai Khatun received 'Izaat' from many teachers in Hadith Shastra. She herself later gave many speeches on this subject in Syria and Cairo. Aisha bint Ibrahim and Umm al-Khayr Sa'ida of Makkah both traveled to Damascus, Cairo and other cities for learning and later taught others with reputation in different cities.

The study shows that from the tenth century of hijri, the participation and role of women in the study of Hadith and other Islamic subjects decreased drastically. In the tenth, eleventh, and twelfth centuries, only a dozen or so famous female hadith scholars can be found. who appeared mainly at the end of the 9th century. Asma Bint Kamal Uddin used to give lectures on

Hadith. She used to give acceptable opinions about the various decisions of the Sultan of that time and trained women in various aspects of Islam. Ayesha bint Muhammad, wife of renowned judge Muslehuddin, was a professor at Salihiya College in Dimashq. Fatimah bint Yusuf of Aleppo was known as one of the scholars of her time.

Fatima al-Zuzailya was a person of great learning. In her later life, she stayed in Mecca and built a rich public library there. She used to give lectures on hadith in the holy city of Makkah and many people would receive certificates from her after attending them. A review of history shows that Muslim women have striven to be the brightest stars in the pursuit of knowledge.[26]

4. Contribution of Women in Fiqh and Fatwa

Among the women muhaddis and alim were numerous faqihs and muftis. Along with the Qur'an and Hadith, they also acquired full proficiency in Fiqh and Fatwa. They gained fame as faqihs and muftis and established themselves in the society. Muslims rely on their fatwas and masalas and act accordingly. According to the statement of Allama Ibnil Qayyim (r), about 22 women Sahabi were prominent in Fiqh and Fatwa. Among them, 7 were Ummahatul Mu'minin (ra) the wives of the Prophet ﷺ. However, among them, Ummul Mu'minin Aisha (ra) received the title of 'Faqihaye Ummah' or the best Faqih of the entire Muslim Ummah.[27]

Sahabiyyah era

The female Companions, due to their ability, intelligence, understanding and foresight, have performed the responsibility of guiding the Muslim nation along with men in every field of life. In this context, Ibnul Qayyim (r) said, the number of the Companions of the Prophet ﷺ whose fatwa has been preserved will be more than one hundred and thirty. They include both men and women. The number of fatwas of seven of them is so high that according to Allama Ibn Hazm (r) if their fatwas are collected separately, each of them will become one big book. These seven include people like Umar Radiyallahu 'Anhu, Ali Radiyallahu 'Anhu and Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu 'Anhu along with Aisha Radiyallahu 'Anha.

The second line of Companions who gave Fatwas included Abu Bakr Radiyallahu 'Anhu and Usman Radiyallahu 'Anhu along with female Companions like Umme Salama Radiyallahu 'Anha. There is a third group

[26] Dr. M. Zubayr Siddiqi, Hadis Literature: Its Origins Development of Special Features, (Cambridge : Islamic Texts Society,1993); 'Contribution of Women Scholars in Hadith Practice' Monthly Ash-Shahdah, 1st year, 3rd issue, 1420 AH, March 2000.

[27] Athar Mubarakpuri, Ibid, p.61.

of companions who gave fatwas. Their number of fatwas is very less. Among these companions there are personalities like Hasan Radiyallahu 'Anhu, Hussain Radiyallahu 'Anhu, Abu Jar Radiyallahu 'Anhu, Abu Ubaydah Radiyallahu 'Anhu etc. Among this group were Umme Atiya Radiyallahu 'Anha, Hafsa Radiyallahu 'Anha, Umme Habiba Radiyallahu 'Anha, Safia Radiyallahu 'Anha, Laila bint Qais Radiyallahu 'Anha, Asma Bint Abu Bakr Radiyallahu 'Anha, Umme Sharif Radiyallahu 'Anha, Khawla Bint Taureet Radiyallahu 'Anha, Umme Darda Radiullahu' Anha, Fatima Radiullah Anha, Fatima Bint Qais Radiallahu 'Anha, Umm Salama Radiullah Anha, Umme Radiyah Anha and other women companions are also included.[28]

Fatwa on women at the beginning of Islam

Ibn al-Qayyim (r) in his famous book 'I'lamul Muaqqi'in an Rabbil Alamin', in discussing the conditions for giving a fatwa, has set eligibility as the main criterion. Women male and free slaves did not identify with anyone. A fatwa does not require a political decision, which is required in a judicial case. A fatwa is a statement of an order of the Shari'ah. According to the questions of the questioner, the provisions of the Shariat should be informed along with the evidence. It is not enforced. Only he has to accept Shaykh's discipleship. To obtain the recognition of contemporary scholars regarding the eligibility to assume the title of mufti or alim or faqiha or faqih. will be Acquiring title was not so easy in those days. Faqih-persons who specialized in the profession were originally considered fit to issue fatwas.

Aisha (r) and Fatwa

In the first century, the practice of fatwas by women was quite noticeable. Aisha (may Allah be pleased with her) is considered one of the seven greatest hadith narrators. According to Imam Az-Zahabi (r), she is the best female jurist of all times. During the caliphate of Abu Bakr (ra), Umar (ra) and Usman (ra), she used to give fatwas. Umar (ra) and Usman (ra) used to write to her for advice on various matters. Aisha (ra) did not limit herself to fatwas and narrations of hadiths. Rather, Ilmi discussed with various companions. She made amendments on various fatwas given by them. She gave many fatwas, which are proven only through her. It is through her hands that later women who are eligible to give fatwa have

[28] Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad Ibn Abi Bakr, I'lamul Muaqqi'in an Rabbil Alamin, V..1, (Kurdistan: Matba'a Fayzullah al-Kurdi, 1325 AH), p.9-11.

contributed to Islam. For example, Umrah Bint Abdir Rahman (ra), who performed Fatwa after her. Safiyyah bint Shaybah and Ummud Darda (ra).

Women muftis throughout the ages

Tabiyyah era

Notable among those who gained fame as faqihs and muftis during the Tabiyya period were Zaynab bint Abi Salama ibn Abd al-Asad ibn Hilal al-Makhjumiyah (d. 73/694) in Madinah. She was the sister of Ummul Mu'minin Umme Salama (ra). She was the best female jurist and muhaddis of her era. She was so advanced in this matter that whenever the famous Tabi'i Abu Rafi' (ra) discussed a faqih in Madinah, he used to discuss Zaynab Bint Abi Salama. Dimashq was called Ummud-Darda as-Sugra (r), whose real name was Huzayma bint Hay al-Awsabiyyah ad-Dimashqiyya (d.81 AH.) Yahya al-Ghassani (ra) said, Ummd-Dardaa (ra) When Umayyad Khalifa Abdul Malik Ibn Marwan used to teach the hadith in the mosque, he used to sit in the last row of the mosque.[29] Umrah Bint Abdir Rahman Al-Ansariyyah (ra) (b. 29/649-d. 106/724). She was a famous Faqih and a Muhaddis of a Madinah. She was brought up in the house of Ummul Mu'minin Aisha (ra). From her she acquired the knowledge of Ilm Hadith and Fiqh. Hafsa Bint Seereen (ra) is the daughter of the famous Tabi'i Ibn Seereen (ra). Her full name is Ummul Huzayal Hafsa bint Seereen al-Ansariyyah al-Basriyya (ra). She was also a faqih among the women scholars. born 30/650 in Basra, Iraq. and died in 100/719. She is one of the famous students of Ummul Mu'minin Aisha (ra). She acquired etymology in the scriptures of Hadith, Fiqh and Tafseer. Narrated hadith from Yahya Ibn Seereen (ra), Yas Ibn Malik (ra) and Umm Atiyah (ra). [30]

The muftis of the past era

Asma bint Asad

There were women muftis in all regions of the world in all eras of history. Asma bint Asad ibnil Furat was a famous female alimah and jurist of Karwain, Tunisia in the third century AH. Her father was a companion of Imam Abu Yusuf (r) and Imam Malik (r). She grew up under the supervision of her father and acquired knowledge from him. Apart from this, she also attended the lectures of the great scholars of that time. She acquired etymology in Hadith and Fiqh. She died in 250 hijri.[31] She used to participate in various scientific debates. Her question and answer majlis

---

[29] Az-zahabi(Siyaru A`lamin Nubala), Ibid.

[30] Kahhala (A'lamun Nisa), Ibid, V.1,p.172.

[31] Ramadan Yusuf, Muhammad Khair, Kitabu Faqihatin Alimatin, (Riyadh: Daru Tariq, u.d.), p. 17.

were held. Although her father was a major imam of the Maliki Madhhab, she followed Hanafi fiqh.

Khadija bint al-Imam Sahnoon

Her full name is Khadija Bint Al-Imam Abdis Salam Sahnun Ibn Saeed At-Tanukhi (r) (160-270 AH). She is the daughter of Imam Sahnoon, the second founder of the Maliki Madhhab. The famous scholar, jurist and historian Al-Qazi Yaz (r) (b. 476/1083- d. 544/1149) wrote about her in his book 'Tartibul Madarik wa Takribil Masalik', "Among the muhaddiths, jurisprudents and writers who belong to Qarwayin of Tunisia Blessed the earth, Khadija bint al-Imam Sahnun (r) is one of them. She was a pious muttaqi alima and faqih. People used to inquire from her to know the solution of various problems of Shari'ah.[32]

Sister of Imam Muzani

At exactly the same time, there was a sister of Imam Muzani (d. 264 AH), the priest of the Shafi'i Madhab, in Egypt. She was known only as Muzani's sister. Her full name is As-Sayyida Alim Al-Faqih Ash-Shafi'iyyah Umme Ahmad Bint Yahya Ibn Amr Ibn Ishaq Al-Muzani (r). She acquired knowledge from Imam Shafi'i (ra). She used to debate with Muzani herself on various issues. Imam As-Suyuti (r) considered her among the most famous alima and faqih of Egypt. She was the mother of the famous Faqeeh and Muhaddith of the Hanafi School Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad at-Tahawi (r) (b. 238/852- d. 321/933).

Fatimah bint Yahya (d. 319 AH) was known as alim, faqih and pious-Muttaqi in Andalus. As many people participated in her funeral, no woman was seen like this. Umm Isa (d. 328 AH) used to give fatwas in Iraq. The daughter of Qazi Husayn (d. 377 A.H.) acquired the knowledge of the Shafi'i Madhhab and used to work on fatwas with her father. Aisha bint Ahmad (d. 529 AH) practiced fiqh in Khorasan. She used to give fatwas. In the same century, Shuhdah Bint Ahmad (d. 574 AH) in Iraq gained deep knowledge in Hadith and Fiqh. She used to teach women from behind the screen. Many accepted her discipleship.

Amatur Rahim Bint Muhammad Al-Qustulani (r)

She is the daughter of Muhammad Ibn Ahmad Al-Qustulani (r). From her father she acquired the etymology of hadith and fiqh. Muhammad al-Wani (ra) studied several books of hadith with her. She died in Alexandria in 715 AH.[33]

---

[32] Al-Qazi Yaz ibn Musa, Abul Fazl, Tartibul Madarik wa Takribil Masalik, V.4, (Morocco: Matbaatu Fudala al-Muhammadiya, u,d.), p.222.

[33] Kahhala, Ibid, V.1, p.86.

Amatul Wahid bint Husayn (r)

She was a jurist of the Shafi'i school. Her full name is Amatul Wahid Bint Al-Qazi Abi Abdillah Al-Husayn Al-Mahamili (ra). She used to give fatwas herself and narrate hadiths. Many scholars recorded hadiths from her. Al-Bidaya wan Nihaya and Tarikh Baghdad mention that she was well versed in inheritance law, mathematics and Arabic grammar. She was a jurist and mufti of the Shafi'i school.

Fatima Bint Muhammad As-Samarkandi (ra)

The author of the book 'Tuhfatul Fuqaha' of the Hanafi Madhhab is the daughter of Muhammad Ibn Ahmad As-Samarkandi (r) (d.587/1191).Fatima Bint Muhammad As-Samarkandi (r) was a prominent female jurist and fatwa scholar in the twelfth century. If someone wants to issue a fatwa on Islamic matters, she must refer to the Qur'an, the hadith, and the principles of the madhhab on which she is interested. He has to be knowledgeable about the nature of the contemporary world and to be able to give fatwas without doubt. Fatimah (r) was able to perform this intellectual task with excellence. Fatima's father Allama Muhammad Ibn Ahmad As-Samarkandi (r) was a famous jurist. From her father, she acquired detailed knowledge of various subjects including Islamic law and the principles of the Hanafi Madhhab. Later, when her father issued Islamic fatwas, he consulted his daughter. Fatima (r) used to write fatwa to her father with her own hand. And signed the written fatwa herself. Thus her fame in Fiqh spread far and wide.[34] Fatima became so well known for her expertise in interpreting hadiths and issuing fatwas that the then ruler of Syria, Nooruddin, appointed Fatima as his personal advisor.The notable book written by her is - 'Mazmaul Fawaid Li Jameel Awaid Sharhi Tuhfatil Muluk'. [35]

Written text of marriage seal

Although many of the kings of the time sent marriage proposals to Fatima, who was famous for her extraordinary beauty, the father and daughter chose Al Kasani for their marriage. who was himself an eminent scholar of jurisprudence and a privileged student of her father. He wrote a commentary called 'Al-Badayyus Sana'i' based on the famous book 'Tuhfatul Fuqaha' written by Fatima's father. Father and daughter liked this book so much that they accepted it as Fatima's wedding seal.

Shortly after the wedding, Fatima and Kasani embarked on a world tour. Finally, when they were invited by the Syrian ruler, they settled in the city of Aleppo. And there he continued to teach various subjects of Islam as a

[34] Ibid, V.4, p.94.

[35] Ibid.

distinguished scholar. A student of Al-Qasani (r) narrates, "Sometimes the students would ask Al-Qasani complex questions. He used to take leave from us and leave for home. He would come back and discuss the answers to our questions in detail. Such incidents happened often. Finally we realized that Imam al-Qasani used to go home to ask his wife Fatimah for the answer to the question and would come back with the solution to the question."

When her husband had doubts or was wrong in giving a fatwa, she would seek Fatima's opinion. Fatima would correct it and give the correct judgment and also explain the reason for the error. Qasani (r) had such a high regard for his wife that he would not sign a valid fatwa until Fatima first signed it. It has been said in this context

وان الفتوى كانت تخرج من بيتها وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها

"Fatwa was signed by Fatima, her father and her husband."[36] Thus, first as a daughter and later as a wife, Fatima Samarkandi has made an important contribution in providing correct fatwas on various Islamic issues with her thoughtful opinions. It also proved that Muslim women, if given the necessary support and due respect from their mahrams, can exert their talents even in sensitive matters such as issuing fatwas. In the 10th century hijri, Umme Abdul Wahab distributed the light of knowledge in Cairo. She received fatwas and permission to teach from the great scholars of that time. We find Quraysh bint Abdul Qadir (d.1107 AH) in Mecca in the 11th century AH. Apart from being a member of a large Alim family, she was a jurist of great stature. People used to read books of hadith to her at home. She is even considered the origin of one of the seven Hijazi Sanads that became famous in Mecca in the eleventh century.

5. Contribution of Muslim women to the expansion of institutional education

From the beginning of Islamic civilization until today, women's movement in the world of knowledge was free. Ummul Mu'minin Aisha (ra) was a successful personality of this generation. After the death of Hazrat Muhammad ﷺ, she accepted the practice of Islamic knowledge and science as a vow of life and converted her house into a school. After Aisha (ra), numerous Muslim women devoted themselves to the service of knowledge. But for a long time,[37] their educational programs were person-

[36] Athar Mubarakpuri, Ibid, p.62.

[37]. Because it took about four and a half hundred years for the educational program of the Muslim world to acquire an independent institutional structure. 459 Hijri is considered a significant year in the history of Islam. Because in this year Madrasa education was organized and institutionalized through the

centered. Later, when the practice of establishing madrasas and maktabs gradually started, women also came forward with full cooperation with great sincerity. A review of history shows that Muslim women have also contributed greatly to the spread of institutional education in Muslim civilization. We will try to summarize their historical and immortal achievements here, inshaAllah.

1. Fatima al-Fihria (ra)

Many may be surprised to know that the world's first university was founded by Muslims and by a Muslim woman. The name of that noble Muslim woman was Fatima bint Muhammad al-Fihriya al-Qurayshiyyah. It's a name a history. She is the founder of the first university in human history.[38] Al-Qarawein University, founded by this noble Arab Muslim woman, is located in the northern city of Fez, Morocco. According to UNESCO and Guinness Book of World Records, this university is the oldest in the world to provide higher education. Various scholars also refer to Al-Qarawayn as the oldest university. It was founded by Fatima al-Fihria in 245/859. In the beginning it was a mosque. Adjacent to it was a madrasa. Like a big institution, the blessing and welfare of this madrasa spread all over the Muslim world.[39] Later in Muslim history this institution took the lead as one of the centers of spirituality and learning. In 1963, the Moroccan government incorporated 'Al Qarawein University' as part of its modern university system.

Personal identity

Fatima bint Muhammad al-Fihriya (r) was an Arabian Muslim woman. Her nickname is Ummul Baneen. She is related by lineage to Uqba ibn Nafe` al-Fihri al-Qurayshi (r.) (d. 63/683),[40] the founder of Tunisia and the

---

Seljuk Prime Minister Nizamul Mulk Tusi (R.), which soon gained popularity in the Muslim world. And many rulers and wealthy individuals came forward to establish independent madrasas. Along with men, Muslim women also came forward to establish madrasas. As a result, they are able to contribute to education, culture and science.

[38]. In the western part of the Muslim world, a mosque and a madrasa were first established in the city of Fez. Later this madrasa was converted into a university. Today it is known as 'Qarawein University' (جامعة القرويين). This is the first university in the world.

[39] Athar Mubarakpuri, Ibid, p. 79.

[40] Uqba Ibn Nafe` was a famous Tabi'i. He was born in the era of Rasulullah ﷺ but did not see him. He is the Muslim commander who conquered Africa. He established the city of 'Qairawan' in Africa (51-55 AH) and laid the foundation stone of a great mosque there. The mosque named 'Jami Uqba bin Nafe' still bears his memory.

city of Qairawan. The Quraishiya part of their family name suggests that they were descendants of the Quraysh dynasty. It is the past memory of Tunisia and the city of Qairawan.

A figure immortalized in the Moroccan city of Fez and the history of Tunisia and Morocco. Fatima al-Fihriya is believed to have been born in 800 AD. She migrated from Qairawan, the capital of Africa at that time, to Fez, the capital of Greater Morocco Idrisia. Fatima built a mosque there. Which later turned into a university step by step.

Center for knowledge distribution

Various branches of knowledge were taught there. After completing the education, many great scholars came out, whose light rays reached the distant Europe of the Middle Ages. When recalling the historic city of Fez founded by Idris II during the Idrisian reign. Then it is relevant to talk about Qarawan Jame Mosque and Qarawan University with Qarawan educators. They lived across the vast Qarawein valley at the beginning of the city of Fez. Among those academics was Fatima bint Muhammad al-Fihria. who came from Tunisia to the capital of the Idrisiya empire with her father, the Qairwan jurist Muhammad bin Abdullah al-Fihri, and sister Maryam during the reign of Amir Yahya bin Muhammad bin Idris.

Fatima al-Fihria fled her native Taybong with other Arabs to Greater Morocco. Then during the reign of Idris II, the Qarawain began to live in the valley. Here she got married. However, within a few years of marriage, disaster struck Fatima's family. Within a short time her father, brother and husband died. Only two orphaned sisters, Fatima and Maryam, survived.

Laying the foundation stone of the mosque

They inherited a large amount of property left by their father. They decided that this property should not be spent on luxury but should be spent on religion and the welfare of humanity. They decide not to buy decoration or luxury goods, they will buy the future of the people. In the month of Ramadan 245 hijri, she laid the foundation of the mosque from the property inherited from her father. She bought a nearby field from a neighbor and doubled its area. She was so careful in purchasing this land that there was not even the slightest intrusion of haram into it. She also combined her land with the mosque. She spent huge sums of money on it with sincere interest. As a result, a charming mosque with strong decorative craftsmanship was built. Thus, she spent the huge amount of money received from her father and husband for the spread of education.

Resolve to fast

Historians point out that Fatima al-Fihriya started fasting continuously after deciding to build the mosque. She vowed not to break her fast for a single day until the construction of the mosque was completed. After that, when the construction work was completed, she first went to the mosque and prayed two rakats of gratitude. She was a very pious-Muttaqi, kindhearted and devoted to her prayer.[41]

The mosque later became the original university

Many historians mention that this mosque later became a university in 859 AD. Where higher education was given on various branches of knowledge. Historian Ibn Khaldun (R.) (b.732/1332-d. 808/1401) said that the Jame Mosque of Qarawein has been leading the spread of Islam and knowledge in Morocco for a long time. After that, under its leadership, the radiation of knowledge spread to distant Europe.

Morocco's first religious institution

Once upon a time, the Jame Mosque of Qarawein became famous as the first religious institution in greater Morocco and the largest early university. This is how Fatima bint Muhammad al-Fihria founded the first university in the world. Finally, in 265/878, Fatima bint Muhammad al-Fihriya died. After her death in 918, the government acquired the mosque and declared it as an official mosque. Where the Sultan began to offer regular prayers. After re-enlargement in the twelfth century, it was able to accommodate 22,000 worshippers.

A major center of Islamic learning in Africa

The city of Fez became a major center of Islamic learning in Africa, centered on the Qarawain Mosque and the Qarawain University founded by Fatima. Not only Muslims, many famous medieval Jewish and Christian thinkers also passed out from this university. One of its students was Pope Sylvester II. From here, he spread the knowledge of Arabic numerals to Europe and introduced the first concept of zero to Europeans. The famous Maliki Madhab judge Ibn al-Arabi, the historian Ibn Khaldun and the astronomer Nuruddin al-Bitruji were associated with teaching in this university at different times. After its establishment, Fatima herself studied here for some time.

The oldest library in the world

The Qarawain University Library is also considered to be the oldest library in the world. This library has various rare books. According to the 14th century historian Ibn Abi Zar`a major fire took place here in 1323 AD. Many valuable books and documents were destroyed in the fire.

[41] Ibid.

However, among the most valuable manuscripts currently in this library are the famous Al-Muwatta of Malik Ibn Anas (r), the Sirat Ibn Ishaq, a copy of the Qur'an given by Sultan Ahmad Al-Mansur in 1602, and a copy of the original Ibn Khaldun's Book Al-Ibar. Apart from this, the library still has around 4,000 ancient and rare manuscripts including Quran, Fiqh, Grammar, Rhetoric, Logic, Medicine, Mathematics and Astronomy. Fatima al-Fihria died in the city of Fez in 266/878. But the Qarawain mosque, university and library founded by her in that city are still standing in glory.

Jame' Andalus

Like Fatima al-Fihria (r.), her sister Mariam Fihria also died in 245 AH. She built a mosque. She also spent her ancestral property in this construction work. Later this mosque became famous as Jame' Andalus. From here, the practice of Islamic knowledge continued for hundreds of years. In the 4th century A.H. it was incorporated into the Qarawain University. [42]

The shining city of Dimashaq

Dimashaq alone had 19 madrasas founded by women.[43] Dimashaq was the first magnificent and luminous city in the history of Islam. Power, knowledge-science, art-literature, culture and spirituality were all the focus of human interest. Many women scholars, jurists, hadith scholars and poets came to Dimashaq.

2 Sittush Sham Fatima Khatun (r.)

Fatima Khatun bint Najmuddin Abish Shukr Ayyub Ibn Shazi (r) (d.1220 AD). She was awarded the title of Sittush Sham. She is also known as Jumurrud Khatun. She was the sister of the twenty-conqueror Sultan Salahuddin al-Ayubi (r) and the wife of Nasiruddin, the ruler of Hams. She has become famous in history for the practice of knowledge and literature, the patronage of scholars the construction of educational

---

[42] Athar Mubarakpuri, Ibid, p. 79-80.

[43] Between 526 and 660 AD alone, women established 19 madrasas there. For example 1. Madrasatul Khatuniya Baraniya, 2. Madrasatul Khatuniya Jawaniyya, 3. Madrasatul Qutbiya, 4. Madrasatush Shamiya Baraniyya, 5. Al Madrasatul Azrabiya, 6. Al Madrasatul Maridiniya, 7. Al Madrasatul Farrukh Shahiya, 8. Al Madrasatush Shamiya Al Jawaniyya, 9. Madrasatus Sahibah, 10. Al Madrasatul Maituriya, 11. Al Madrasatul Kamiliyyah, 12. Al Madrasatud Dimagiya, 13. Al Madrasatul Atabiqiyyah, 14. Madrasatul Alima, 15. Al Madrasatul Hafiziya, 16. Al Madrasatul Murshidiya, 17. Al Madrasatul Adiliyyah As-Sugra, 18. Al Madrasatush Shomaniya, 19. Al Madrasatul Jamaliya. Apart from this, women established khankas, shelters, ashrams etc.

institutions and generous donations. Sittush Sham (r) engaged herself in public welfare work. Apart from the general patronage of Alim-Ulama, she established two Madrasas. One of which is Madrasatush Shamiya Al Baraniyyah (1186 AD). In this madrasa she gathered the best scholars of the age. One of the conditions of their appointment was that they could not teach else where, always be busy with students. She waqf a large amount of wealth for this madrasa. The second is Madrasatush Shamiya Al Jawaniyyah. It was formerly the house of Fatima Khatun (r). For this Madrasa also she gave a large amount of wealth as waqf. Under her patronage it became the largest Madrasa in Dimashaq. The famous Faqih and Muhaddith Allama Taqi Uddin Ibnus Salah (ra) (b. 577/1181-d. 643/1245) was appointed as the director of this madrasa.

3. Daifa Khatun

Al Firdaus Complex. Under which there was a Madrasa, a Mosque, a Ribat and a Turba.[44] This complex was founded by Queen Daifa Khatun (b.581/1185-d. 640/1242), wife of Sultan Zahir Ghazi bin Salahuddin.

4. Adir Karima

Jihatus Salah Adir Karima was the mother of Ali Dawood, ruler of Yemen. In her son's absence, She took charge of the state for 14 months and saved it from chaos. She established several madrasas in Yemen. Among the Madrasas, Islahiya at the madrasa of Zubayd city. Apart from this, She established two more madrasas in Musallab and Salama. A large amount of immovable property was waqf for each madrasa.

5.Tatar Hajjazia

She was the daughter of Malik Nasir Muhammad bin Qalaun. She established the Hajjazia Madrasa in 1360 AD. A mosque, library and orphanage were run under it. All the expenses including food, clothes were borne by the students of the orphanage. In addition, she established a madrasa in Cairo and waqf a large amount of wealth.

6.Khawand Barakah

Umm Sultan Barakah was the mother of Malik Ashraf Shaban bin Husayn, ruler of Egypt. She established Madrasa Ummus Sultan in 1370 AD. She dug a water well for pedestrians in front of the madrasa.

7. Naila Khatun

She was the wife of Murad Afendi, the Ottoman administrator in Iraq. After her husband's death, Naila Khatun bequeathed her house for Religious education and the madrasa Muradiya was established there. A mosque was also run under the Madrasa. Apart from the house, she donated some other assets for the madrasa.

[44] Turba means-where practical application of various subjects is taught.

8. Sultana Razia

Sultana Razia (1205-1240 AD) was the daughter of Sultan Shamsuddin Iltutmish. She is immortal in history as a patriot. During her short reign (1236-1240 AD), numerous madrasas, maktabs, libraries and educational institutions were established. Some traces of which still survive in Old Delhi.

9. Nana Asma

She was an alim, jurist, poet and religious initiate. Nana Asma (r) is the grand daughter of the famous Alim Usman bin Fudi (ra) of Africa. She was born in 1792 AD. She is a pioneer of women's education and religious awakening in West Africa. Nana Asma (r) took the initiative to develop the talent of women, including writing, through reading classes for women from an early age. She not only spread the religious education of women, but she taught women to be action-oriented and self-reliant from within the religious discipline. There are numerous educational institutions and several organizations named after her in Africa.

10. Fatima bint Ismail

She was the daughter of Ismail Pasha, the Ottoman ruler appointed to Egypt. Her contribution to the establishment of Cairo University is unparalleled. In 1909, she donated six acres of land next to the palace for the construction of the administrative building of Cairo University and 674 acres of land in an Egyptian delta for the management of the university. During the construction of the building, she sold her jewelry and paid 18 thousand Egyptian pounds at that time. She donated her collected books to the university library. Among which there were many rare books gifted by kings and princes. Apart from this, during the laying of the foundation stone of the university in 1914, she donated a large sum of money from private funds.

11. Queen Effat

Qeen Iffat, the wife of the late King Faisal of Saudi Arabia, is one of the modern Muslim women. She made a unique contribution to the expansion of women's education in Saudi Arabia. She established the first women's education center in the country's history in Taif. At first the journey started on a small scale but in 1955 it was started on a large scale with the permission of King Faisal.

12. Al Madrasatul Kamilya

This is another women's school established in the Syrian city of Halab. Founded by Fatima Khatun, daughter of Sultan Kamil and wife of Sultan Aziz Muhammad.

13. Madrasa in Makkah funded by Bengali women

In Mecca, women established several madrasas, khanqahs and ribats. Some of which are - Ribat established by the mother of Khalifa Nasir Abbasi, Ribat established by the daughter of judge Shihabuddin Tabari, Ribat of Ummul Qutb Kustulani established in the eighth century hijri, 'Ribate Khaseki Sultan' established by Hurram Sultan of the Ottoman period in 940 Hijri. Al Madrasatus Sawlatiya was established in 1291 hijri. The madrasa was founded by India's famous Alim Rahmatullah Kiranbi (r) with the funding of Sawlatunnisa Begum, a Bengali woman from Calcutta. whose educational program is still ongoing.

A few madrassas in other regions

14. Merv: A large madrasa and library named 'Al Madrasatul Khatunyya' was founded by an elite woman of the Ayyubid dynasty in the city of Merv in Central Asia.

15. Tripoli: Argun Khatun, the wife of Yazddin, the governor of Dimashaq, established a school called 'Al Madrasatul Khatuniya' in Tripoli, modern Libya.

16. Palestine: The notable madrassas established by women in Palestine are 'Al Madrasatul Barudiya', 'Al Madrasatul Usmaniya' and 'Al Madrasatul Khatuniya'.

17. Delhi and Bhopal: Queen Shahjahan Begum of Bhopal in India established several madrasas, mosques and libraries. Sultana Razia established more than a hundred madrasas in Delhi and its surrounding areas.

18. Yemen: The number of madrasas established by women in Yemen in ancient times is 33. Some of the notable ones are Salehiyya, Shashiyya, Mutabiyya, Yakutiya, Nazmiyya, Zahriyya, Hadariyya, Ayeshiyya, Wasikiyya etc.

19. Egypt: In Egypt too, women make an enviable contribution in the field of education. They established numerous Madrasahs, Khankas and Ribats. In each of these, science was practiced. Some of the madrasas founded by women in Egypt are Qutbiyah, Hijaziyah, Ashuriyah, As-Sagirah As-Sunniyya, An-Nahda, Banatul Ashraf and Al Ihsan etc.

6. Contribution of Muslim women to medicine

Islam has allowed women to contribute in all areas of life by following the rules of Sharia. Especially in medicine they have significant contribution. 9 women doctors are also found during the era of Prophet ﷺ. They specialized in various fields including surgery, obstetrics and gynecology. The contribution of Muslim women in medicine is highlighted below.

1. Rufaida Al-Aslamiyyah (ra)

Her real name is Rufaida bint Saad al-Ansariyyah al-Aslamiyya (ra).[45] She was one of the foremost Companions of the Ansar. She was born in Al-Aslam tribe of Madina. She was one of the few women who welcomed the Prophet ﷺ after she migrated to Madina. Her father Saad Aslami was a doctor by profession. Rufaida (r) learned medicine from her father. During the Jahili and Islamic eras, she performed surgery and treated the wounded in war. Narrated by Mahmud Ibn Labid (r). He said, "On the day of the Battle of Khandak, the eyes of Saad Ibn Mu'az (ra) were injured. When his condition worsened, he was handed over to a woman named Rufaida. She treated the wounded. The Messenger of Allah ﷺused to ask Saad (ra) about his condition in the morning and evening.[46] It is noted that in the battle of Khandak, she used to draw the tent and take care of the wounded Muslim soldiers. She extended the compassionate hand of motherhood to heal the wounded Muslim Mujahideen in the Battle of Khaybar. In recognition of her unforgettable sacrifice and service, the Prophet ﷺ gave her a share of the war booty along with the male mujahids. She used to train Ummul Mu'minin Aisha (ra) and other companions in medicine.

2. Umme Atiyyah Al-Ansariyyah (ra)

Her real name is Nusaybah Bintul Harith Al-Ansariyyah. Umme Atiya is her nickname. She was a Sahabi of Ansar of high quality. Several hadiths have also been narrated from her. During Jahili and Islamic eras, she gained fame in medicine. She was a surgeon and ophthalmologist. Narrated by Umme Atiyyah (ra). She said, 'I participated in seven battles with the Messenger of Allah ﷺ. I used to look after the mujahideen's vehicles and goods from behind, prepare their food, treat the wounded and take care of the sick.'.[47]

3. Ash-Shifa Bint Abdullah (ra)

Her full name is Ash-Shifa bint Abdillah ibn Abdish-Shams al-Adabiyyah al-Qurashiyya. She was one of the most educated people in Jahili and Islamic eras. She specialized in dermatology. Accepted Islam before Hijra. She took the pledge of allegiance to the Messenger of Allah ﷺ nd migrated to Madinah. She taught Muslim women. Ummul Mu'minin Hafsa (ra) learned handicrafts from her. She is known as the first teacher in the

---

[45] Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, Al-Asqalani: Al-Isabah, V. 8, (Beirut: 1328/1910), p.135-136.

[46] Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Al-Adabul Mufarad, 3rd edition, (Beirut: Darul Bashayir al-Islamiyyah, 1989), hadith no-1139.

[47] Sunan Ibn Majah, Hadith No. 2856.

history of Islam.[48] She used to go out to fight with Rasulullah ﷺ. She treated the sick and injured. Companions also received treatment from her at various times. On the authority of Ash-Shifa bint Abdillah (ra), who said, 'Once I was with Hafsa (ra), the Messenger of Allah (sm) came to me and said, 'The way you taught her (Hafsa) to write, the ants (insects) Why don't you teach the bite?[49]

4. Zaynab Tabibatu Bani Aud

She was also known as Zaynab Ash-Shamiya. A famous physician of the Umayyad period. She was a surgeon and ophthalmologist. [50]

5. Ukhtu Abi Bakr Ibn Zahra

She is the sister of the famous physician Abu Bakr Ibn Zahra. Member of the famous Jahra family of Spain. Everyone in this family was a doctor. She was a specialist in obstetrics and gynecology. She was famous throughout Spain. Her father, brother and daughter were also doctors.[51]

6. Binat Dihnil Lauz

Binat Dihnil Lauz ad-Dimashqiya had a wide reputation in the medical world. She treated the wives of the Umayyad rulers. Her mother Dihnul Lauz was a prominent Muslim scholar of Dimashaq.[52]

7. Bintu Shihabuddin Ibnis Sayig

She is the daughter of Ahmad Ibn Sirajuddin. His surname was Shihabuddin. He was the head of Cairo Darush-Shifa al-Mansuriya. After his death, his daughter Bintu Shihabuddin was made head of the Cairo Darush-Shifa al-Mansuriya. Bintu Shihabuddin became very famous in the medical world.[53]

8. Ummul Hasan

Her full name is Umme al-Hasan bint al-Qazi Abu Jafar at-Tanzali. She was born in Spain in the eighth century. She acquired knowledge under the supervision of her father. She gained etymology in various Qur'anic recitations, poetry-literary and medical worlds. she made significant contributions to the medical field during that era.[54]

---

[48] Abdur Razak As-Sayed, Abdullah, Kitabut Tibb wa Rayidatuhul Muslimat, (Maqtabatul Manar, 1985), p.80.

[49] Sunan Abee Dawud, Hadeeth No-3887.

[50] Abdur Razak, Ibid, p. 91.

[51] Ibid, p.96

[52] Ibid, p.101.

[53] Ibid, p.102.

[54] Ibid, p.93

9. Umme Ahmad al-Kabila

A devout and pious physician of the Mamluk period. She was an obstetrician. She used to treat people for free.[55]

10. Zohra Begum Kazi

First Muslim woman doctor in Indian subcontinent. Born in India in 1912. She received her MBBS degree from Hardinge Mahila Medical College, Delhi under Panjab University. She was teaching and working as a doctor in various hospitals and medical colleges in India.

11. Khalida Abdul Wahhab Qaisi

She was born in 1343/1924 in Iraq. She had a dream of becoming a doctor since childhood. In 1947, after completing her graduation from the Royal Medical College of Iraq, she provided medical services in various hospitals. Apart from this, she has important research articles on various topics including infertility, anemia of pregnant women, cancer. Her notable achievement was the establishment of Obstetrics and Gynecology Departments in Iraqi hospitals to train women doctors. She died in Baghdad in the late 1990s.[56]

Women's contribution to preaching, social service and public welfare work etc

7. Waaz- admonishment

Many of the women were skilled in sermons and speeches. They used to keep Muslim women's faith-belief and practice-morals fresh and purified through religious discussions and speeches.

Ummul Hasan, Mu'azah and Aisha Bint Muhammad (ra)

Imam Hasan al-Basri's mother, Majida Khaira (ra) used to preach among women. Usama Ibn Zayd (ra) said: رأيت أم الحسن تقص على النساء "I saw Umme al-Hassan performing ablution among women."[57] Mu'aza bint Abdillah (ra), the wife of the famous Tabi'i Silah Ibn Ashiyam, was a respectable Abida and worldly woman. She used to be the main speaker among the women and present the discourses on Shari'i Ahkam. Ja'far Ibn Qaysan (ra) said: رأيت معاذة محتبية والنساء حولها "I saw Mu'azah sitting and preaching. At that time women surrounded her." [58] Umm al-Hakam Aisha bint Muhammad al-Baghdadiyya (ra) was awarded the title of 'Wayyyah or Speaker'. She used to preach among women. Imam Az-

[55] Kahhala (A'lamun Nisa), Ibid, p.23.

[56] Fuqayqi, Adib Tawfiq, Dr., Tarikh al-Alamit Tibbil Iraqi al-Hadith, (Al-Fukayqi, 1989), p.180.

[57] Ibn Sa'd (At-Tabaqat), Ibid, V. 8, p. 376.

[58] Ibid, p. 483.

Zahabi (ra) wrote: وكانت صالحة تعظ النساء "She was a righteous woman. She preached to women."[59]

Umme Zaynab Fatima bint Abbas al-Baghdadiya (ra)

In this case, the service of Alim, Muhaddis, Zahid Umme Zaynab Fatima bint Abbas al-Baghdadiyya is very significant and colorful. Not only did the women of Baghdad benefit from her sermons and discussions; Rather, the women of Damascus and Egypt benefit greatly. For this reason, she was awarded the title of 'Best Leader of the Age'. About her, Imam Az-Zahabi (ra) wrote, "Innumerable women benefited from her and repented of their sins and turned to the truth. She was a tall Alim and petite woman. She was always eager to benefit the Muslim society through preaching and teaching. Sincerity and fear of Allah were strong in her. She enjoyed good deeds and forbade evil deeds. Through her the women of Egypt and Damascus were largely guided to the right path. Scholars and common people alike showed her unbounded respect. She was an accepted figure among all." [60]

8. Social service and public welfare work

Just as Muslim women have built many madrasas, maktabs and mosques, they have also benefited the common people by building numerous inns, ashrams and reservoirs by doing many public welfare works.

Inn construction

Zahra bint Muhammad was a very honest and spiritual woman. She got Dimashq an inn called 'Rabatuuz Zahra' in her own name. She built her own abode next to it and served the worshiping Gujarini, worldly and chaste women who came to the inn with knowledge and religion. Fatima bint Husayn Razia was an Ibadat Gujarini speaker and woman. She built an inn for spiritual women. The women of Makkah Mukarrama built many inns. Those inns had all kinds of facilities and facilities for Abida and Jahidaa women. In Imam Taqiuddin Fasi al-Makki's Shifaul Garam, there are instructions for some taverns. Caliph Muqtadi Abbasi, the governor of Egypt, built an inn called 'Rabat Faqiya' in 492 AH, which was waqf for widows and destitute women. There was an inn called 'Rabat Umme Khalifa' named after the mother of Khalifa Nasir Abbasi, which was waqfd in 579 AH. Sharifa Fatima bint Ameer Abu Laila Muhammad built the inn named 'Khatun' in 577 hijri and made it waqf. Umme Husayn bint Shihabuddin Tabari al-Makkiya built an inn named Sayyida and gave it as waqf for the fakirs and the poor. An inn called 'Rabat Bint Taj' is chill. The inn was waqf for those women who traveled from their country to

[59] Athar Mubarakpuri,Ibid, p. 69.

[60] Ibid, p. 70

Mecca and engaged in worship and self-rectification. Two women named Umme Sulaiman and Bintul Harabi established two ashrams in Mir called 'Zabiyya Umm Sulaiman' and Rabat bintur Harabi', where the Abidah women of Makkah lived. The ruler of Yemen Ashraf Ismail Ibn Fazl's wife and a woman named Karima built an inn called 'Rabatul Hamiya' and gave it as waqf. Students also lived in these inns.[61] In this way, these noble women have rendered services to all kinds of people in different ways. May Allah accept their efforts.

Construction of waterways

Zubayda in the canel

The noble woman Zubayda, the wife of King Harunur Rashid, has done many philanthropic and welfare works in Makkah and Madinah, which has been benefiting people for ages. Her unique achievement is Nahare Zubayda. This feat of hers will keep alive the contribution of women for ages. She dug a canel to provide drinking water to the pilgrims, which is famous in the world as 'Nahre Jubaida'.[62] The Abbasid caliphs ruled a vast empire for hundreds of years, including Jajirat al-Arab, present-day Saudi Arabia. There was no source of water in the desert-prone holy city of Makkah except for the water of the Jam Jam. As a result, pilgrims suffered from the lack of fresh water at that time. The canel was dug at a time when modern technological facilities were not available. This canel has served people for thousands of years. One branch of the canel was dug from Wadi Nu'man to Arafat and the other branch from Hunayan to Makkah. In order to make the water fresh, other than the sea, various mountain springs and natural sources are bought permanently and that water is flowed into canels. The hardships of haji and farmers were permanently removed.

Zubaida is a name with a history

Umme Zafar Zubaida, wife of Khalifa Harunur Rashid, was named Amatul Aziz. Her grandfather Khalifa Abu Jafar Mansoor used to affectionately call her 'Zubaida' from childhood. Since then she became famous by this name. Later, she faded into the pages of history under this name. She was born in Mosul, Iraq in 149 AH. Grandfather grew up in the palace of Caliph Abu Jafar Mansur. Zubaida was the daughter of Jafar, the eldest son of Caliph Al-Mansur, the founder of the city of Baghdad. In 165 hijri, Caliph Harunur Rashid married his cousin zubaida. She was the bearer of the blood of the Prophet (sm).

---

[61] Athar Mubarakpuri, Ibid, pp. 83-85.

[62] Nahar means narrow, stream, canal etc.

A unique woman of the era

It is said that there was no other scholar, pious, philanthropic and intelligent woman like her in the contemporary world. The Queen's reputation for scholarship on the Qur'an, Hadith, Ijma, Qiyas, history, geography, geometry and theology spread far and wide. Qeen Zubaida was most interested in any good work and foremost in any good and virtuous work. She kept 100 women in the royal palace. They used to recite the Holy Qur'an one after the other. The sound of Holy Quran recitation could be heard in her palace 24 hours a day. She used to donate a lot.

Wonderful dream

Legend has it that Queen Zubaida dreamed one night of numerous men having physical intercourse with her. After waking up she felt very embarrassed. A shrewd maid told her about her dream and sent her to a famous religious man in Baghdad for an interpretation of the dream. Hearing about the dream from the maid, the religious man said, 'This cannot be your dream. Whose dream you tell first, then I will explain.' After explaining everything, the explainer said, Queen Zubaida will do something that will benefit countless people.

Acute water crisis

During the reign of Caliph Harunur Rashid in 193 A.H., the scarcity of water was so severe that a bucket of water was sold for 20 dirhams. Even the extra management of water by Khalifa Harunur Rashid could not relieve the water problem of the Hajis. After his death in 193 hijri, Queen Zubaida went to perform hajj.

Immediate decision to dig the canel

Seeing the water problem in the holy Mecca distressed her so much that she immediately decided to dig a canel to end the water problem forever. The second Caliph of Islam, Umar Ibnul Khattab (ra) provided water on an emergency basis for the pilgrims arriving in Mecca. Mu'abiyah (ra) expanded it further. Queen Zubayda said to the people while digging the canel, 'I am closing all accounts for the purpose of digging the canel. Those from whom I receive money shall not be repaid, and those to whom I am indebted shall be repaid quickly at a double rate.' She then ordered a canel to be dug up to the holy city of Makkah for the benefit of the hajis. People have been benefited by this canel for thousands of years.

Long road version

In addition, Queen Zubaida built a road of about 1,400 kilometers across the desert from Kufa to the holy city of Madinah and the holy city of Mecca, which was used by pilgrims. Holy Mecca and Holy Madina were under the rule of Abbasids based in Baghdad for a long time. As a result, the Abbasid rulers sponsored the road renovation, facilities, security, etc.

for traveling to this holy city with Baghdad. In ancient times there was a practice of resting during the day and traveling during the night. As a general rule, up to 16 miles could be covered in one night. The resting place after 16 miles was called Manjil. Queen Zubaida spent huge sums to improve the facilities of the pilgrims traveling from Baghdad to these two holy cities. She also repaired roads by removing sand on the plains and cutting mountains for ease of camel, donkey and horse travel.

Plans for excavation of underground canels

Queen Zubaida sent famous engineers and surveyors from different parts of the world to dig the canel. After surveying the entire area, they decided to excavate the canel from Hunayan-the mountain spring in the mountainous valley between the holy Makkah and Taif, which supplied the inhabitants with drinking water and irrigation water. The region is rocky, barren, dry and its climate is hot. As a result, it was difficult to sustain the existence of a canel on the surface. So the engineers planned to dig underground canels through tunnels, water stations were set up at intervals on the surface so that the people could collect water from these canels to meet their needs. Water from the springs of the Hunayan Valley and other sources along the way are channeled towards this canel and connected to it. At the behest of Queen Zubaida, other sources of spring water in the Hunayan Valley were purchased for a large sum of money. Thus a canel was cut through the mountains from Hunayan to Makkah and another canel was cut through the mountains from Numan Valley to Arafa. Then it was brought to Muzdalifah and Mina. The representative of this work told her, the work you want to do is very expensive. In response, Zubaida said, 'You keep doing this. If it costs a dinar for every hammer blow to break a mountain, I am willing.' According to one estimate, seventeen lakh dinars were spent to build the Zubaida stream. After finishing the work, when the representative went to zubaida to listen to the account, she told him that there is no need to pay the account. We leave this reckoning for the 'Day of Reckoning'. [63]

Damaged by the earthquake

In 245 hijri there was an earthquake in the holy area of Mecca. As a result, cracks appeared in different parts of the canel. It was immediately repaired on the orders of the then Caliph. Later several rulers developed the canel. Due to lack of management and maintenance over time, the Zubaida canel suffered extensive damage and water supply was cut off. After several centuries new and sufficient sources of water were created to meet the water demand. Later no such initiative was taken to sustain the existence

[63] Ibid, p. 149-150.

of Zubaida canel. In 1295 hijri, the then rulers formed a committee to manage and repair the Zubaida canel. But unfortunately in 1344 hijri the canel was badly damaged by the flood in the upstream Numan valley. Water supply was cut off for three months. After King Abdul Aziz assumed power, he renovated the canel. But in early 1400 hijri due to various reasons the water flow of Zubaida was completely stopped and it was not restored. The river that flows past Arafat Maidan, Muzdalifah and Minaret is lifeless today. But there is a great memory of the noble woman Zubaida. Even today the Muslim world reverently remembers that immortal memory.

Other contributions

Zubaida built five more big houses in Makkah in addition to the said watercourse. She bought many houses in Makkah and gave them as waqfs for travelers; Darul Arkam is one of them. She ordered her servant 'Babu Yahya Kabir' to build an ablution and endow it as waqf. This noble woman has also done many philanthropic and welfare works, through which people are benefiting for ages. Finally this noble empress passed away in 216/831. May Allah grant her a high position in Jannah.

Contribution of Muslim Women to Literature and Calligraphy

9. Contribution of Muslim women in poetry and literature

Muslim women also pioneered in literary practice and gained reputation and fame. Of course, there was an enthusiasm for literary pursuits in them from before. There used to be a majlis of poetry. Abu Bakr (ra) himself used to be the chief guest at poets' gatherings or take the seat of the president and lead the poetry reading program at gatherings. His noble daughter Ummul Mu'minin Aisha (ra) used to compose poetry. She recited many poems. Among others were Khansa, Sawda, Sufiya, Atiqa, Umama, Murdia, Hind bint Harith, Zaynab bint Awan, Atiqa bint Zayd, Hind bint Anas, Umme Ayman, Karila, Abdaria, Kasbah bint Rafi', Maymunah, Balabiya, Niyam, Ruqayyah (ra.) other women became very famous in poetry. Talented female poets like Khansa (ra) were very rare in that era. Her poetry has been published in book form. Aisha (ra) was a witty poet, historian and a powerful orator. Her biography has been recorded only through the quotations and descriptions of his versatile talents.[64] Apart from this, Aisha Bint Talha (ra) was very well versed in poetry, literature, astrology and astronomy. Sakina Bint Husayn (ra) was proverbial in poetry and literature. Besides being a linguist, Lubni (ra) was also a scholar of Arabic grammar.

---

[64] Khan, Fazlur Rahman, Education System in Islam and Bangladesh, (Dhaka: 1992), p. 84-85.

10. Contribution to calligraphy

There are many Muslim women whose names have been written in the pages of history as katiba or scribes. They have earned reputation for beautiful handwriting. Even in the royal courts of kings and rulers, they performed the duties of scribes. Some of such noble women are-

1.Ummul Fazal Fatima bint Hasan

Umme Fazl Fatima bint Hasan Ibn Ali al-Aqra al-Baghdadiyya. She was known as Katiba bint al-Aqra. She was the teacher of the time for her handwriting and fine writing. She could copy the manuscripts of the famous scribe Ibn al-Bawab in full. Scholars used to learn handwriting from her. Imam Az-Zahabi (ra) said: الكاتبة التى جودوا على خطها وكانت تنقل طريقة بن البواب 'Her handwriting was so beautiful that people used to copy it[65]. And he used to copy the handwriting of Ibn al-Bawab (d. 413/1022).[66] Ibn al-Jawzi (ra) said: **وكان ختها مستحسنا في الغاية**'Her handwriting was very beautiful.'

A gift of one thousand dinars

It is noted that Bint Aqra was summoned to the city of Jabal by minister Abu Nasr Malik Qandari for her beautiful manuscripts. and with her wrote the treaty between Azizi and Isai Shah Rome in the Diwan. The contract was only one page long. But in return she was given a gift of 1 thousand dinars.[67] In fact he was an important figure whose art was highly valued and respected. He used to travel to different areas for this work.

2. Amatul Aziz Khadija bint Yusuf

Amatul Aziz Khadija bint Yusuf was an alim, fazil and muhaddis. She was also a famous manuscript writer. She received training from famous scholars of this subject. About her, Imam Az-Zahabi (ra) said: وجودت الخط على جمعة' She learned this beautiful handwriting from a group of experienced people.'[68]

3. Fakhrun Nisa Shuhda bint Abi Nasr Ahmad Ibnil Faraj

She was titled Katib or Scribe. Her handwriting was very clear and eye-catching. Ibn al-Jawzi (ra) said: وكان لها خت حسن'Her handwriting was very good.' Ibn Khallikan (ra) wrote about her beautiful handwriting: كانت من العلماء وكتبت الخط الجيد 'She was a scholar. Her handwriting was

---

[65] Athar Mubarakpuri,Ibid, p.76.

[66] His full name is Abul Hasan Ali Ibn Hilal Ibn Abdil Aziz. He was known as Ibnul Bawab. His handwriting was very beautiful. He was a famous manuscript and calligrapher of the Abbasid period.

[67] Ibid.

[68] Ibid, p.71.

excellent.'[69] The opinion of the scholars about her is that - Shuhda was a famous calligrapher, and a highly respected and reliable hadith scholar. Biographers introduce her thus- She was a narrator of famous hadiths and a pride of women. Her father Abu Nasr gave her daughter a deeply institutionalized education and arranged for her to study under many eminent hadith scholars. Many people who were thirsty for knowledge would gather to listen to her lectures from Sahih al-Bukhari and other hadith collections. Some even falsely claimed to be her students despite not being her students. She was a Muhaddith of Iraq with high isnad. Her writings gained great popularity and survived from generation to generation. [70]

4. Fauz Bint Muhammad Ibn Hasan Ibn Yahya Ibn Ali

Wazir al-Hadi Ibn Ibrahim said, 'She was an alim. She had a fancy handwriting.' She used to teach Arabic to men among her relatives. Her grave is next to the Mosque of Ibn Wahhab in Sana' al-Mashhad al-Ahmar, the capital of Yemen.[71]

5. Aisha bint Ahmad

Aisha bint Ahmad bin Qadeem (ra) was a native of Spain. She excelled in calligraphy. Spain's famous scribe and literary Mujna was the special scribe and munshi of Amir Nasir Dinullah. Her handwriting was very beautiful and excellent. She passed away in 358 hijri.

6. Caliph Mu'tamad Allah's servant

Munya, the scribe, was the servant of Caliph Mu'tamad Alallah Abbasi. She became especially famous in script and Munshiana. She was awarded the title of 'Katiba or Lipikar'. She acquired the knowledge of hadith from Abu Tayyib Muhammad ibn Ishaq ibn Yahya al-Washsha. And Ubaidullah Ibn Husayn Ibn Abdullah Bazzaz Ambari gained the knowledge of Hadith from her[72].

7. Safia bint Abdullah

Safia bint Abdillah was well-known among the ulama and fazilahs of Spain for her beautiful handwriting.

---

[69] Ibn Khallikan, Ahmad Ibn Muhammad, Shams al-Deen, Ofayat al-A'yan, V.1, (Egypt:1948),p.245.

[70] Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, al-Asqalani, al-Mazmaul Mu'as-sas lil Mu'zam al-Mufahras, V. 3, 1st edition, (Beirut: Darul Ma'rifa, 1413/1992), pp. 255-256.

[71] Akram Nadvi, Dr., Muhammad, Al Muhaddisat, 1st edition, translated by Mizan Rahman, Mardia Mumtaz and others, (Dhaka: Guardian Publications, 2022), p. 92.

[72] Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr, Ahmad Ibn Ali, : Tariqhu Baghdad, V. 14, (Egypt: Matbaatus-Sa'adah, 1931), p. 442

8. Lubna, the scribe of Khalifa Hakam

Lubna was the special scribe of the Caliph Hakam Ibn Abdir Rahman Umabi among the female Alims of Spain. She was responsible for writing official letters. She had special skills and abilities in script. And her handwriting was very clear and bright. She also had special erudition in mathematics. Apart from this, she was proficient in various subjects including poetry, Arabic grammar and rhyme.

9. Aisha bint Umara

Aisha bint Umara ibn Yahya Sharif Bajadia Africa was a writer and poet. Her handwriting was very clear and neat. She copied a treatise in 18 volumes in her manuscript. Ibn Fayyaz wrote in the book "Akhbaru Qurtaba", there were 170 alimas and fazilahs in the eastern region of Qurtaba, who wrote the Holy Qur'an in Kufic handwriting.[73] It is about a region, then what was the condition of the whole country?

Conclusion

Since the beginning of Islam, along with men, Muslim women have been making important contributions in various fields of knowledge and science and in social service and public welfare. Their contribution has in some cases surpassed the contribution of men. Here we have tried to highlight only some of the glorious contributions among them. This proves that their glorious contribution in building an ideal society and civilization is undeniable. By this the claim of the so-called progressives-"Islam has confined women to the house. Deprived them of education. As a result of which Muslim women could not contribute much."-All these strange claims have also been proven futile. And the main reason behind all these strange claims is their poor knowledge about Muslim women. Finally, I urge the women community to come forward on the path of Islamic knowledge. So that they can enlighten the society with the light of Quran and Hadith like their predecessors and be able to contribute to various branches of science.

Reference:

1. Al-Qur'anul Kareem, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1425/2004).
2. Al-Mizzee, Jamal Uddin, Tahjibul Kamal fi Asmair Rizal, V..3, (Beirut: Muassasatur Risalah, 1980).
3. Muhammad Ibn Sa'd, At-Tabaqat al-Kubra, Tahqiq: Muhammad Abdul Qadir Atta, V.7, (Beirut: Darul Qutubil Ilmiyyah, 1st edition, 1410/1990).

[73] Athar Mubarakpuri, Ibid, p.78; Original Arabic: **حكي ابن فياض في تاريخه في اخبار *قرطبة* قال: كان بالربض الشرقي من *قرطبة* منة *وسبعون* امرأة كلهن يكتب المصاحف بالكوفي**

4. Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, Al-Asqalani, Tahjibut Tahjib, V. 6, (Beirut: Daru Ihyait Turasil Arabic,u.d.).
5. As-Sulami, Abu Abdir Rahman, Tabaqatus-Sufiya, (Beirut: Darul Qutb al-Ilmiya, 2003).
6. Qazi Athar, Maulana, Mubarakpuri, Muslim narider Ilmi obodan,-Translated by Ahmadullah, 1st edition, (Dhaka: Azan Publications, 1443/20210).
7. Muhammad Ibn Abi Ya'la, Abul Husayn, al-Hambali, Tabaqat al-Hanabila, V.1, (Cairo: Matba'atus Sunnah al-Muhammadiyya, 1371/1952).
8. Al-Uthmani, Sayyid Ibn Husayn Al-Afanee, Dr., Salah al-Ummah fi Uluwail Himmah, (Beirut: Muas Satur Risalah, 2020).
9. Az-Zahabi, Muhammad Ibn Ahmad, Shamsuddin, Siyaru A'lamin Nubala, V. 2, (Cairo: Darul Ma'arif, u.d.).
10. Kahhala, Umar Rida, A'lamun Nisa Fee Alimil Arab Wal Islam, V.3, (Beirut: Muas Sasah Ar-Risalah, 2008).
11. Dr. M. Zubayr Siddiqi, Hadis Literature: Its Origins Development of Special Features, (Cambridge : Islamic Texts Society,1993).
12. Contribution of Women Scholars in Hadeeth Practice Monthly Ash-Shahdah, 1st year, 3rd issue, 1420 AH, March 2000.
13. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad Ibn Abi Bakr, I'lamul Muaqqi'in an Rabbil Alamin, V..1, (Kurdistan: Matba'a Fayzullah al-Kurdi, 1325 AH).
14. Ramadan Yusuf, Muhammad Khair, Kitabu Faqihatin Alimatin, (Riyadh: Daru Tariq, u.d.).
15. Al-Qazi Yaz ibn Musa, Abul Fazl, Tartibul Madarik wa Takribil Masalik, V.4, (Morocco: Matbaatu Fudala al-Muhammadiya, u,d.).
16. Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, Al-Asqalani: Al-Isabah, V. 8, (Beirut: 1328/1910).
17. Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, Al-Adabul Mufarad, 3rd edition, (Beirut: Darul Bashayir al-Islamiyyah, 1989).
18. Abdur Razzak As-Sayed, Abdullah, Kitabut Tibb wa Rayidatuhul Muslimat, (Maqtabatul Manar, 1985).
19. Fuqayqi, Adib Tawfiq, Dr., Tarikh al-Alamit Tibbil Iraqi al-Hadith, (Al-Fukayqi, 1989).
20. Habiba Akhtar, Alema, November 28, Daily Inqilab, 2023.
21. Khan, Fazlur Rahman, Education System in Islam and Bangladesh, (Dhaka: 1992), p. 84-85.
22. Ibn Khallikan, Ahmad Ibn Muhammad, Shams al-Deen, Ofayat al-A'yan, V.1, (Egypt:1948).
23. Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, al-Asqalani, al-Mazmaul Mu'as-sas lil Mu'zam al-Mufahras, V. 3, 1st edition, (Beirut: Darul Ma'rifa, 1413/1992).
24. Akram Nadvi, Dr., Muhammad, Al Muhaddisat, 1st edition, translated by Mizan Rahman, Mardia Mumtaz and others, (Dhaka: Guardian Publications, 2022).
25. Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr, Ahmad Ibn Ali, : Tariqhu Baghdad, V. 14, (Egypt: Matbaatus-Sa'adah, 1931).

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জার্নাল
৬৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

শরী'আবিষয়ে গবেষণাকর্ম : প্রসঙ্গকথা

মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ্[১]

[Summary of research: (1). Every research work has a result, conclusion and something new or new conclusion or new output. 'Fatwa' also means that which contains innovation, new decision or new guidance and research ie more or less ijtihad; as stated in its explanation and defination. As such 'research' means new fatwa and 'fatwa' means where new research exists.

(2). 'Ijtihad' i.e. 'research' and 'elements of research' are not the same thing. After researching the original material, a third material with a different name was born. For example, the food prepared by processing rice or wheat-flour powder becomes bread, pitha or cake etc. But the thing to remember is that the name of bread or pitha is not rice or flour; However, bread or pitha cannot be prepared without the basic ingredients of rice or flour. On the other hand, the guidance, rules and classification of a Muslim's daily life are prepared or classified by the main elements and proofs of the Qur'an and Hadith, and are called Fiqh and Fatwa or 'Ilme-Shariat' or ' Lore of Shariat'.

(3). Ingredients by which bread, pitha, cake or medicine etc. are prepared; Being an expert in those ingredients and being an expert in preparing bread, pitha, cake or medicine are not the same thing. Similarly, being an expert in 'Hadith' or 'Tafseer' does not mean being a 'Shariat specialist' or a 'law specialist'.

(4). That is the reason why one can be called 'specialist of Tafseer' or 'specialist of Hadith' after acquiring enough knowledge about the Tafseer of the Holy Quran and the Sayings Hadith of the Holy Prophet (PBUH) which are the main components and main source of the rules; Cannot be called 'Shariat specialist'.

---

১. লেখক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর মুফতী ও গবেষক।

(5). 'This Subjects Materials' or 'sources' are limited; But by keeping it in the right place and storing it according to the rules, it is possible to prepare ever-new products or alternatives by continuing the research work from it for ages, by adding innovations in processing techniques. But if something new is added to the 'Tafseer' of the Qur'an, this core element of 'Sharia Science', it becomes (تَفْسِيْرٌ بِالرَّأْيِ) a 'fabricated or perverted Tafseer' and the Holy Prophet (PBUH) said a word or a sentence about the main component Hadith. (فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ,) "As if he had made hell as his abode" He (PBUH) himself uttered such harsh words!

(6). so 'research' on tafseer is only to keep this material in its proper place and consolidate it. To say 'research' on hadith is only to keep this main material organized and in its proper place; It is not the job of a hadith scholar or tafsir scholar to extract or discover something new from it.

(7). Whatever or whatever (laws) will be discovered by 'research' for the ever-new problems arising from the original material over the ages is called 'Sharia Biddya' i.e. Fiqh and Fatawa Biddya related to the rules. It is in view of such fact that it is said that 'research' means fatwa Biddya and 'fatwa' biddya means the research.

Therefore, before conducting any kind of research related to the rules of Islamic Shariah, in addition to sufficient basic knowledge of the relevant subject, as well as relevant and relevant other important issues that a researcher wants to consider, that is the main theme of this article.

১.১. গবেষণা'র সার-সংক্ষেপ: (১). প্রতিটি গবেষণাকর্মের ফলাফল, উপসংহার ও নতুন কিছু বা নতুন সিদ্ধান্ত বা নতুন পদক্ষেপ থাকে। 'ফাতওয়া' মানেও যার মধ্যে কিছু নতুনত্ব থাকে, নতুন সিদ্ধান্ত বা নতুন নির্দেশনা থাকে এবং গবেষণা কর্মে কমবেশি ইজতিহাদ থাকে; যেমনটি তার ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায় বলা হয়েছে।[২] সে হিসাবে 'গবেষণা' মানেই নতুন ফাতওয়া এবং 'ফাতওয়া' মানেই যেখানে নতুন গবেষণা বিদ্যমান।

---

২. 'ফাতওয়া'র আদব, সংজ্ঞা, উসূল-নীতিমালা ও বিধানাবলী বিষয়ক গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য; ("যাতে তিনি (মুফতী) ইজতিহাদ-গবেষণা করার মতো পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হন") অর্থাৎ মুফতী হতে গেলে গবেষক হতে হবে যেন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। যেমন ১. আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী,**'শরীয়া বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের নীতিমালা'**:, অনুবাদ- মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ্, প্রকাশনা বিভাগ, প্রকাশকাল, ২০০৯খ্রি.; ২. মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ্,**'ফাতওয়াদানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা'** : পৃ. ১৩-১৪, ৭৯, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর- ২০২২খ্রি.। ৩. মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ্, **'ঘুরে এলাম আজব এক দেশ'** : পৃ. ৮৫-৮৭; সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী- ২০২৪খ্রি., ইত্যাদি গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

(২). **'ইজতিহাদ'** তথা 'গবেষণা' ও 'গবেষণা'র উপাদান' এক বস্তু নয়। মূল উপাদানে গবেষণা করা'র পর ভিন্ন নামে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ে জন্ম হয়। উদাহরণস্বরূপ চাল বা গম-আটা'র গুঁড়ো প্রক্রিয়াজাত করে যে খাবার তৈরি করা হয় তার নাম হয়ে যায় রুটি, পিঠা বা কেক ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখা'র ব্যাপার হচ্ছে, রুটি বা পিঠা'র নাম চাল বা আটা নয়; যদিও চাল বা আটার মূল উপাদান ব্যতীত রুটি বা পিঠা প্রস্তুত করা যায় না। ঠিক তদ্রূপ কুরআন ও হাদীছ এর মূল উপাদান ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে পথ-চলা'র যে নির্দেশনা, বিধি-বিধান প্রস্তুত বা শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, তার নাম ফিকহ্ ও ফাতওয়া বা 'ইলমে-শরীয়ত' তথা 'শরীয়ত বিদ্যা'।

(৩). যে উপাদানগুলো দ্বারা রুটি, পিঠা, কেক বা ঔষধ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়; সেসব উপাদানে বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং রুটি, পিঠা, কেক বা ওষুধ প্রস্তুতকরণে বিশেষজ্ঞ হওয়া– এক বিষয় বা সমান কথা নয়। একইভাবে 'হাদীছ' বা 'তাফসীর' বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া মানে 'শরীয়ত বিশেষজ্ঞ' তথা 'বিধান বিশেষজ্ঞ' হওয়া বোঝায় না।

(৪). যে কারণে বিধি-বিধানের মূল উপাদান ও মূল উৎস পবিত্র কুরআনের তাফসীর এবং মহানবী (স.) এর বাণী/ হাদীছ বিষয়ে কারো পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর তাঁকে 'তাফসীর বিশারদ' বা 'হাদীছ বিশারদ' বলা যেতে পারে; 'শরীয়ত বিশেষজ্ঞ' বা 'শরীয়ত বিশারদ' বলা যাবে না।

(৫). 'উপাদান' বা 'উৎস' হয়ে থাকে সীমিত; তবে তা যথাস্থানে ঠিক রেখে এবং বিধি মোতাবেক তা সংরক্ষণ করে তা থেকে যুগ যুগ ধরে গবেষণা কর্ম অব্যাহত রেখে, প্রক্রিয়াজাত কৌশলে নতুনত্ব যোগ করে, নিত্য-নতুন পণ্য বা বিকল্প কিছু প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু 'শরীয়া বিদ্যা'র এই মূল উপাদান কুরআনের 'তাফসীর' বিষয়ে নতুন কিছু যোগ করতে গেলে সেটি হয়ে যায় (تَفْسِيْرٌ بِالرَّأْيِ) 'মনগড়া বা বিকৃত তাফসীর' এবং মূল উপাদান হাদীছ বিষয়ে মহানবী (স.) যা বলেননি তেমন কোন শব্দ বাক্য বললে– (فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) "তার ঠিকানা যেন সে জাহান্নামকে বানিয়ে নিল" –এমন কঠোর বাণী তিনি (সা.) নিজেই উচ্চারণ করেছেন!

(৬). সুতরাং তাফসীর বিষয়ে 'গবেষণা' কেবল এতটুকু যে, এ উপাদানটিকে যথাস্থানে ঠিক রাখা ও সুসংহত করা। হাদীছ বিষয়ে 'গবেষণা' বলতেও কেবল এটুকু যে, এ মূল উপাদানটিকে সুসংহত ও যথাস্থানে ঠিক রাখা; এ থেকে নতুন কিছু বের করা বা আবিষ্কার করা হাদীছবিদ বা তাফসীরবিদ এর কাজ নয়।

(৭). এতদুভয় মূল উপাদান থেকে যুগ যুগ ধরে উদ্ভূত নিত্য-নতুন সমস্যার প্রয়োজনে যা কিছু বা যত কিছু (আইন-বিধান) 'গবেষণা' করে আবিষ্কার করা হবে, তার নাম 'শরীয়া বিদ্যা' তথা বিধি-বিধান সংক্রান্ত ফিকহ্ ও ফাতওয়া বিদ্যা। এমন বাস্তবতার নিরীখেই বলা হয়ে থাকে যে, 'গবেষণাকর্ম' মানেই ফাতওয়া বিদ্যা এবং 'ফাতওয়া' বিদ্যা মানেই গবেষণাকর্ম।

সুতরাং ইসলামী শরী'আ এর বিধি-বিধান সংক্রান্ত যে কোনো রকম গবেষণাকর্ম পরিচালনা'র পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির পর্যাপ্ত মৌলিক জ্ঞান এর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক আরও যেসব জরুরী বিষয় একজন গবেষকের বিবেচনায় থাকা উচিত, সেটাই আমাদের এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

১.২. গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য : সাধারণ পাঠক ও মুসলিম জনগণ এবং ফিকহ্ ও ফাতওয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন এমন সব আলেম ও ইসলামী স্কলারদের এমন ধারণা বিদূরিত করা যে, 'ইসলামী কোন বিষয়ে গবেষণা করা ভিন্ন বিষয় এবং 'ফাতওয়া বিদ্যা'টি হয়তো ব্যতিক্রম বিষয়।'

২.০. Keywords/**মৌলিক শব্দ**: 'গবেষণা', 'ফাতওয়া', 'হাদীস বিশেষজ্ঞ', 'তাফসীর বিশেষজ্ঞ' ও 'শরীয়ত বিশেষজ্ঞ'।

৩.০. গবেষণা পদ্ধতি : বিশ্লেষণমূলক, বাস্তব অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক।

৪.০. সূচনা : হাতে-কলমে বাস্তব গবেষণাকর্ম শুরুর মাধ্যমেই একজন মুফতির 'মুফতী' বা 'ইফতা ডিগ্রী' বা 'তাখাসসুস'-অনার্স স্তরের ছয় বছর সময় পার করা কালীন[৩], ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যোগদানের পূর্বে আরো ১৫ বছর গবেষণা-ফাতওয়ার চর্চাকালীন; এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যোগদান পরবর্তী বিগত ১৯ বছরে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম পরিচালনা এবং বিশেষ করে প্রকাশনা, অনুবাদ ও সংকলন, প্রকাশনা প্রকল্প ও গবেষণা বিভাগের প্রচুর পাণ্ডুলিপি, প্রবন্ধ ইত্যাদি রিভিউ, সম্পাদনা'র সূত্রে লেখক ও গবেষকদের যেসব মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক অসঙ্গতি ও স্খলন নজরে এসেছে সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করতেই আমার এ প্রয়াস। যে বিষয়গুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা জার্নালে প্রকাশের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়ে থাকলে তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর জন্য যেমন বিরাট ও অভূতপূর্ব সম্পদ হয়ে থাকবে; একইভাবে তা থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৫.০. সে সব অবগতি, নিয়ম-নীতি ও লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

(এক)

৫.১.'সৃজনশীল' বা গবেষণা প্রসঙ্গ : সৃজনশীল লেখা বা সৃজনশীল গবেষণা বলতে কি বুঝায়? আসল সৃজন বা সৃষ্টি তো মহান আল্লাহ নিজেই করেন। বান্দা তো আর স্রষ্টা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, স্রষ্টার দান ও তাঁর সৃষ্টি করে রাখা এ জগত ও জীবনের প্রয়োজনে তাঁরই ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে রাখা উপকারী উপকরণসমূহ্ ও বৈধ উপাদানগুলোকে মানব কল্যাণে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেয়া বা ব্যবহার উপযোগী করার নামই হল গবেষণা করা বা আবিস্কার করা বা সৃজনশীল কিছু একটা করা। এ বিষয়টি জাগতিক জীবনে ডাল-ভাতের প্রয়োজনে যেমন জরুরী তেমনি

৩. নিউ টাউন করাচী, পাকিস্তানে ২ বছর, জামেয়া রাহমানিয়া সাত মসজিদ, ঢাকায় ২ বছর এবং কামিল ফিকাহতে ২ বছর।

পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের স্বার্থে এবং সঠিক ও সুন্দরভাবে এবং সুশৃঙ্খল ও সংশয়হীনভাবে ধর্মকর্ম পালনের স্বার্থে আরও অধিক জরুরী।

(দুই)

৫.২.'গবেষণা'র সাধারণ সমস্যা : পূর্বাপর সংযোগ ও বিবেচনা': অবশ্য এক্ষেত্রে গবেষণার পূর্বাপর একটা ধারাবাহিকতা থাকে এবং সেই ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য না করে কেউ যদি এখান থেকে এক মুষ্টি, ওখান থেকে এক মুষ্টি নিয়ে ডালে-চালে মিশ্রিত করে খিচুড়ি করে ফেলে; কিংবা যে বিষয়গুলো সাজানো-গোছানো হয়ে গেছে (dicided) এবং 'ইজমা' তথা ঐকমত্যের ভিত্তিতে পূর্বেই স্থিরকৃত হয়ে আছে, তার আগা-গোড়া না বুঝে সেটিকে লেজ ধরে টেনে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়, তার নাম তো গবেষণা হতে পারে না, যা বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে, নতুন নতুন অপরিপক্ক গবেষকগণ যার নযীর রাখছেন।[৪]

হ্যাঁ, হাজার বছরের জ্ঞান-গবেষণার ধারাবাহিকতায়ও যে বিষয়গুলো আসেনি; কিংবা বিষয়গুলো এমন যা পূর্বে ছিলই না, নতুন উদ্ভূত; কিংবা এসেছে বটে, তবে পরবর্তী যুগ-যামানার চাহিদার আদলে আসেনি; কিংবা ওই আসার মধ্যেও বিশেষ একটা দিক বা একটা প্রশ্ন বাদ পড়ে গেছে; যা আপনি সেই কুরআন-হাদীস ও নিয়ম-নীতিমালার মধ্যেই পেয়েছেন, যেসব নস্ ও দলীল-প্রমাণ তাঁরাও ব্যবহার করেছেন এবং তাঁরাও সামনে রেখেছিলেন। তা হলে যথার্থই আপনার নতুন কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে পেশ করাকে, সৃজনশীল বলা হবে বা গবেষণা শিরোনামে সাদর স্বাগতম জানানো যেতে পারে।

(তিন)

৫.৩.গবেষণার মারাত্মক সমস্যা ও ভাবভক্তি প্রসঙ্গ : একজন মুসলমানের কাছে ঈমান ও ইসলাম এর পাশাপাশি ধর্মের প্রতি আস্থা ও ভাব-ভক্তির বিরাট একটা মূল্যায়ন থাকে এবং তা থাকা উচিৎ। বিশেষত আল্লাহ্, রাসূল, আসমানী কিতাব ও হাদীস, পরকালের বিষয়াদি, শা'আয়েরে ইসলাম, খানা-কা'বা, মক্কা-মদীনা এবং উস্তাদ-পীর এবং আলেমগণের ক্ষেত্রেও। কিন্তু এ বিষয়টিও শক্তভাবে মনে রাখা দরকার যে, শরা-শরীয়তেরই মৌল বিবেচনা, বিধান ও ভাষ্য মতে, অন্যতম দু'টি বাস্তব কারণে 'গবেষণা' ও 'ভাব-ভক্তি' এ দু'টি পরস্পর একে-অন্যের শত্রু, সতীন ও সাপে-নেউলে অবস্থানে হয়ে থাকে।

প্রথম কারণ, নবী-রাসূলগণ ও সাহাবাগণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বাইরে, এঁদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা যত বড় মুফতী বা আলেম বা পীর বা উস্তাদই হই না

---

৪. যার অনেক প্রমাণই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতী'র সিরিজ পুস্তক **'ফাতাওয়া ও গবেষণা সমগ্র-১**, ২, ৩, ৪, ৫- এ বিদ্যমান, উদাহরণত প্রথম খণ্ডের পৃ নং ২৮৬-৩০২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭-৫০০; ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন, যাঁদের নামের সঙ্গে 'মাওলানা', 'মুফতী' এমনকি **'মুফতিয়ে আযম'** এবং ডক্টরেট ডিগ্রীধারীর সংকেত ড. ও লাগানো থাকে।

কেন, আমরা ভুলের উর্ধ্বে নই। আবার কুরআন ও হাদীছের বাইরে, আমাদের ধর্মীয় বিষয়-ব্যাপারে লেখা বা রচনা ও গবেষণা বা প্রদত্ত ফাতওয়া যে ভুল হতে পারে না –তা নয়।

সুতরাং তেমন কিছু কোথাও ঘটে থাকলে আমাদের ভুল স্বীকার করা উচিৎ, তেমন বক্তব্য/অভিমতটি প্রত্যাহার করা উচিৎ, পুনর্বিবেচনা করা উচিত। অথচ বাস্তবে কী দেখা যায়? বড় হুযূরের হাজার হাজার ছাত্র-শিষ্য বা ভক্তদের প্রতি তাকিয়ে, নিজের প্রাপ্ত বা প্রাপ্য ভাব-ভক্তিতে ভাটা পড়তে পারে আশঙ্কায় নিজের কোনো ভুল বা অনিয়ম অন্য কোন মুহাক্কিক চিহ্নিত করে দিলেও, তা এড়িয়ে যাই। এমন কেন? কিভাবে ভুল হল? তা শুদ্ধ হয় কীভাবে বা কোন্‌টি সহীহ? তা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করতে চায় না। এমনকি তেমন সংশ্লিষ্ট কোনো বই-কিতাব বা দলীল-দস্তাবেজ পড়েও দেখেন না। কেননা, তাঁর সেই সময়ের বড়ই অভাব?

আবার এমন অনুসন্ধানে বিশ্বাস করলে বা মানতে গেলে, এমন আরও অনেক অনিয়ম বেরিয়ে আসবে; যার কারণে ভক্ত-শিষ্যরা পিছু হটতে পারে।

মোটকথা, সত্য-সঠিক গবেষণার অনেক বড় শত্রু এই ভাব-ভক্তির। অর্থাৎ ওই একজনের প্রতি নিষিদ্ধ ক্ষেত্রেও অবৈধভাবে ভাব-ভক্তি প্রদর্শন ও তা অব্যাহত রাখার কারণে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত ওই হাজার-হাজার লোকজন বা একটি দল নিজেরাও ভ্রষ্টতা হতে বেরিয়ে আসতে পারছে না। একইভাবে অমুক দল, তমুক দল এবং আরও অনেকে।

অথচ সহীহ নিয়ম হল, অমুক আমার উস্তাদ বা শায়খ তা যথাস্থানে ঠিক আছে এবং ঠিক থাকবে; কিন্তু অমুক বিষয়-বিধানটি যেহেতু অনুসন্ধানে আমার শায়খের বা উস্তাদের ধ্যান-ধারণার বিপরীত প্রমাণিত হচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে বা বিষয়টি আমি উস্তাদের নজরে নিয়ে আসি।

দ্বিতীয় কারণ হলো আমাদের অহমিকা বোধ, যার ফলে 'তালবীসে ইবলীস' আমাদের মনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বাসা বাঁধে। এই অহমিকাবোধের কারণে আমরা অন্য কারও বিশেষ করে নিজেদের দলমতের সঙ্গে সখ্যতা নেই এমন কারও গবেষণা অনুসন্ধানের অবমূল্যায়ন করি।

(চার)

৫.৫.'যাহা বলিব সত্য বলিব': 'বিষয়টি আমরাও বুঝি, তাঁরাও বুঝেন কিন্তু তৃতীয়পক্ষ তা বুঝে না'! সেটি আবার কী? সেটি হল কারও নামের সঙ্গে 'মুফতী' বা ডক্টরেট ডিগ্রীর 'ড.' লাগানো থাকলেই যে, "তিনি একজন বড় আলেম বা ইসলামী স্কলার এবং ইসলাম বিষয়ে তিনি সবকিছু জানেন, তাঁর বলা মাস্‌আলা ভুল হতে পারে না বা তাঁর বক্তব্য ভুল হতে পারে না" –বাস্তবে তা সত্য নয়।

৫.৬.'আমরাও বুঝি'মানে হল, এঁদের মাঝে কিছু সংখ্যক তো ভূয়া বা নামকা ওয়াস্তে আছেনই; বাকী অনেকেই বিধি মোতাবেক ও নিয়মের ভেতরে হয়ে থাকেন। এমন নিয়ম মান্যকারীগণ বিষয়ভিত্তিক যে সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পিএইচডি করেন বা ডক্টরেট অর্জন করেন, তাঁর শুধু ওই একটা বিষয়ে বেশ জানাশোনা হয়ে থাকে; বাকী ইসলামী বিষয়াদি হোক বা জাগতিক

বিষয়াদি হোক, হাজারো বিষয় ব্যাপারে তিনি যথা পূর্বং তথা পরং ই থেকে যান। তবে এটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ব্যতিক্রমও আছে।

তবে একটা বড় অর্জন হয় এভাবে যে, এঁরা গবেষণা বা অনুসন্ধান বলতে কি বোঝানো হয়? তা কীভাবে করতে হয়? কেন করতে হয়, তার লাভ কী? ভুল কিভাবে হয়? ভুল ধরতে হয় কিভাবে? অমুকের অনুসন্ধান বা অভিসন্দর্ভটি গবেষণার কাতারে পড়ে কি না? –এসব বিষয় এঁরা বুঝেন এবং এঁদেরকে বোঝানো সহজ হয়ে থাকে।

'তাঁরাও বোঝেন' মানে হল, এই একটা বিষয়ের বাইরে তাঁদের যে তেমন জানাশোনা নেই, অনুসন্ধান বা ঘাটাঘাটি নেই –তা তাঁরা নিজেরাও জানেন, স্বীকার করেন।

'তৃতীয়পক্ষ বুঝে না'মানে হল, এ দু'পক্ষের বাইরে জনগোষ্ঠির বিশাল ও বড় অংশটি কেবল নিজ নিজ এলাকা বা নিজ দলের বা নিজ স্বজন হলে বা নিজ পীর-উস্তাদ হলে, সেক্ষেত্রে ভালো-মন্দ বাছ-বিচার না করেই, অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসা সত্য-সঠিক বিষয়টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বরং গতানুগতিক ভাবধারায় নিজ পছন্দের লোকজনের পক্ষ নিয়ে নেয়। আর বলতে শুরু করে, "তিনি একজন মুফতী সাহেব! তিনি কি ভুল বলেন? অমুক একজন পিএইচডি হোল্ডার! তিনি কি কম বুঝেন? অমুকের কথায় হাজার-হাজার লোকজন উঠে-বসে, তাঁর কথাই ঠিক" –ইত্যাদি।

এমনটি হলে ধর্মীয় অঙ্গনে বা জাতীয় পর্যায়ে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে কীভাবে?

(পাঁচ)

৫.৭.প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো বা শৃঙ্খলা প্রসঙ্গ :এরা তো অনেকটা সাধারণ পাবলিক, তাই বেচারাদের কিছু বলেও লাভ নেই, কারণ এদের কাছে তো সঠিক-বেঠিক নির্ণয়ের মত প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা বুদ্ধি নেই এবং তেমন কোনো মাপকাঠিও নেই। অথচ যারা কিছুটা বা অনেকটা জানাশোনা মানুষ, উপরের লেভেলে অবস্থান করেন বা নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা রাখেন, তাঁরাও নিম্নের বাস্তবতার প্রতি মনোযোগ দেন না। যেমন :

স্নাতক বা স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে একজন আলেম শিক্ষার্থী অপরাপর জাগতিক বিষয়াদির অনুরূপ বিষয়ভিত্তিক কেউ সাধারণ স্তরের 'কামিল-মুহাদ্দিছ' বা 'কামিল-ফকীহ' বা 'কামিল-মুফাসসির' হয়ে বের হবার পর তিনি যদি পুন: একই বিষয়ে উচ্চতর এম. ফিল বা পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন, সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, এ বিষয়ে তাঁর গবেষণা করার মত যোগ্যতা পয়দা হয়েছে এবং আশা করা যায়, তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক কিছু বললে বা লিখলে, তা সঠিক হবে।

কিন্তু তিনি তাঁর এ ব্যাসিক বা মৌল ধারা বাদ দিয়ে যদি কেবল ডক্টরেট নাম লাগানোর লক্ষ্যে ইতিহাস বিষয়ে বা অন্য কারও জীবনী ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করে এই বিশেষজ্ঞ ডিগ্রী নিয়ে নেন, সেক্ষেত্রে তো এমন একজন নামধারী গবেষক শরীয়তের অন্য বিষয়ে তো নয়ই; এমনকি তিনি যে বিষয়ে কামিল পাশ করেছেন, সেই হাদীছ/তাফসীর/ফিকহ-ফাতাওয়া বিষয়েও তো

তিনি সহীহ-সঠিক গবেষণা চালাতে বা নির্ভরযোগ্য কোনো ফায়সালা দিতে পারবেন বলে আশা করা যায় না। বিশেষ করে এ যুগে যেখানে অধ্যাবসায় নেই, অধ্যয়নে ডুবে থাকার মানসিকতা নেই, সেখানে এ প্রত্যাশা অলিক।

উক্ত বাস্তবতাকে সামনে রেখে, একজন ইসলামিক স্কলার তিনি যদি তাফসীর বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী বা গবেষণা না করে থাকেন, তাঁকে এ বিষয়ে কাজে লাগানো যায় না; কেউ যদি হাদীস বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী বা গবেষণা না করে থাকেন, তাঁকে হাদীস বিষয়ে কাজে লাগানো ঠিক হবে না; কেউ যদি ফিকহ-ফাতাওয়া বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী বা গবেষণা না করে থাকেন, তাঁকেও ফাতওয়াদান বা শরীয়া বিষয়ে কোনো প্রকার সিদ্ধান্তদান কর্মে নিয়োজিত করা যায় না।[৫]

এ বিষয়টি ও বাস্তবতাকে যতদিন পর্যন্ত আমরা 'আহ্লে-ইল্ম' আলেমগণ ও রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকগণ আমলে না নেব, ধর্মীয় অঙ্গনে যেমন নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মান্যতা-গণ্যতা ফিরে আসবে না; রাষ্ট্রেও সঠিক ও সুন্দর নিয়মানুবর্তিতা ও চেইন অব কমান্ড ফিরে আসবে না। কেননা, জনগণের ধর্মীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রভাবই রাষ্ট্র ও সরকারের উপর পড়ে থাকে।

(ছয়)

৫.৮. গবেষণা সমৃদ্ধ ফাতওয়ায় নতুনত্ব থাকা চাই : এক একটি **'ফাতওয়া'** মানেই এক-একটি নতুন গবেষণা। যে-কারণে গবেষণা'র নীতিমালার নির্দেশনা মোতাবেক ধীরে-স্থিরে প্রয়োজন মোতাবেক সপ্তাহ/ দশ দিন/ পনের দিন সময় ব্যয়ে এক-একটি গবেষণা বা ফাতওয়া প্রস্তুত করা হয় বা করতে হয়। সুতরাং তাতে নতুনত্ব থাকাই স্বাভাবিক।

(সাত)

৫.৯.'পাছে লোকে কিছু বলে' - এমন ধরনের ভীতি ও মনোভাব একজন যোগ্য মুফতির বা গবেষকের অযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট হতে পারে : একজন গবেষক পর্যায়ের মুফতী যেখানে হুট করে বা তড়িঘড়ি না করে বরং প্রয়োজনীয় সময় ব্যয়ে যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে একটা ফাতওয়া বা সমাধান বা তেমন কোনো গবেষণা প্রস্তুত করবেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা প্রশ্নে প্রত্যয়ী হওয়া যেমন জরুরী তেমনি কে কি বললো বা কার পক্ষে-বিপক্ষে গেল –এমন সংশয় বা দূর্বলতায় ভোগা যাবে না। তার কারণ, এমন **'গায়রুল্লাহ্'**র প্রতি যার নজর থাকবে, মহান আল্লাহ্ সহীহ নির্দেশনা কী হবে? বা হতে পারে? তা ওই গবেষক বা মুফতির মাথায় বা মন-মননে ইলকা করবেন না (ঢেলে দেবেন না)। যে কারণে গবেষণাকর্ম বা ফাতওয়াটি হবে অপরিপূর্ণ, অগোছালো বা অনেকক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক।

---

৫. প্রিয় পাঠক! আপনি যদি প্রবন্ধকার মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ রচিত **'ফাতাওয়া ও গবেষণা সমগ্র'** সিরিয়ালের গ্রন্থগুলো পাঠ করেন, এর অনেকক্ষেত্রে বিশেষত বীমা-ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সিদ্ধান্তগুলো মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে, অবশ্যই লেখকের এমন দাবীর বাস্তবতা হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাবেন এবং আপনার নিরপেক্ষ মন-মনন ইনশাআল্লাহ্ লেখকের কথার সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হবে।

(আট)

৫.১০.গবেষণামূলক ফাতওয়ার চাহিদা অধিক : উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আপনি একজন আলেমকে প্রশ্ন করলেন, "এ কাজটি করা কি জায়েয"? অথবা জিজ্ঞাসা করলেন, "অমুক ব্যবসায় বা লেনদেন কি হালাল"? এর জবাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, জায়েয"। অথবা তিনি উত্তর দিলেন, "না, এমন ব্যবসা হালাল নয়"।

একজন উত্তরদাতা আলেমের এভাবে জবাব দেয়াতে মাস্আলা বা আইন বলা হয়ে গেছে। মূল আইনে বা আইন বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এভাবেই মাস্আলা বা আইন লেখা থাকে। আপনি মানেন বা না মানেন, পালন করেন বা না করেন -সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মান্য করলে বা পালন করলে উভয় জগতে লাভবান হতে পারেন এবং অমান্য করলে উভয় জগতে জেল-জরিমানা ও জাহান্নামের শাস্তির মুখোমুখি হতে পারেন।

এখানে কেন জায়েয? বা কেন জায়েয নয়? কিংবা অমুকে তো জায়েয বলেন, আপনি না জায়েয বলছেন কেন? অথবা এই ব্যবসায় বা তার মোনাফা তো অমুকে হালাল বা বৈধ বলছেন, আপনি হারাম বা অবৈধ বলছেন কেন? কি ও কেনসহ জবাব বা সমাধান যেখানে বা যার মধ্যে থাকে, তারই নাম **'গবেষণা'**এবং তারই নাম**'ফাতওয়া'**।

এবার বলুন তো আধুনিক যুগের মানুষ, মুসলমান ও মুসুল্লীগণ **'হ্যাঁ'** বা **'না'** এর সংক্ষেপ জবাব তথা **'মাসআলা'** জানতে অধিক আগ্রহী, না কি গবেষণা সম্বলিত **'ফাতওয়া'** জানতে অধিক আগ্রহী? এক কথায় তার জবাব হল : "মানুষ মুখে **'ফাতওয়া'** বিষয়ে যা-ই বলুক বা মন্তব্য করুক; কিংবা ফাতওয়া বিষয়ে আসলে তাদের ধারণাই অস্পষ্ট হোক বা স্পষ্ট হোক– তারপরও বাস্তবে তারা ফাতওয়া জানতেই অধিক আগ্রহী। তার বহুবিধ কারণের অন্যতম বাস্তব কারণ নিম্নরূপ:

১. আধুনিক যুগের মানুষ অনেক সজাগ ও সচেতন। এটি বিজ্ঞানের যুগ। মানুষ বুঝতে চায়, শুধু জানতে চায় না বরং কি ও কেন সহ জানতে চায়, ব্যাখ্যাসহ জানতে চায়, লাভ-ক্ষতিসহ জানতে চায়।

২. আরেকটি কারণ হল, ওয়ায-নসীহত বা প্রচার মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন সূত্রে মানুষ একটা সুনির্দিষ্ট আমল বা ধর্মীয় জিজ্ঞাসা বা সংশয় বা বিষয়ভিত্তিক কাজে এক-একজনের কাছ থেকে একেক রকম বলা, বক্তব্যদান, উপস্থাপন দেখে-শুনে একদিকে যেমন আগ্রহী হয়ে উঠছে অপরদিকে সংশয়-সন্দিহান হয়ে, বিষয়টি প্রশ্নে পরিতৃপ্ত হওয়ার মত এবং **শেষ কথা** বা **শেষ সিদ্ধান্ত** কী? তেমন জবাব খুঁজছে অর্থাৎ ফাতওয়া জানতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। কেবল 'হ্যাঁ' ও 'না' এর সংক্ষেপ জবাবে পরিতৃপ্ত হতে পারছে না।

সুতরাং বোঝা গেল বাস্তবতার নিরীখে মানুষ **'ফাতওয়া'** জানতে বা ফাতওয়া পেতে অধিক আগ্রহী; কেবল মাস্আলা নয়। আর ফাতওয়া মানেই যেহেতু গবেষণা তাই একজন মুফতীকে অবশ্যই গবেষণা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন মুফতী হওয়া উচিত –যেমনটি **'উসূলে ইফতা'**র

গ্রন্থাদিতেও বলা হয়েছে।[৬] প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যার থাকবে না, তাঁর নিজেকে একজন মুফতী হিসাবে উপস্থাপন বা পরিচয় পেশ করতে যাওয়া সমীচিন হতে পারে না।

(নয়)

৫.১১.'ফকীহ' ও 'মুফতী' এর মধ্যে পার্থক্য : এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি প্রশ্ন উঠে, তা হল : 'ফকীহ' ও 'মুফতী' এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? তার জবাবে বলা যায়, 'ফিকহ' ও 'ফাতওয়া' এর মধ্যে যে-পার্থক্য বিদ্যমান সেই একই পার্থক্য 'ফকীহ' ও 'মুফতী'র মধ্যেও বিদ্যমান। এখন আপনি হয়তো পুন: প্রশ্ন করবেন, সেই পার্থক্যটি কী তাতো বুঝে আসলো না?

তার জবাবে বলা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ের ফিকহ তথা 'মাসআলা' এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ফিকহ তথা 'ফাতওয়া' এর মাঝে যে পার্থক্য-স্তর বিদ্যমান একজন ফকীহ ও মুফতীর মাঝেও একই পার্থক্য-স্তর বিদ্যমান। অর্থাৎ সব মাসআলা ফাতওয়া হয় না কিন্তু কোন ফাতওয়াই মাসআলা'র বাইরে হয় না। একইভাবে 'ফকীহ' মানেই 'মুফতী' নন; অবশ্য কোনো কোনো ফকীহ মুফতীও হয়ে থাকেন।

আরেকটু স্পষ্ট করে বলা যায় যেমন : একজন শিক্ষার্থীর ফিকহ বিষয়টির মাসায়েল সার্বিকভাবে শেখা হয়ে গেলে এবং ফিকহর (**قَوَاعِدُ الْفِقْه**) 'কাওয়াইদ' (নীতি-মূলনীতি) শেখা হয়ে গেলে তাঁকে একজন ফকীহ বলা হবে, কিন্তু মুফতী বলা হবে না। তবে তিনি যদি (**أُصُولُ الْإِفْتَاء**) 'উসূলে ইফতা'সমূহ (ফাতওয়া বিষয়ক মূলনীতি / নীতিমালা) ও (**أَدَابُ الْإِفْتَاءِ وَالْمُفْتِي**) 'আদাবুল-মুফতী' (ফাতওয়া লেখার বা ফাতওয়াদানের নিয়ম-পদ্ধতিসমূহ) এবং হাতে-কলমে শেখা ও অনুশীলন করতে গিয়ে চিকিৎসকগণ যেভাবে ইন্টার্ণ বা প্রাকটিক্যাল করে থাকেন; সেভাবে যখন ওই ফকীহ এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ উস্তাদের কাছে হাতে-কলমে ফাতওয়া লিখনের অনুশীলনও করে নেবেন। কেবল তখনই তাঁকে একজন মুফতী বলা হবে।[৭]

---

৬ . গ্র্যান্ড মুফতী অধ্যক্ষ ড. ইয়াহ্ইয়া আল-বাতূশ (জর্দান), **মুফতী ফাতওয়াপ্রার্থী ও ফাতওয়ার বিধানাবলি:** পৃ. ২৪, অনুবাদ: মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ্, অনুবাদ বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সংস্করণ-নভেম্বর- ২০১৭খ্রি. ২. মুফতী আমীমুল ইহসান র., **কাওয়াইদুল ফিকহি** : পৃ. ৪৯৮, আশরাফী বুক ডিপো, ইউ. পি. ভারত, তা. বি. ইত্যাদি।

৭. কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, এমন শ্রেণিবিন্যাস ও পার্থক্যকরণ তো কোথাও নযরে পড়েনি? তার জবাব হচ্ছে, যা কিছু বাস্তব তা নাম উল্লেখ করে কেউ বলুক বা না বলুক এবং কেউ তা হাতে ইশারা করে দেখিয়ে দিক বা না দিক; নযরে পড়ুক বা না পড়ুক অথবা কোনো কিতাবে থাকুক বা না থাকুক –সেটাই বাস্তব ও এটাই সত্যি। যেমন মানতিক শাস্ত্রের পারিভাষিক **'বেদেহী'** ও **'নযরী'** বিষয়াদি; সূর্য উদিত হলে বাস্তবে সেটিকে দিন বলা হয় এবং ২ ও ২ যোগ করলে ফল ৪ (চার) হয় –এ সবকি কাউকে দলীল-প্রমাণ দিয়ে অথবা কোন্ কিতাবে আছে তার প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হয়?

এবার আশা করি পার্থক্যটি বুঝতে কারও কষ্ট হবে না। আমার এ অনুসন্ধানের প্রতিটি কথার বাস্তব প্রমাণ আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী (র.) এর রাদ্দুল-মুহতারের ভূমিকা অংশ তথা 'রসমুল-মুফতী' ও অপরাপর সব 'উসূলে-ইফতা' গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান।

'ইলমে দীন' ও 'ইলমে শরীয়ত' এর মধ্যকার পার্থক্য :

'ইলমে দীন' বলতে যেমনটি বলা হয় যে,

علم دین فقه است وتفسیر و حدیث

هر که خواند غیر از این سه گردد خبیث

"দীনী ইলম বলতে বোঝায় ফিকহ, তাফসীর ও হাদীছ

যে এ তিনটি বাদ দিয়ে পাঠ গ্রহণ করবে, হবে সে খবীছ"।

এখানে যে ফিকহ, হাদীছ ও তাফসীরকে 'ইলমে দীন' বলা হয়েছে, তার মানে মৌলিক বিবেচনায় ও গণনায় 'দীনী ইলম' তিনটি বিদ্যা হলেও মূলত হাদীস ও তাফসীর –এ দু'টি হল মৌলিক। তৃতীয়টি অর্থাৎ 'ইলমে ফিকহ'র উৎস ও দলীল হিসাবে ওই দু'টি মৌলিক বিদ্যা এবং 'ইলমে ফিকহ্' বলতে 'ইলমে শরীয়ত' কে বুঝায় –যা মুসলিম উম্মাহ্র দৈনন্দিন জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যবহারিক ও হাতে-কলমে শেখা ও আমলের বিদ্যা। সে কারণে 'ইলমে হাদীস' ও 'ইলমে তাফসীর'এ দু'টি 'ইলমে শরীয়ত' এর মৌলিক উপাদান, দলীল-আদিল্লাহ ও উৎস।

একই ভাবে ইলমে শরীয়তের আরো দু'টি উৎস রয়েছে, যাকে 'ইজমা' ও 'কিয়াস' বলা হয়; আবার 'কিয়াসে জলী', 'কিয়াসে খফী' বা 'ইস্তেহসান' ও 'ইজতিহাদ' –এসব কিয়াসেরই অন্তর্গত। বাকী, সর্ব সাধারণ ও আলেম-উলামা সকলের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিদ্যা হল 'ইলমে শরীয়ত' তথা 'ফিকহ্ বিদ্যা'; প্রতিটি মুসলমানকেই দৈনন্দিন জীবনে যার মুখোমুখি হতে হয়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক জরুরী, লক্ষ্যণীয় ও বোঝার বিষয় হল, 'ইলমে শরীয়ত' একদিক থেকে ফিকহবিদ্যা– সে কারণে কেউ যদি হাদীস বিষয়ে ভালো ও উচ্চতর জ্ঞান রাখেন তাঁকে একজন 'হাদীস বিশেষজ্ঞ' বা 'হাদীস বিশারদ' বলা হবে, কিন্তু 'শরীয়ত বিশেষজ্ঞ' বলা যাবে না। একইভাবে কেউ যদি 'তাফসীর' বিষয়ে ভালো ও উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন তাঁকে একজন 'তাফসীরবিদ' বা তাফসীর বিশেষজ্ঞ' বলা হবে, আমার মতে তাঁকে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ বলা যাবে না। কেননা, হাদীস (সুন্নাহ্) ও তাফসীর (কুরআন) বিদ্যা দু'টি অন্যতম পৃথক পৃথক দু'টি 'দীনী ইলম' ও বিদ্যা বটে এবং 'ইলমে শরীয়ত'(আহকাম বিদ্যা) তথা 'ফিকহ বিদ্যা'র দলীল, উৎসও বটে; কিন্তু এ দু'টি বিষয়কে শুধুমাত্র 'ইলমে শরীয়ত' হিসেবে পরিগণিত করা কতটা যুক্তিযুক্ত। তার কারণ, 'শরীয়ত বিশেষজ্ঞ' তথা 'বিধান বিশেষজ্ঞ' হিসাবে পরিগণিত হওয়ার জন্য 'হাদীস ও তাফসীর' এর গভীর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আরো অতিরিক্ত বিদ্যা হিসাবে 'ফিকহ-ফাতওয়া' তথা 'আহকাম' বিষয়ে উচ্চতর (বিধি-বিধান ও শরীয়া আইন)

জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হওয়া জরুরী। অর্থাৎ একই বিষয়ে অনার্স, তাখাস্সুস, এমফিল ও পি. এইচ. ডি ইত্যাদি ডিগ্রী অর্জন করা। শুধু হাদীস বিশারদ ও তাফসীর বিশারদ হলেই কোন ইসলামী স্কলার পুরোপুরি 'শরীয়ত বিশেষজ্ঞ' হয়ে যান না; 'শরীয়ত বিশেষজ্ঞ' খেতাব অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিধি বিধানবিশেষজ্ঞ হওয়া। তবে হ্যাঁ, তিনি যদি হাদীস-তাফসীরের পাশাপাশি 'ফিকহ-ফাতওয়া' বিষয়েও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্তব্য কোন উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে বিধান-বিশেষজ্ঞ বা শরীয়তবিশেষজ্ঞ হিসাবেও গণ্য করা যাবে। প্রাথমিক স্তরের ফিকহ্সহ শুধু 'দাওরা' অথবা ফিকহ্ সাবজেক্টসহ 'কামিল' পাশ করেই কিংবা শুধু 'হাদীস' বা 'তাফসীরবিদ' হয়েই কোন আলেম 'শরীয়তবিশেষজ্ঞ' তথা 'বিধানবিশেষজ্ঞ' হতে পারে না।

সুহৃদ পাঠক! উক্ত পার্থক্য যতদিন পর্যন্ত আমরা আমলে না নেবো ততদিন পর্যন্ত শৃঙ্খলাবোধ ও চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হবে না; একইভাবে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, দলাদলি, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদিও দূর হবে না। তার কারণ, বিধি মোতাবেক শরীয়তবিশেষজ্ঞ তথা বিধানবিশেষজ্ঞ না হয়েও, মাস্আলা বলতে শুরু করে, সবাই ফাতওয়া প্রদান করতে শুরু করে, সবাই 'ফাতওয়া কমিটি' বা 'শরীয়া কমিটি' বা 'হালাল-হারাম কমিটি' বা 'শরীয়া বোর্ড' এর সদস্য হওয়ার জন্য এবং তদবীর ও সুপারিশের দ্বারস্থ হয়; সেখানে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থায়ী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আশা করতে পারে না। কেননা, সারা বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিম কোন দেশেই এমন নযীর নেই যে, কেউ 'ল' বা আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হয়েই আইনের প্রাকটিস করছেন বা 'ল-কমিশন' বা 'আইন কমিশন' এর সদস্য বা 'ল-ইয়ার এ্যাসোসিয়েট' এর দলে বা প্যানেলে গণ্য হয়েছেন!

(দশ)

৫.১২. গবেষণা ও উপস্থাপন প্রসঙ্গ : আমাদের উপরের আলোচনা থেকে আরও বোঝা গেল, ফাতওয়া ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যই 'গবেষণা' থাকা উচিত। এই গবেষণা যে ভাষায় করা হবে, সেই ভাষায় গবেষণার আলোচ্য বিষয়টিকে কী বলা হয়? রসায়ন? জীববিজ্ঞান? পদার্থ বিজ্ঞান? আইন বিজ্ঞান? আইন গবেষণার মূলনীতি বিজ্ঞান? এসব আগে ঠিক করে নিতে হবে। তা যদি আইন বিজ্ঞান হয়, সেক্ষেত্রে আমার আরবী ভাষায় রচিত আইন বিজ্ঞানের তথা ফিকহ-ফাতাওয়ার সবগুলো শব্দের অর্থ, পরিভাষার অর্থ, আইন-আদালত ও বিচার বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত আইনগত বিষয়াদি, নৈতিকতা কেন্দ্রিক বিষয়াদি, ইত্যাদির সার্বিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নতুবা আমি তো তেমন কোনো বই-কিতাব অনুবাদে এবং গবেষণা কর্মেও কিছু বাংলা কিছু উরদু-ফার্সী ও কিছু আরবী শব্দ-বাক্যে উপস্থাপন করবো, যা আমার শ্রোতা ও পাঠকদের জন্য বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যে কারণে আমার মূল বিষয়টির জ্ঞান, তা যে ভাষায় রয়েছে সেই ভাষার ভালো জ্ঞান এবং আমি যে ভাষায় অনুবাদ বা স্থানান্তর করতে চাচ্ছি সেই ভাষা তথা বাংলা ভাষায় আইনের কোন্ ধরনের বিষয়গুলোকে কোন্ কোন্ শব্দে বা সংজ্ঞায় বা পরিভাষার আওতায় উল্লেখ করা হয় বা করা যায় –সেই জ্ঞানও তো অবশ্যই থাকা আবশ্যক।

এ জ্ঞান কখন অর্জিত হবে? যখন আরবী-উরদু ভাষায় পঠিত ফিকহ-ফাতাওয়ার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রচিত বা লিখিত আইনের গ্রন্থাদিরও সাহায্য নেয়া হবে।

(এগার)

৫.১৩.'কাযাআন' ও 'দিয়ানাতান' প্রসঙ্গ : আমাদের আরবী ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে তালাক ইত্যাদি বিষয়ে দু'টি শব্দ-

(قَضَاءً وَ دِيَانَةً / أيْ فِيْمَا بَيْنَه وَ بَيْنَ الله) 'কাযাআন' ও 'দিয়ানাতান' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দ দু'টির বাস্তব পার্থক্য-জ্ঞান কুদূরী, শরহে বেকায়া, হিদায়া ইত্যাদি পাঠে এমনকি ৩ × ২ = ৬ বছর অর্থাৎ তিন দফা মুফতী ডিগ্রী অর্জন করেও আমার অর্জিত হয় নাই। মোটামুটি কিছুটা বা একটা 'মাফহুম' তথা ভাবার্থ যাও বা যতটুকু বুঝে এসেছে তা হচ্ছে, "বাস্তবে তার তালাক হবে না; অর্থাৎ তার প্রদত্ত তালাক তার বিবির ওপর পড়বে না; অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হিসাবে তালাক হয়ে যাবে; বান্দার হিসাবে হবে না"।

প্রিয় পাঠক! হাস্য-রসের বিষয় নয়, বোঝার বিষয়। উক্ত বিষয়টি স্পষ্ট ও সংশয়হীনভাবে বুঝে না আসায় বিশেষত আমাদের মাতৃভাষায় রচিত আইন বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এমন একটি বিষয়কে কীভাবে? কোন্ শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করলে সহজবোধগম্য হতে পারে এবং আমিও বুঝতে পারি এবং জনগণকে বা ছাত্রদেরকে বা পাঠকদেরকেও সহজে বোঝানো যায়, তা আমার প্রবন্ধকার মনোজগতে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

আমার মনে বার বার এমনসব প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, "একজন স্বামী তালাক দিল অথচ সেই তালাক বাস্তবে পতিত হচ্ছে না বা কার্যকর হচ্ছে না! আবার বলা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র হিসাবে বা পরকালের বিবেচনায় তালাক হয়ে গেছে! তবে ফাতওয়াদানের বেলায় তেমন ফাতওয়া দেয়া যাচ্ছে না! এবং বিচার-ফায়সালার নিরীখে তালাক হচ্ছে না, আবার আল্লাহ্‌র হিসাব মতে হয়ে যাচ্ছে! এসব কেমন কথা? তা হলে কী আল্লাহ্‌র আইন ও আদালতের আইন ভিন্ন ভিন্ন? না তো ভিন্ন নয়! বরং একই শরীয়া আইনেই তেমনটি বলা হচ্ছে, ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে! ...ইত্যাদি।

এ প্রেক্ষাপটে প্রখ্যাত আইনজীবি গাজী শামছুর রহমান সাহেবের 'রায় লেখার কৌশল' বইটিসহ আইন বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই অধ্যয়ন করি। এক পর্যায়ে তাঁর লেখা 'মুসলিম পারিবারিক আইন' ও 'মুসলিম পারিবারিক আইনের ভাষ্য' –এগুলোর কোনো একটির ভূমিকা পাঠ করতে গিয়ে একস্থানে পেয়ে গেলাম, "আইন ও নৈতিকতা এক বস্তু নহে –আইন প্রয়োগধর্মী বা প্রয়োগযোগ্য; কিন্তু নৈতিকতা ও নৈতিক বিষয়গুলো বিবেকধর্মী বা বিবেককেন্দ্রিক হয়ে থাকে"।[৮]

৮.গাজী শামছুর রহমান, মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য, ভূমিকা অংশ- পৃ. ৪, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, সংস্করণ/মুদ্রণ-২০০৬খ্রি.।

তখনই সেই 'কাযাআন' ও 'দিয়ানাতান' এর সংশয় ও ব্যাখ্যা মনে জাগলো! আরে এই বিষয়টাই তো যুগ যুগ ধরে আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল! অর্থাৎ নৈতিক বিবেচনা এক বিষয় এবং আইনগত বিবেচনা পৃথক বিষয়। আইনগত বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি পালন না করলে ইহজগতে ও পরজগতে উভয়স্থানেই পাকড়াও বা সাজা-শাস্তি হতে পারে; তবে নৈতিকতার বিষয়াদি বলতে ইহজগতে আইনে যার পাকড়াও হবে না বটে; কিন্তু পরকালে তা ধর্তব্য হবে এবং তার কারণে পুরস্কার-তিরষ্কার রয়েছে; মর্যাদার উচ্চাসন তার প্রেক্ষিতেও বরাদ্দ হবে অবশ্যই।

এ থেকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, বিধিবদ্ধ নেক আমল বা কর্মকান্ডের মাঝে যে বিষয়গুলো ফরয-ওয়াজিব নয় বা এমন পর্যায়ের নিষিদ্ধ বা হারাম কাজ নয় সেসব কাজ-করণীয় নৈতিকতার (دِيَانَةً) মধ্যে পরিগণিত, যেমন নফল-সুন্নাত, মুস্তাহাব-মানদূব ইত্যাদি। আবার ফরয-ওয়াজিব স্তরের বা হারাম-অবৈধ পর্যায়ের কাজগুলো যেহেতু অত্যাবশ্যকীয়, তাই এসবে ত্রুটি বা অমান্য করলে জাগতিক জীবনের আইন-বিধানেও (قَضَاءً) অপরাধী বা পাপী সাব্যস্ত করা হবে এবং পরকালেও কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

সুতরাং এ কথা বলাই যায় যে, আমাদের নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞানকে নিজ নিজ দেশে প্রচলিত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা জরুরি। নিজের মত করে, নিজে নিজে **'বড়হুযূর'** বা **'বড় মুফতী সাহেব'** হয়ে বসে থাকা সমীচিন নয়।

(বার)

৫.১৪.প্রাসঙ্গিকতার আরও স্পষ্টকরণ : বিবাহ-তালাক বিষয়গুলো শরীয়া আইনের লেনদেন, চুক্তি ও দ্বি-পাক্ষিক বিষয়াদির অন্তর্গত; কেবল **'ইবাদত'** বলতে যা বোঝায়, তেমন ব্যক্তিগত বা এক-পাক্ষিক কাজ বা আমলশ্রেণির অন্তর্গত নয়। যে-কারণে এসব দ্বি-পাক্ষিক লেনদেন ক্ষেত্রে কোনো ফায়সালা বা ফাতওয়া শুধু এক পক্ষের কথা/ভাষ্য/ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে হয় না। বরং দু'পক্ষের সব কথা/ বক্তব্য/ সাক্ষ্য শুনে, তারপর এতদসংক্রান্ত বহুমুখী আইন-বিধানে গবেষণান্তে সমন্বয় সাধন পূর্বক একটা ফাতওয়া বা ফায়সালা প্রদান করতে হয়। অন্যথায় সঙ্গত বাস্তবিক কারণে তেমন কোনো বিড়ম্বনার জন্ম হবে– যেমনটি **'তালাক'** সংক্রান্ত ফাতওয়া বিষয়ে অহরহ আমাদের সামনে আসছে। অর্থাৎ কেবল তালাক হলেই হয় না বরং তিনটি হওয়া জরুরি; আবার তিনটি হলেও হবে না বরং তা তালাকদাতা স্বামীর স্বীকার করা বাধ্যতামূলক; কিংবা বিধি মোতাবেক সাক্ষী থাকা প্রয়োজন; অথবা আইনগত বিবেচনায় তেমন তালাক বা সাক্ষ্য ধর্তব্য বা গণ্য হওয়া জরুরি। আবার সাক্ষী থাকলেই হবে না, সাক্ষীর সাক্ষ্য বিধি মোতাবেক গ্রহণযোগ্য হবার মত হওয়া উচিত; কিংবা

সাক্ষীর সরাসরি স্পটে উপস্থিত থাকা ও নিজকানে শোনা হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করা আবশ্যক, শোনা সাক্ষ্য এসব ক্ষেত্রে আইনত যথেষ্ট কি না? তা-ও বিবেচনায় থাকা দরকার- ইত্যাদি।[৯]

সুতরাং ইসলামী শরীয়তের ফরয-ওয়াজিব ও সরাসরি হালাল-হারাম স্তরের আমল বা বিধি-বিধানের বাইরের সুন্নাত-নফল-মুস্তাহাব বিষয়গুলো যেমন নৈতিকতা পর্যায়ের বিষয় হয়ে থাকে– একইভাবে শরীয়তসম্মত কোনো বাধ্যতামূলক বিধি-বিধানও যেক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রমাণিত হয় না, বা প্রমাণ করা যায় না, বা প্রয়োগ-প্রযোজ্য করা যায় না; সেক্ষেত্রে তা-ও মৌলিক বিবেচনায় আইনানুগ বিষয় হলেও কার্যত নৈতিকতার কাতারে চলে যায়।[১০]

(তের)

৫.১৫.তালগোল পাকানোর ক্ষেত্র : এখানে একজন সাধারণ পাঠকই নয় বরং আলেম-ওলামা সকলেই একটা ধাঁ ধাঁ পরিস্থিতির মধ্যে আটকে পড়ে থাকেন। আর তা হচ্ছে, উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, আমাদের প্রচলিত আইনে যেমন একজন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে করণীয় ও বর্জনীয় সর্বক্ষেত্রে আইনগত বিবেচনার বিষয়াদি যেমন থাকে, নৈতিকতাকেন্দ্রিক বিবেচনারও অনেক বিষয় থাকে; যেমন কিনা শরীয়া আইনেও থাকে 'কাযাআন' ও 'দিয়ানাতান'। কিন্তু আমাদের শরীয়া আইনের বিষয়াদির ক্ষেত্রে একটা ধারণা যা পেলাম যে, ফরয-ওয়াজিব বা হালাল-হারামের অনুরূপ জরুরী বিষয়গুলো 'কাযাআন' এর অন্তর্গত এবং বাকী নফল-সুন্নাত ও মাকরূহ বিষয়গুলো অনেকটা 'দিয়ানাতান' এর অন্তর্ভুক্ত। তা হলে এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আমাদের শরীয়া আইনের ফরয-ওয়াজিব পর্যায়ের বা এ স্তরের আমল, ইবাদত বা কাজগুলো কী প্রচলিত আইনেও 'কাযাআন' এর মধ্যে গণ্য? তার জবাব হচ্ছে, না। যে কারণে আমরা নামায-রোযা ইত্যাদি ফরয যত কিছু পালন করি, তা আমাদের শরীয়া আইনে 'কাযাআন' (আইনানুগ) এর মধ্যে গণ্য হলেও প্রচলিত আইনে এসব

---

৯. শরী'আ বিধি মোতাবেক সাক্ষ্য ও সাক্ষী সংক্রান্ত মূল আইন হচ্ছে, যিনি কোনো বিষয়ে বা ঘটনায় সাক্ষী দিতে যাবেন, তাঁর বিষয় বা ঘটনার স্পটে উপস্থিত থাকা চাই এবং ঘটনা বা বিষয়-ব্যাপারটি নিজ কানে শুনেছেন বা দেখেছেন –এমন হওয়া চাই; অন্যের দেখার উপর ভিত্তি করে কিংবা স্ত্রীর কথায় বা তার শোনার বা অন্যের শোনার কথা শুনে সাক্ষ্য দিলে, সেই সাক্ষ্য সাধারণত গৃহীত হয় না। বিশেষত যেক্ষেত্রে তা বাদী বা বিবাদীর স্বার্থের পরিপন্থী হয় বা তারা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে হ্যাঁ, বিষয়টি যদি কারও ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার ব্যাপার না হয়ে, সামাজিক বা ধর্মীয় বিষয় বা স্বার্থের ব্যাপার হয় যেমন মসজিদ-মাদরাসা-ঈদগাহ, ওয়াকফ সম্পদ ইত্যাদির স্থিতাবস্থা বা দখল প্রশ্নে সমস্যা দেখা দেয়; অথবা ৫০ বছর ১০০ বছরের পুরোনো সেসব দাতাগোষ্ঠির কেউ জীবিত না থাকে এবং যে কোনো কারণেই হোক, তাঁরা প্রচলিত নিয়মে এসব রেজেস্ট্রি করে যাননি বা সেটিকে জরুরী জ্ঞান করেননি;অথবা তখনকার কোনো সাক্ষী জীবিত নেই বা দলীলপত্র/ রেকর্ডপত্র ইত্যাদি হারিয়ে গেছে বা শত্রুপক্ষ তা গায়েব করে ফেলেছে –এমন সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে 'শ্রুত সাক্ষ্য'ও গৃহীত হয়ে থাকে। ফাতাওয়া আলমগীরী, শামী, বাহরুর রায়িক ইত্যাদির 'ওয়াকফ অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

১০. হিদায়া, শামী, আলমগীরী ইত্যাদির (قضاء) ও (ديانة) এর ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে। আরও দেখা যেতে পারে 'ফাতাওয়া ও গবেষণা সমগ্র-১, এর ভূমিকা অংশ, মাকতাবাতুল হাদীস, সংস্করণ : সেপ্টেম্বর- ২০২১খ্রি., কামরাঙ্গিচর, ঢাকা।

'আইনগতভাবে বিবেচনা'র বিষয় নয় বা বিবেচনায় নেয়া হয় না; তার কারণ এসব আইনে অবশ্য করণীয় হিসাবে পাশ করা নয় বা অনুমোদিত নয়। যে কারণে এসব ভালো কিছুকে, ধর্মের শেখানো আদব-আখলাক, উন্নত চরিত্র ইত্যাদি- যার দ্বারা মানুষ নম্র-ভদ্র, বিনয়ী, অন্যের উপকারকারী হয়ে থাকে– এর সবকিছুকে 'এক কথায়' বা 'এক বাক্যে' 'নৈতিকতা' বা 'নৈতিক শিক্ষা' বলে আলোচনা বা উল্লেখ করে থাকে। নির্দিষ্টভাবে 'ধর্মীয় শিক্ষা' বা 'ইসলামী শিক্ষা'ও বলা হয় না বা অনেকে বলতে চান না, কারণ ধর্ম তো একটি বা কেবল 'ইসলাম'ই (তাঁদের বিবেচনায়) নয়।

তবে হ্যাঁ, ধর্মের শুধু যে কয়টি বিষয় আইন দ্বারা পরিচালিত হয় বা প্রচলিত আইনে পাশ বা অনুমোদিত হয়ে আসছে, সে কয়টি বিষয় তথা 'মুসলিম পারিবারিক আইন' যেমন বিবাহ-তালাক, সম্পত্তি বন্টন আইন, ১৯৬১ সালের এতিম নাতি বা নাতনির সংশোধনী, উইল-ওসিয়ত, ওয়াকফ –এ বিষয়গুলো যেহেতু সরকারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; সে কারণে এগুলো শরীয়া আইনে যেমন 'কাযাআন' এর মধ্যে গণ্য; একইভাবে প্রচলিত আইনেও 'কাযাআন' (আইনগত) এর মধ্যে গণ্য; যদিও আইনগুলোর ব্যাখ্যায় কিছু হেরফের আছে।

অবশিষ্ট ধর্মীয় সব কাজ-আমল বা আদেশ-নিষেধ, ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি ধর্ম ও শরীয়তের হিসাবে 'কাযাআন' হলেও তা 'দিয়ানাতান' এর মধ্যেই পরিগণিত অর্থাৎ নৈতিকতা বা নৈতিক শিক্ষা। যে কারণে আমাদের নীতি নির্ধারকগণ বা উচ্চ পর্যায়ে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এমনটি বলতে লজ্জা বোধ করে থাকেন যে, 'আপনারা বা জনগণ যেন ধর্মকর্ম পালন বা ইসলাম পালন করে বা করুন'! বরং তাঁরা এভাবে ব্যক্ত করে থাকেন যে, 'নৈতিক শিক্ষা ভালো, নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন করা উচিত', ইত্যাদি।

(চৌদ্দ)

৫.১৬.ধর্মে 'দিয়ানাতান' প্রচলিত আইনে 'কাযাআন' : অনেকে বলে থাকে যে, 'ইসলামী শরীয়ত এতিম নাতি বা নাতিনকে বঞ্চিত করেছে, যে কারণে আইযূব খান সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন পাশ করে এদের হিস্যা নিশ্চিত করা হয়েছে'। শরীয়া আইন এক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্তিকে 'কাযাআন' (আইনানুগভাবে) অন্তর্ভুক্ত করেনি বটে কিন্তু 'দিয়ানাতান' (নৈতিকভাবে) দিতে বলা হয়েছে।[১১]

(পনের)

৫.১৭.'কেবল নকল-নির্ভর ফাতওয়া নয়' প্রসঙ্গ : গবেষণার ক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে, ফাতওয়া দু'প্রকার হয়ে থাকে: (ক). নকল-নির্ভর ফাতওয়া ও (খ). গবেষণা-নির্ভর ফাতওয়া। প্রাচীন ও পূর্ব থেকে বিধিবদ্ধ সাধারণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে নকল-নির্ভর ফাতওয়া দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হলেও, আধুনিক ও উদ্ভূত নতুন কোনো বিষয়ে কেবল নকল-নির্ভর ফাতওয়া দ্বারা

১১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, জাওয়াহিরুল ফিকহ: খ-২, পৃ. ৫২-৫৩ ও ৪৮১-৪৯১পৃ., নবম সংস্করণ: শা'বান-১৪০৭ হি.-ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কাঙ্খিত প্রয়োজন পূরণ হয় না। তার জন্যে (مَنْقُوْلَاتْ) নকল এর পাশাপাশি গবেষণা'র উসূল সামনে রেখে কিছু গবেষণা কর্মেরও সংযোজন প্রয়োজন হয়। এমন নতুন কোনো বিষয়ে, যেহেতু বিষয়টি উদ্ভূত ও নতুনভাবে দেশে দেশে যোগ হয়েছে, তাই এর সমাধান বা জবাব পেশ করতে গিয়ে মক্কা-মদীনার বা জামে' আযহার বা উপমহাদেশের ফাতওয়াবিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত ফাতওয়ায় তথা উম্মতকে সহীহ সমাধান পেশ করতে গিয়ে সকলের ফাতওয়া-সমাধান এক হবে না; বা কম-বেশী ও ভুল-শুদ্ধ হতেই পারে। এমনকি কারও ফাতওয়া ইতিবাচক এবং অন্য কারও ফাতওয়া নেতিবাচকও হতেই পারে –এটাই স্বাভাবিক; কেননা বিষয়টি নতুনভাবে সামনে এসেছে।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায় তখন যখন এমন বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরীখে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক জন-জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, তা সকলেই ব্যবহার করে বা করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। যেমন আধুনিক আবিষ্কৃত মোবাইল ফোন, মাইক্রোফোন, লাউড-স্পিকার, রেডিও, আধুনিক যুদ্ধ-সরঞ্জাম, ক্ষেত্রবিশেষে ভিডিও, সিসিটিভি ইত্যাদি এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর প্রভাবে যোগ হওয়া বা আসন্ন টেস্টটিউব বেবি, মানব ভ্রূণ বা ক্লোনিং ইত্যাদি ইস্যু।

এগুলো বা এর কোনোটি যখন ব্যাপক জন-গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বা আইন-আদালত পর্যায়ে তার ব্যবহার 'জরুরী' হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে সেটি বিবেচনায় রাখা একান্ত অপরিহার্য। আর এমন একটি বিষয়ে তো অবশ্যই চিন্তা ও গবেষণা'র দরকার!

সুতরাং এমন কোনো বিষয়ে গবেষণা'র দিকটি এড়িয়ে গিয়ে কেবল দু'একটি বা দু'চারটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক 'নস্' তথা কুরআন-হাদীস উদ্ধৃতি হিসাবে জুড়ে দিয়ে 'জায়েয আছে' বা 'জায়েয নাই' –বলে ফাতওয়া দিয়ে বসা, মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। যা প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষিত জনগণের কাছে, আইন-আদালত ও প্রশাসনের বিজ্ঞ লোকজনের কাছে হাস্য-রসের বা তাচ্ছিল্যের খোরাক হয়ে পড়ে; যদিও ঈমান-ইসলামের ভয়ে বা স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয় বিধায় অনেকেই মুখে কিছু বলে না; কিন্তু তাঁদের মন-মানসিকতা এমন 'অগোছালো ফাতওয়া'/ সিদ্ধান্ত বা 'অপরিপক্ক ফাতওয়া' বা সমাধান কিংবা মনের অনেক সুপ্ত জিজ্ঞাসার জবাব তাতে না পাওয়াতে পরিতৃপ্ত হওয়ার অযোগ্য ফাতওয়াটি প্রশ্নে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তার অর্থ এটা নয় যে, তাঁরা ইসলাম বা ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট বরং আমার প্রদত্ত অপরিপক্ক বা অগোছালো ফাতওয়ার প্রতি ত্যাক্ত-বিরক্ত; অথচ আমি বলে বেড়াচ্ছি: এরা ধর্ম-বিদ্বেষী বা এরা ইসলাম বিরোধী[১২]!

---

[১২].'ফাতওয়া'র আভিধানিক, পারিভাষিক ও গোড়ার কথায় বলা আছে, **'ফাতওয়া'** মানেই তাতে নতুনত্ব থাকবে, তা সাজিয়ে-গুছিয়ে নতুনরূপে পেশ করা হবে। তা হবে উঠতি বয়সের নতুন যুবকের মত শক্তিশালী। যা 'ফাতওয়া'-শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট উস্তাদগণ জানেন। ফাতওয়া বিষয়টির নীতিমালা'র প্রাথমিক পর্যায়ের বইগুলো পাঠ করে দেখা যেতে পারে।

(ষোল)

৫.১৮.বিষয় বিশেষজ্ঞ প্রবীণ উস্তাদ বা বিভাগীয় প্রধানকে না দেখিয়ে ফাতওয়া ইস্যু ঠিক নয় : উক্ত বাস্তবতার প্রতি লক্ষ রেখে জন-গুরুত্বপূর্ণ বা আধুনিক কোনো বিষয়ে কেবল শিক্ষানবীশ ছাত্রদের দ্বারা লিখিয়ে বা প্রস্তুত করিয়ে সেই ফাতওয়া বাজারে ছেড়ে দেয়া বা ফাতওয়া-প্রার্থীকে প্রদান করা মোটেও সমীচিন নয়। কারও ব্যক্তিগত সমস্যা বা সমাধান বিষয়ক মাস্আলা-ফাতওয়া হলে, সেক্ষেত্রে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে না; ভুল বা অপরিপক্ক হাতে প্রদত্ত হলেও ততটা সমালোচনা ও সমস্যার জন্ম হয় না। কিন্তু ফাতওয়ার বিষয়টি যখন মসজিদ-মাদরাসা, ঈদগাহ-কবরস্থান, দ্বি-পাক্ষিক (বিবাহ-তালাক), লেনদেন বা সামাজিক কোনো বিষয় সম্পর্কিত হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটি ইত্যাদিতে অনেক সদস্য বা লোকজন উচ্চশিক্ষিত ও সরকারী-বেসরকারী পদস্থ কর্মকর্তাগণও জড়িত থাকেন; বিশেষত ঢাকা শহর ও অনুরূপ সিটি-শহরগুলোতে। এমতাবস্থায় অপরিপক্ক হাতের বা অগোছালো ফাতওয়াটি পাঠে সংশ্লিষ্ট লোকজন সন্তুষ্ট হতে পারেন না। যে কারণে ফাতওয়া বিভাগের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট উস্তাদের বা বিভাগীয় প্রধানেরও ফাতওয়াটি প্রস্তুতকরণে মনে-প্রাণে শেয়ার করা উচিত।

অবশ্য এক্ষেত্রে অনেকটা বড় সমস্যা বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় একই উস্তাদের হাদীস-তাফসীর, ফিকাহ, উসূল-বালাগাত, ওয়ায-নসীহত তথা সর্ব বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া বা জড়িয়ে পড়া; যে কারণে একাগ্রচিত্তে শুধু ফাতওয়া-ফারাইয অনুশীলন করানোতে এবং শিক্ষানবীশ ছাত্রদের পিছনে বেশি বেশি সময়দান বা তাদেরকে হাতে-কলমে অনুশীলন করাতে গিয়ে অধিক ফিকির বা সৃজনশীল যোগ্যতাসম্পন্ন 'শিক্ষানবীশ মুফতী' তৈরিতে যথাযথ অবদান রাখা যাচ্ছে না বলেই অনেকের ধারণা।

মোটকথা বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের অবশ্যই মনোযোগদান ও সজাগ থাকা চাই। নতুবা প্রকারান্তরে আমাদেরই অযোগ্যতা প্রকাশ পাবে এবং আমাদের কারণে 'ফাতওয়া'বিজ্ঞান তথা ইসলাম ও কুরআন-হাদীস সমালোচনার মুখে পড়বে ও পড়ে থাকে।[১৩]

(সতের)

৫.১৯.'গবেষণা' বা 'ফাতওয়া'র প্রয়োগ সমস্যা :'ফাতওয়া' মানে 'মাসআলা-বিধান'টির ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক নির্দেশনা; যাতে মূল বিধানটিও আলোচিত হবে এবং তা কীভাবে আমল করা যায়, তার নির্দেশনাও থাকবে। এই গবেষণা-ফাতওয়াটি যখন কারও ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমল বা করণীয় হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণত মূল বিধানটি বলে দেয়াই যথেষ্ট হতে পারে; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় রেখে তাৎক্ষণিক বা আজ হোক, কাল হোক আমল করবেন। এতে অন্য কারও ক্ষতি নেই বা সংশ্লেষ নেই। কিন্তু তা যখন দ্বি-পাক্ষিক কোন সমস্যা যেমন স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার হয়, বিবাহ-তালাক সম্পর্কিত সমস্যা হয় বা

---

১৩. আমাদেরই আপনজন বা সহপাঠী নামী-দামী বিভিন্নজনের এমন অপরিপক্ক ও অগোছালো অনেক ফাতওয়া পরবর্তিতে পুন-র্বিবেচনা ও যথার্থ হয়েছে কি না? –সে জন্য তা আমাদের হাতে এসে থাকে এবং যথাস্থানে সংরক্ষিত আছে; যা দেখে নিজেকে অনেক বিব্রত ও লজ্জিত হতে বাধ্য হয়েছি এবং হই।

লেনদেন বা সামাজিক সমস্যা হয় যেখানে অন্যের বা অনেক মানুষের হক বা পাওনা-দেনার ব্যাপার জড়িত হয়; অনেকের অবগতি ও সম্মতির প্রশ্ন তাতে জড়িত হয়; কিংবা তা প্রয়োগে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেবল সমাজই যথেষ্ট নয় বরং নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি ও প্রশাসন বা রাষ্ট্রেরও সহযোগিতা, অনুমোদন প্রয়োজন হয়– তেমন কোনো ফাতওয়ার বেলায় কেবল মাস্আলা বলে দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার পাশাপাশি সব পক্ষ বিধি মোতাবেক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে উপকৃত হবে কিভাবে? তার বিধি সম্মত নির্দেশনা থাকাও জরুরী। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করা যেতে পারে :

৫.১৯.১.উদাহরণত-১ : স্বামী-স্ত্রীর দ্বি-পাক্ষিক কোন সমস্যা, বিবাদ, দু'পক্ষের মিলমিশের ব্যাপার হলে– সেক্ষেত্রে সমস্যা বা ঘটনা কী ঘটেছে? কতটুকু ঘটেছে? পুরো সমস্যা না জেনে বা পুরো ঘটনা উল্লেখ না করে, কিছু গোপন রেখে বা যাতে নিজেদের দোষ প্রকাশ পায় তা উল্লেখ না করে স্বামী পক্ষ বা স্ত্রী পক্ষ অসম্পূর্ণ আবেদন পেশ করে ফাতওয়া নিতে আসে। অথচ একদিকে অন্য পক্ষ জানেই না বা তাদের সঙ্গে কোন বুঝা-পড়া বা সমঝোতা-সম্মতি থাকে না। অন্যদিকে নিজেদের পসন্দ বা মন মতের ফাতওয়াটি দেখিয়ে অপরপক্ষকে তা মানার জন্য চাপিয়ে দিতে চায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিপক্ষ আর্থিক ইত্যাদি যে-কোনোভাবে দুর্বল হলে সেক্ষেত্রে **ফাতওয়া**টিকে ধর্মীয় নির্দেশনা জ্ঞান করে (যদিও তাতে মনে-প্রাণে সম্মত থাকে না) মেনে নেয়; কিন্তু কিছুদিন পর আবার সেই বিরোধ বা সমস্যা দেখা দেয়; যা অহরহ ঘটছে।

এ সব সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এবং সমস্যাটি যেহেতু দ্বি-পাক্ষিক, সে কারণে উভয় পক্ষের সম্পৃক্ততা ব্যতীত যেমন ফাতওয়া দিতে যাওয়া ঠিক নয়; একইভাবে অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা ব্যতীত; প্রয়োজনে স্থানীয় সৎ ২/১জন মুরুব্বি বা এলাকার নির্বাচিত ১/২ জন সৎ জন-প্রতিনিধির সম্পৃক্ততা ছাড়া ফাতওয়াটি প্রয়োগ বা কার্যকরী হবে না; এবং আপাতত হলেও কয়েকদিন পর আবার সমস্যা দানা বাঁধবে।

সুতরাং ফাতওয়াটির মধ্যেই বা তার উপসংহারে একটি দিক নির্দেশনা থাকা আবশ্যক। কেবল 'তালাক হয়ে গেছে' বা 'হয় নাই' এবং 'পুনরায় মিলমিশ বা ঘর-সংসার করা যাবে' বা 'করা যাবে না'; কিংবা এত .. টাকা দেন-মোহর বাবদ পাবে বা পাবে না; কিংবা অমুকে অমুকের কাছে শরীয়তের বিধান মতে এত.. টাকা পাবে বা পাওনা হয় না– এটুকু বলা বা লেখাই যথেষ্ট নয়। কেননা, এতে কেবল মাস্আলা বলা হয়ে যায় বটে, তবে এটি ফাতওয়া বলে বিবেচ্য হয় না। কারণ, ফাতওয়া মানেই ব্যবহারিক বা কার্যকরী করার প্রয়োজনে বিধানটি সাজিয়ে-গুছিয়ে বলা, তা পালনের পন্থা-প্রক্রিয়াও দেখিয়ে দেয়া।

৫.১৯.২.উদাহরণত-২ : 'এই একই কারণে, মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা সভাপতি বা ইমামের বা কমিটির কোন কোন কাজে খিয়ানত প্রমাণিত হয় এবং তিনি বা তাঁরা যোগ্যতা হারিয়েছেন; তাই তাঁকে বা তাঁদেরকে অপসারণ বা অব্যাহতি দেয়া ওয়াজিব' – এটুকু বলায় বা লেখায় 'মাসআলা' বা ফাতওয়া সম্পূর্ণ হয় না। এর সঙ্গে আরও জুড়ে দিতে হবে যে, কমিটির লোকজনসহ, মুরুব্বিগণসহ এবং মুসুল্লিগণসহ এমনকি অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে স্থানীয় নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিসহ (মেম্বার-কমিশনার/ চেয়ারম্যান/ এম. পি.) সবাই বসে সমস্যার সমাধান করা বাঞ্চনীয়! পাশাপাশি ফাতওয়াটি পাঠ করে উদ্ভূত জটিলতায় প্রদত্ত শরীয়তের নির্দেশনা সামনে

রেখে, নতুন কমিটি বা সভাপতি বা ইমাম নিয়োগের ব্যবস্থা করে নিতে হবে' –তা হলে এটি হবে ফাতওয়া। কেননা, তাতে প্রায়োগিক নির্দেশনাও বিদ্যমান।

৫.১৯.৩.উদাহরণত- ৩ : 'পুরাতন অকেজো বা অব্যবহৃত কবর বা গোরস্থান বা সামাজিক পুরোনো পরিত্যক্ত কবরস্থান জুড়ে একান্ত প্রয়োজনে মসজিদ সম্প্রসারণ বা তাতে মসজিদ নির্মাণ জায়েয আছে' –এটি একটি প্রদত্ত মাসআলা। এমন কোনো সমস্যায় বা আবেদনের জবাবে কেবল এটুকু লিখে দিলেই ফাতওয়া হবে না। বরং তার সঙ্গে আরও লিখে দিতে হবে, 'যেহেতু কবরস্থান বা কবরটির জায়গা ব্যক্তি মালিকানাধীন বা পারিবারিক তাই সংশ্লিষ্ট মালিকগণের অবগতি ও সম্মতিতে তাতে মসজিদ সম্প্রসারণ বা নির্মাণ জায়েয হবে; নতুবা নয়'।

'একইভাবে তা সামাজিক গোরস্থান হলে বা সরকারী খাস জায়গা ইত্যাদি হলে, সেক্ষেত্রে সমাজের মুরুব্বিগণ এবং স্থানীয় চেয়ারম্যান, এম. পি. বা ভূমি অফিস ও তহসীল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে মসজিদ কমিটিকে উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নিতে হবে' –তা হলে সেটি হবে ফাতওয়া এবং এমন ফাতওয়া দ্বারা এলাকায় কোনো ফিতনা ও বিড়ম্বনার সূত্রপাত ঘটবে না।

(আঠার)

৫.২০.ফাতওয়াদানে স্থানীয় মুরুব্বি, চেয়ারম্যান, এম.পি. বা জন-প্রতিনিধির সম্পৃক্ততার কথা কি কিতাবে আছে?

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি আমার মত উরদু প্রবাদ অনুযায়ী 'লকীর কা ফকীর' হন তা হলে বলবেন, 'না তো! তেমন কিছু তো প্রচলিত কোনো ফাতওয়ায় বা ফাতওয়ার কিতাবে লিখিতরূপে দেখিনি'!

আর যদি কোনো বিজ্ঞ মুফতী বা গবেষক আলেম হন, তা হলে বলবেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় ও বাস্তবতার নিরীখে তেমন সম্পৃক্ততা অবশ্যই জরুরী; নতুবা ফিৎনা-ফাসাদের জন্ম হবে এবং ফাতওয়াটি কোনো কাজে লাগবে না'।

এক্ষেত্রে কোনো মুফতী বা গবেষক যদি বলেন, 'যাহা কিতাবে লেখা নাই তাহা আমিও আমার ফাতওয়ায় লিখিব না'– তাঁর উদাহরণ হবে বাদশাহ্‌র ওই খাদেমের মত যে বাদশাহকে দিয়ে তার সেবার তালিকা লিখিয়ে নিয়েছে যে, "সফর কালীন ঘোড়া হইতে যাহা কিছু পড়িয়া যাইবে তাহার সব কিছুই তুলিয়া নিতে হইবে"। তার পর থেকে সে ঘোড়ার মলসহ যা-ই নিচে পড়তো, সব কিছু বস্তা বেঁধে রাজ-দরবারে পৌঁছে দিত!

মোটকথা, কারও যদি সাধারণ জ্ঞানও থাকে বিষয়টি তার বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়, যেমনটি উপরেও আলোচিত হয়েছে যে, যিনি শরী'আ কোনো বিষয়ে সমাধান প্রদানে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করবেন বা ফাতওয়া লিখবেন বা মুফতির দায়িত্ব পালন করবেন তাঁর (কম-বেশী) অবশ্যই 'ইজতিহাদ' তথা বিধান বিষয়ে বাস্তবতার নিরীখে গবেষণা করার মত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

(ঊনিশ)

৫.২১.গবেষণাকর্ম কী 'ইবাদত' না কি লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়?

ফিকহ-ফাতাওয়া, গবেষণা তথা শরীয়া আইন অনুসন্ধান, প্রয়োগ ও প্রযোজ্য বিষয়টিতে এতদসংক্রান্ত গবেষণা'র যেসব মূলনীতি বিবেচনায় নিতে হয় তার অন্যতম হল, প্রথমে দেখা উচিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটি কি ইবাদত সংক্রান্ত, না কি জাগতিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত? আরও লক্ষ রাখা উচিত, সিদ্ধান্ত প্রমাণ প্রশ্নে সর্বসম্মত অভিমত বিদ্যমান কি না? না কি বিরোধপূর্ণ অভিমত বিদ্যমান? সর্বসম্মত বিষয় হলে সেক্ষেত্রে ইতস্তত বা সমস্যার কোন কিছু নেই। কিন্তু গবেষণাগত মতভেদ থাকলে বা বিরোধপূর্ণ বিষয় হলে- সেক্ষেত্রে গবেষণা, সিদ্ধান্তদান বা ফাতওয়াদানের জন্য কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ 'উসূল' তথা নীতিমালা সামনে রেখে আমল করতে হয়, উপ-সংহার টানতে হয় বা ফাতওয়া দিতে হয় –সেটি জানা থাকা অবশ্যই জরুরী। অন্যথায় বিড়ম্বনা ও লেজে-গোবরে অবস্থা অনিবার্য।

এবার দেখি, এতদসংক্রান্ত নীতিমালায় কী বলা হয়েছে এবং হাজার বছর ধরে কী আমল হয়ে আসছে? নিম্নে তা লক্ষ করি:

৫.২১.১.জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ বৈধ-অবৈধ স্থিরকরণে আইনী নীতিমালা

(এক) اِنَّ الْاَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُوْدِ الْاِذْنُ وَالْاِبَاحَةُ اِلاَّ مَاجَاءَ نَصٌّ صَرِيْحُ التُّبُوْتِ صَرِيْحُ الدَّلَالَةِ بِمَنْعِهِ وَبِحُرْمَتِهِ .....وَهٰذَا بِخِلَافِ الْعِبَادَاتِ الَّتِيْ تَقَرَّرَ: اَنَّ الْاَصْلَ فِيْهِ الْمَنْعُ الخ

"লেনদেন, ব্যবসা ও চুক্তির ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে ব্যাপক 'অনুমতি' ও 'বৈধতা'.... তবে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে 'নিষিদ্ধ' বা 'অবৈধ হওয়া', যতক্ষণ না বিধানদাতার পক্ষ থেকে সে-বিষয়ে কোনো 'নস্' (text) বা দলিল প্রতিষ্ঠিত (পেশ করা) হয়, যাতে করে মানুষ ধর্মীয় 'ইবাদত' বিষয়ে এমন কিছু প্রবর্তন না করে যার অনুমতি মহান আল্লাহ্ প্রদান করেননি"।[১৪]

অর্থাৎ শরীয়া আইন গবেষণার মূলনীতি হচ্ছে ইবাদত সংক্রান্ত কোনো নতুন বিষয় বা অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ ও সংযোজন করতে গেলে ইতিবাচক দলিল-প্রমাণ পেশ করা জরুরী। তার কারণ, ইবাদত সংক্রান্ত 'উসুল' ভিন্ন এবং **(مُعَامَلَات) 'লেনদেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য'** সংক্রান্ত উসূল/মূলনীতি ভিন্ন হয়ে থাকে। যে কারণে লেনদেন/ব্যবসা ও আহার-বিহার ইত্যাদি বিষয়ে (اَلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ اَلْاِبَاحَة) সহ অনুরূপ মূলনীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তাই এসব ক্ষেত্রে 'নিষেধ' বা 'হারাম' বলতে গেলে অর্থাৎ নেতিবাচক প্রমাণের প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট দলীল পেশ করা জরুরী হয়; ইতিবাচক তথা বৈধ বা হালাল বা মুবাহ প্রমাণের জন্য দলিল প্রয়োজন হয় না।

পক্ষান্তরে 'ইবাদত' বিষয়ক নতুন কিছু বা অতিরিক্ত কিছু প্রমাণ করতে গেলে সেক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রমাণ পেশ করা আইনত জরুরী হয়ে থাকে; নেতিবাচক প্রমাণ পেশ করা জরুরী বলে পরিগণিত হয় না।

---

১৪ . আল্লামা ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (র.), ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন: খ-১, পৃ- ৩৮৫।

বিষয়টি আরও সহজভাবে বলা যায়, 'লেনদেন ও পানাহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো কিছু অবৈধ/হারাম বলতে গেলে দলিল দিতে হবে; পক্ষান্তরে ইবাদত সংক্রান্ত কোনো বিষয় বা আমল বৈধ/জায়েয বলতে গেলে তার পক্ষে সুনির্দিষ্ট দলিল পেশ করতে হবে। বোঝার সুবিধার্থে নিচে একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

"সুতরাং (উদাহরণত) 'মুরাবাহা লিল-আমিরি বিশ্‌শিরা'[১৫] যেহেতু একটা লেনদেন তথা ব্যবসায়িক কার্যক্রম তাই সেটিকে 'না-জায়েয' প্রমাণ করতে গেলে, না-জায়েয হওয়ার পক্ষে সুনির্দিষ্ট দলীল পেশ করে, না-জায়েয বলতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু 'যুক্তি' বা শুধু 'কারণ' বা শুধু বিষয়টির 'নাম' দেখেই বা এর নামের উপর ভিত্তি করেই না-জায়েয বলা যাবে না। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিবেচনা হয়ে থাকে, বাস্তব কাজটি কী? তাতে কী করা হয়? মন্দ কিছু বা প্রতারণামূলক কিছু হচ্ছে না তো? তা হলে আর 'না-জায়েয' বলতে যাওয়ার দরকার নেই; কারণ, এটা ইবাদতকেন্দ্রিক বিষয় নয়; জাগতিক জীবনের লেনদেন বিষয় মাত্র। আর বাস্তব 'উরফ'/ প্রচলন/ ব্যবসায়িক মহলে দেখা যায় নিজস্ব পুঁজি/ দোকান/ গোডাউন ও লাইসেন্স ছাড়াও কিছুলোক এমন ব্যবসায়ী পাওয়া যায় -যারা অন্য ব্যবসায়ী বা সাধারণ ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ের অর্ডার সংগ্রহ করে তা নিজে ক্রয়ের মাধ্যমে অপর ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় বা সরবরাহ করে থাকে। যা اَلْمُرَابَحَةُ لِلْاٰمِرِ بِالشِّرَاءِ এরই নামান্তর। পরিভাষায় এমন ব্যবসায়ীকে ব্রোকারী/ফ্লাইং বিজনেস বা অন্য যে কোনো নামেই পরিচিত করা হোক- সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ প্রক্রিয়ার ব্যবসাকে আবার শুধু দালালীও বলা যাবে না। কারণ, দালালীর ক্ষেত্রে নিজে ক্রয় করা আবার অন্যের কাছে বিক্রয় করা জরুরী বলে বিবেচ্য নয়। তা ছাড়া, ব্যবসা করতে গেলে 'সনদ' থাকা এটাও শরীয়া আইনে জরুরী নয়; যদিও সরকারি আইনে তা অনেক ক্ষেত্রে জরুরী বলে ধর্তব্য হয়ে থাকে।

মোটকথা, بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ لِلْاٰمِرِ بِالشِّرَاء বা উক্ত প্রকৃতির ক্রয়-বিক্রয়ের অবৈধতা প্রশ্নে যেহেতু শরীয়া আইনে এমন কোনো দলীল নেই যে, যিনি প্রকৃত ব্যবসায়ী নন তিনি; অথবা যার নিজস্ব গোডাউন নেই তিনি; অথবা যার লাইসেন্স নেই তিনি; অথবা যার পুঁজি নেই তিনি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে জড়িত হতে পারবেন না। তাই ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক শরীয়া মূলনীতি অনুযায়ী এ ব্যবসায় পদ্ধতিকে অবৈধ বলা যাবে না।

(বিশ)

৫.২২.'আহকাম' ও 'ফাযায়েল' কি সমান? ফাযায়েল ও মাসায়েলের মধ্যকার পার্থক্য-জ্ঞানও যা একজন গবেষক, আলেম, ওয়ায়েজ, কলাম লেখক ও দীনের দাঈকে নিরাপদ সীমায় রাখে– সেটিও মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখী। কারণ, সংশ্লিষ্টরা এটা বুঝতে পারেন না বা

---

১৫ . এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ **'হালাল খাদ্য-পানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য বীমা-ব্যাংকিং' পুস্তকের** ব্যাংকিং অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

بيع المرابحة للأمر بالشراء : هذه تسمية حديثة لنوع من أنواع المعاملة ، ومعناها : أن يطلب شخص من أخر أن يشترى له شيئا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجل مع زيادة معلومة (ص، ج/، معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية ، دار الفضيلة، القاهرة)

বুঝতে চান না যে, আইন-বিধান একটা ভিন্ন ব্যাপার এবং ফাযায়েল তথা উৎসাহ-ব্যাঞ্জক হাদীস-দলীল দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ অন্য ব্যাপার। যে কারণে শরীয়া আইনে অনেক বিষয়, কর্মকান্ড জায়েয ও বৈধ রাখার পরও সে বিষয়ে একপেশে নেতিবাচক ২/১টি বা ২/৪টি হাদীসের কথা ওয়ায মাহফিলে বা তা'লীম অনুষ্ঠানে শুনে বা বই-পুস্তকে পাঠ করে ওই মাসআলা-বিধান প্রশ্নে সংশয়ে আটকে পড়েন। অথচ এটি জানা থাকে না যে, একই বিষয়ের বৈধতা-অবৈধতা বুঝা যায় এমন পারস্পারিক বিপরীতমুখী প্রচুর হাদীস-দলীল 'নসে' তথা কুরআন-সুন্নাহ্র মূল টেক্সট-এ বিদ্যমান হয়ে থাকে। আর সেই সবগুলো হাদীস-দলীল সামনে রেখেই হাজার বছর পূর্ব থেকেই এসব বিধি-বিধান সাজানো-গোছানো ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত বিষয়টি একজন গবেষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

(একুশ)

৫.২৩.'ফরয-ওয়াজিব' ও 'নফল-মুস্তাহাব' কি সমান? ফরয-ওয়াজিব বা হালাল-হারাম ও তার বিপরীতে নফল-সুন্নাত-মুস্তাহাব –এ দু'পর্যায়ের আমল-বিধানে যে পার্থক্য রয়েছে– অনেকে তা সামনে না রেখে একটা নফল-মুস্তাহাব বিষয় নিয়ে গবেষণা'র নামে এতো অধিক বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করে যে, তার পরিণতিতে সমাজে-দেশে মারামারি-হানাহানির সূত্রপাত ঘটে থাকে; অথচ তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয-ওয়াজিব ও সরাসরি হালাল-হারামের প্রতিও তাঁর বা তাঁদের তেমন লক্ষ থাকার প্রমাণ পাওয়া দুরূহ।

(বাইশ)

৫.২৪.অমুসলিমরাও কি 'নফল-মুস্তাহাবে' আমল করতে বাধ্য? জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ইত্যাদি যেখানে মুসলিম-অমুসলিম, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে জড়িত, সবার ব্যাপার –সেখানে 'নফল-মুস্তাহাব', 'ভালো' বা 'অধিক ভালো' বা 'অধিক উত্তম'– বিষয় ও বিশেষণগুলো উল্লেখ করে বুঝানো হচ্ছে যে, এসব নফল-মুস্তাহাবে ওই অমুসলিম জনগণও আমল করে অধিক সওয়াব প্রাপ্ত হোক? অথচ বাস্তবে তাদের তো রেজিস্ট্রার খাতায় নামই নেই! আর আমি তাদেরকে নফল-মুস্তাহাবে আমল করতে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করছি! অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে বিষয়-বিধানটি ঈমান-ইসলাম বা ইবাদত-বন্দেগী না হয়ে বরং সাধারণভাবে ব্যাপক জনগোষ্টির সকলের সঙ্গে জড়িত জাগতিক বেচাকেনা, ক্ষেত-ফসল, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় হয়ে থাকে; সেক্ষেত্রে যেখানে যেখানে শরীয়তের মৌলিক ও ফরয-ওয়াজিব পর্যায়ের নির্দেশনা থাকে সেগুলো বাস্তবায়ন জরুরী হিসাবে বিবেচনায় রেখে যেমন সুদ, প্রতারণা ইত্যাদির কোনো সুযোগ নেই। বাকী নফল-মুস্তাহাব পর্যায়ের নির্দেশনা মুসলমানদের বেলায় নৈতিকতা (دِيَانَةً) পর্যায়ের হলেও (قَضَاءً) আইনানুগ নয়। আর অমুসলিমদের বেলায় তা (قَضَاء) আইনানুগ তো নয়ই, এমনকি নৈতিকতাকেন্দ্রিকও নয়। সুতরাং বেচাকেনার মত এসব ব্যাপারেও বার বার নফল-মুস্তাহাবকে টেনে এনে সার্বজনীন শরীয়া আইনগুলোকে আমরা জটিল বানাতে যাবো কেন?

এসব মুসলিম-অমুসলিম সার্বজনীন শরীয়া আইনের বেলায়ই যদি আমরা নৈতিকতা পর্যায়ের বিষয়গুলো নিয়ে কড়াকড়ি করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমাদের শরীয়া আইনের এদিকগুলো তো বটেই অপরাপর ইসলামী আইন বা শরীয়া আইন -যেগুলো কেবল মুসলমানদের স্পর্শ্ব করে

এবং কেবল মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য– তার সবগুলো এমন কোনো রাষ্ট্রে কীভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চালু করা যাবে– যেখানে আরও অনেক জাতি-গোষ্ঠির অমুসলিমরা বসবাস করে? সুতরাং প্রবন্ধ রচনা বা গবেষণা'র ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টিও সামনে থাকা উচিত।

(তেইশ)

৫.২৫.ভারসাম্য রক্ষার জন্য সর্বাধিক জরুরী: সবচেয়ে বড় কথা, আমি যেই শরীয়া আইন বা ইসলামিক কোন বিষয় সামনে রেখে গবেষণাকর্ম বা ফাতওয়া দিতে যাচ্ছি বা লেখালেখি বা অভিমত/সিদ্ধান্ত প্রদান করতে যাচ্ছি; অথচ তার বিশ্বাসগত বিষয়াদি, ইবাদত শ্রেণির বিষয়াদি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়াদির সংশ্লিষ্ট নীতি, মূলনীতি, কর্মপন্থা বা কর্ম-কৌশল আমার সামনে নেই– সেক্ষেত্রে আমি ভারসাম্য রক্ষা করে কোনো কিছু লেখা বা গবেষণার সঠিক উপসংহার টানা তো দূরের কথা, নামে একজন গবেষক বা মুফতী বা পি. এইচ.ডি হোল্ডার হয়েও বার বার দেশ-জাতিকেই কেবল বিভ্রান্ত করে যাবো, তা-ই কী নয়; এমনকি শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাকে বিকৃত করতে থাকবো- (أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا) ।

(চব্বিশ)

৫.২৬.'জায়েয' বা 'না-জায়েয' তথা বৈধ বা অবৈধ বলতে কতটুকু বোঝায়?

ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে অনেক ক্ষেত্রে 'মুস্তাহাব', 'উত্তম', 'ভালো', 'মাকরূহ', 'অধিক ভালো', 'অধিক তাকওয়া পরিপন্থী' –কোন বিধান-বিষয় এর বেলায়ও (لا يجوز) 'জায়েয নয়' শব্দ বা বাক্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বুঝে নিতে হবে যে, এই 'জায়েয নয়' মানে 'না-জায়েয'-অবৈধও নয়; বরং মাকরূহ বা উত্তমতার খেলাফ মাত্র।

উরদু ও ফার্সি ভাষায় বলা হয় 'দুরুস্ত নেহি হ্যায়' অর্থাৎ 'ঠিক নয়' বা 'বৈধ নয়'। অথচ এ পার্থক্য অনেকের সামনে থাকে না যে, এই 'অবৈধ' বা 'বৈধ নয়' বলতে কী 'হারাম'? ফরয-ওয়াজিব পরিপন্থী বিধায় তা অবৈধ? সুন্নাত-মুস্তাহাব পরিপন্থী বিধায় তা অবৈধ? না কি 'মাকরূহ' হিসাবে অবৈধ?

সুতরাং জনগণের ব্যাপক স্বার্থ যেখানে জড়িত, কিংবা অন্ন, খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও নিরাপত্তা (হোক তা জান-মালের নিরাপত্তা বা মান-সম্মানের নিরাপত্তা বা ধর্মীয় নিরাপত্তা) ইত্যাদির মত মৌলিক, জাতীয় ও জন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে এ প্রকৃতির **'জায়েয নয়'** শব্দ দেখেই কোন ব্যাপারে তা **'না-জায়েয'** বা **'হারাম'** হওয়ার কথা গবেষণা'য় উল্লেখ অথবা তেমন কোন ফাতওয়া-ফায়সালা দেয়া যাবে না।

(পঁচিশ)

৫.২৭. স্থান-কাল ও পাত্রের পরিবর্তনে গবেষণায়ও পরিবর্তন আসবে:

সবচেয়ে বড় কথা, একজন গবেষক বা মুফতিকে 'আধুনিক ও উদ্ভূত নতুন বিষয়ে গবেষণাকর্ম ও ফাতওয়াদানের নীতিমালা' অনুসরণে গবেষণাকর্ম বা ফাতওয়াদানের দায়িত্ব পালন করা উচিত। যেখানে স্পষ্ট মূলনীতিতে বলা হয়েছে–

(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان-) "যুগ পরিবর্তনে বিধান পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা যাবে না"।[১৬] সেখানে নতুন বিবেচনা অবশ্যই কাম্য।

উদাহরণত, এ যুগে পাসপোর্ট কিংবা হজ্জ, অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে ছবি তোলার বৈধতা যুগ-যামানার পরিবর্তনে করা হয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনা সামনে রেখে, ভিডিও/ সিসি ক্যামেরা ইত্যাদির বিধানে যে ক্ষেত্রে তা ভালো কাজে এবং জরুরী নিরাপত্তা বা ডকুমেন্টারি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকবে সেক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের গবেষণায় বা প্রদত্ত ফাতওয়া-বিধানেও শরীয়ত সম্মত পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

(ছাব্বিশ)

৫.২৮.গবেষণা বা ফাতওয়া দু'রকম হয়ে গেলে করণীয় কি? কোন্‌টি মানতে হবে?

ফিকহ তথা শরীয়া আইন গবেষণা, সিদ্ধান্তদান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশ্নে যথাযথ ও সঠিক শরীয়া মানদন্ড রক্ষিত (প্রতারণা, ধোকা বা এক পক্ষকে ঠকানো যেন না হয় –ইত্যাদিই মুখ্য বিবেচ্য) হওয়ার সুবিধার্থে হযরত শায়খ সৈয়দ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারাকাতী (র.) তাঁর রচিত 'আদাবুল মুফতী' গ্রন্থে এতদসংক্রান্ত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ ও সার্বজনীন মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে–

إِذَا اسْتُفْتِيَ مُفْتِيَيْنِ فِيْ حَادِثَةٍ فَأَفْتَى اَحَدُهُمَا بِالصِّحَّةِ وَالْاٰخَرُ بِالْفَسَادِ، اَوْ بِالْحِلِّ وَالْاٰخَرُ بِالْحُرْمَةِ، يَاخُذُ الْعَامِيُّ بِقَوْلِ مَنْ اَفْتَاهُ بِالْفَسَادِ فِي الْعِبَادَاتِ وَبِالصِّحَّةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الخ (ص,قواعد الفقه)

অর্থাৎ "যখন কোনো একটি উদ্ভূত বিষয়ে/বিধানে যথাযোগ্য ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন দু'জন মুফতিকে বিষয়টির বৈধতা-অবৈধতা প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর তাঁরা দু'জনের মধ্যে একজন তা সঠিক-শুদ্ধ মর্মে ফাতওয়া প্রদান করেন, অন্যজন তা অবৈধ-বেঠিক বলে ফাতওয়া দেন; অথবা একজন 'হালাল' বৈধ মর্মে ফাতওয়া দেন, অন্যজন তা 'হারাম' অবৈধ মর্মে ফাতওয়া দেন; তা হলে এমন পরিস্থিতিতে সর্বসাধারণ কার ফাতওয়া গ্রহণ করবে?

তার জবাব হচ্ছে, বিষয়/বিধানটি যদি 'ইবাদত' সংক্রান্ত হয় তাহলে যে মুফতী 'না-জায়েয' বা অবৈধ মর্মে ফাতওয়া দেবেন জনগণ তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন; আর বিষয়-বিধানটি যদি 'লেনদেন' বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হয় তাহলে জনগণ ওই মুফতির সিদ্ধান্ত গহণ করবেন যিনি তা জায়েয ও বৈধ মর্মে ফাতওয়া দেবেন"।[১৭]

অর্থাৎ ইবাদত বিষয়টির তুলনায় জাগতিক লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে ফাতওয়াদানে বা গবেষণাকর্মে উপসংহার টানতে গিয়ে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এসব ক্ষেত্রে সহজসাধ্যতা কাম্য ও কঠোরতা কম; সুতরাং বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ রাখা দরকার।

---

১৬. মুফতী আমীমুল ইহসান র.: কাওয়াইদুল ফিকহি: পৃ. ১১৩।

১৭. মুফতী আমীমুল ইহসান র. : কাওয়াইদুল-ফিকহি : পৃ-৫৭৯; আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত।

(সাতাশ)

৫.৩০.উপস্থাপনে নিরপেক্ষতা ও সর্ব-সাধারণের বাঁচার উপায়ঃ

সুহৃদ পাঠক! উক্ত জ্ঞান-গবেষণাগত নিরপেক্ষতা ও আমানতদারি রক্ষিত হওয়া বা ক্ষুন্ন হওয়া এবং তা অক্ষুন্ন না থাকায় সাধারণ মুসলিম উম্মাহ্ যে বিড়ম্বনা ও ধাঁ ধাঁ'র শিকার হয়ে পড়ে, তা বোঝা ও তা থেকে পরিত্রাণের লক্ষে কেবল একটি উদাহরণ পেশ করছি।

সাম্প্রতিক ইউটিউবসহ সামাজিক বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীগণ লক্ষ করে থাকবেন যে, বিশ্বখ্যাত ডা. যাকির নায়েক গ্রন্থিত 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত' বিষয়টি, এ বিষয়ে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বা ইসলামী স্কলার বলা যায় নিঃসন্দেহে; তা উপস্থাপনে তিনি বেশ সফল হয়েছেন এবং মুসলিম-অমুসলিম, আলেম-গায়রআলেম অনেকেই তাঁর কাছ থেকে নতুন এক আঙ্গিকে উপকৃত হচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু শরীয়া আইন-বিধান বা ফিকাহ-ফাতওয়া বিষয়ে 'ফকীহ' বা 'মুফতী' ('ল-ইয়ার') নন; অথবা তিনি 'আকীদা' তথা ইসলামের মৌলিক বোধ-বিশ্বাস, প্রাসঙ্গিক বা আনুষাঙ্গিক বোধ-বিশ্বাস ইতিবাচক ও নেতিবাচক, আপেক্ষিক বিবেচনায় কতটুকু ও কী থাকা দরকার –এ বিষয়ে তিনি আলোচিত 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত' এর অনুরূপ একজন প্রাতিষ্ঠানিক বা বিভাগীয় পণ্ডিত না হয়েও 'সব বিষয়ে' কথা বলতে যাওয়া উচিৎ কিনা তা গবেষনার বিষয়। যে কারণে তিনি বা তাঁর অনুরূপ আরও বিভিন্ন 'বিষয়বিশেষজ্ঞ' ইসলামী স্কলারগণ নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের বিষয়টির পাশাপাশি নিজেকে সবজান্তা ভেবে অপরাপর বিষয়েও যখন 'ইলম যাহির' করতে যান তখনই লেজে-গোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়ে তিনি নিজেও বিতর্কিত হয়ে যান এবং তাঁর কাছ থেকে জনগণ আরও যে উপকৃত হতে পারতো, সেই সুযোগটির দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

এবার নিরপেক্ষতা ক্ষুন্নের একটি মাত্র মূলকথায় বা উদাহরণে আসি। যেমন 'পরকালে বা কিয়ামতে সুপারিশ' করার বিষয়টি বা(**بَابُ الشَّفَاعَة / ثُبُوْتُ الشَّفَاعَة**) 'নবীগণ' বা ওলী-আলেমগণ অথবা 'মহানবী (স.) উম্মতের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন কি না? বা করবেন কি না? বিষয়টির পক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক সব রকমের আয়াত, হাদীস, তাফসীর এবং ব্যাখ্যার 'শেষকথা' হল, মহান আল্লাহ্র নির্দেশে বা অনুমতিক্রমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স.) পাপী উম্মতের জন্য হাশরের মাঠে যেমন সুপারিশ করবেন, তেমনি তাঁর সুপারিশে অসংখ্য অগণিত মুমিন-মুসলিম ('ঈমান' থাকার বরকতে) জান্নাতে যাবে। এমনকি এটি 'আহলুস-সুন্নাত ওয়াল জামাত' এর অন্যতম মৌলিক 'আকীদা'ও বটে।

অথচ বাস্তবতা ও মূলকথা হচ্ছে, নবীর সুপারিশ যেমন সত্য তেমনি সংশ্লিষ্ট উম্মত বা মুমিন-মুসলমানের ঈমানও থাকা আবশ্যিক এবং আমলেও তৎপর হওয়া জরুরী –অর্থাৎ আংশিক বিবেচনায় ডা. যাকির নয়েকের কথাও ঠিক; আবার বিরোধী পক্ষের বক্তব্যও আংশিক বিবেচনায় ঠিক। কিন্তু 'নিরপেক্ষ উপস্থাপন' না থাকায় এবং উভয়ের 'ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপন' না থাকায় ঝামেলা ও ধাঁ ধাঁ'য় পড়তে হচ্ছে সর্ব সাধারণ বা 'আম জনতা'কে; তাঁরা কার বক্তব্য কতটুকু সঠিক তা বুঝে উঠতে পারছেন না! কারণ, তাদের কাছে তো ভুল-শুদ্ধ মাপার মত কুরআন-সুন্নাহ্র 'সহীহ মাপকাঠি'র পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই!

এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণের একমাত্র বাঁচার উপায় হল, সে সব ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হাক্কানী আলেম যাঁরা ইহকাল-পরকাল ও জগত-সংসারের সার্বিক কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞান রাখার

পাশাপাশি নেক আমলেও অগ্রগামী এবং উক্তরূপে ওহাবী-সুন্নী, সালাফী-আহলে হাদীস, তাবলীগী ও নন-তাবলীগী, আলিয়া বা কওমিয়া, বিশেষ কোন দল-মতের সঙ্গে জড়িত নন তথা কারও পক্ষপাতিত্ব করেন না –এঁদের থেকে 'সঠিক' আকীদা/আমল/করণীয় জেনে নিতে হবে; কিংবা এঁদের লেখা ও রেখে যাওয়া বই-কিতাব থেকে নিরপেক্ষ নির্দেশনা গ্রহণ করে কবরে যেতে হবে।

(আটাশ)

৫.৩১.আখেরী গুযারিশ : একজন বিচারকের যেমন অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে বা রাজনীতি ও দল-মতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বিচার কার্য বা রায় প্রদান কোন মতেই ঠিক নয়; ঠিক তেমনি একজন মুফতির পক্ষেও কে আলিয়া বা কে কওমি, কে ওহাবী বা কে সুন্নী, কে আমার বা আমাদের সঙ্গে সখ্যতা রাখে এবং কে আমাদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করে– এমন কিছুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ফাতওয়া দিতে যাওয়া বা কম-বেশী করা কোনভাবেই জায়েয নয়। বরং ইলমী 'সহীহ অনুসন্ধান' এবং কুরআন-সুন্নাহ্র 'নিরপেক্ষ মানদন্ড' সামনে রেখে গবেষণা বা ফাতওয়া প্রস্তুত ও ইস্যু করা **'মুফতী'** পদবীর অর্পিত দায়িত্বের অন্যতম আমানত হিসাবে গণ্য।

৬.০.উপসংহার : উপসংহারে বলা যায়, গবেষণাকর্ম বা ফাতওয়া ইত্যাদি প্রস্তুতকরণে একদিকে যেমন একজন গবেষক বা মুফতী স্তরের আলেম হিসাবে যেভাবে তাঁর পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র বিধি-বিধান বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা জরুরী ঠিক অপরদিকে এটিও অপরিহার্য নিজ যুগ-যামানার মানুষের জীবন-যাপনের ধরন, তাদের সামাজিকতা, তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন এবং তাদের স্বভাব, চাল-চলন ও রুচিবোধ বিষয়ে; সমকালীন 'উরফ' তথা প্রথা-প্রচলন এবং যুগ-যামানার অবস্থা-পরিস্থিতি, লোকজনের ধোকা, প্রতারণা ও তার বিভিন্ন কৌশল, ফাঁক-ফোকর জানা থাকাও তাঁর পক্ষে জরুরী। তা ব্যতীত তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান প্রশ্নে সহীহ-সঠিক ফলাফল বা যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। অর্থাৎ শরীয়া আইন বিশেষজ্ঞ ফকীহগণ বলেছেন:

مَنْ جَهِلَ بِأَهْلِ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ

"যে ব্যক্তি তার সময়-কালের লোকজন সম্পর্কে জানে না, খবর রাখে না- সে প্রকারান্তরে অজ্ঞ-মূর্খই বটে"।[১৮]

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে গবেষণাকর্ম ও ফাতওয়াদানের ক্ষেত্রে এসব আনুষাঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক ও গোড়ার কথা সামনে রেখে দেশ ও জাতি-ধর্মের স্বার্থ, কল্যাণচিন্তায় অবদান রাখতে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দিন। আমীন!

---

১৮. মুফতী আল্লামা ইবনু আবেদীন : শরহু উকূদি রছমিল: পৃ. ৯৮, ইফা প্রকাশনা বিভাগ, সং- ২০০৯খ্রি.।